গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর

জীবনী ও কেরামত

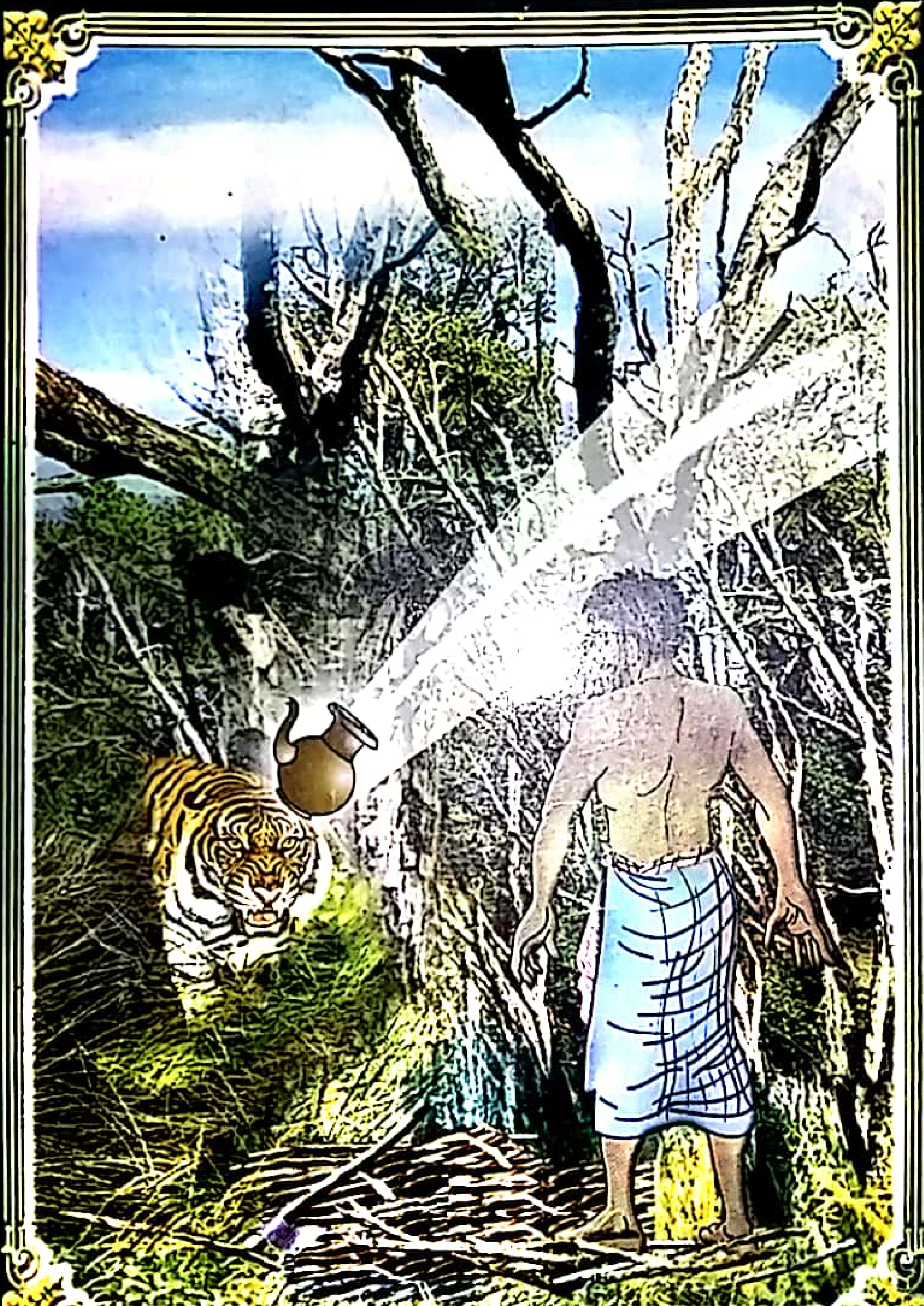

হযরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী
মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ
(কঃ) মাইজভাণ্ডারীর

জীবনী ও কেরামত

রওজা শরীফ

সঙ্কলন সংগ্রাহক
মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী)

লেখক
মওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভূঁইয়া
(এম, এম, গোল্ডমেডালিষ্ট-কলিকাতা আলিয়া মদ্রাসা)
মুরাদপুর, সীতাকুণ্ড।

▼

প্রকাশক
আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

▼

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

▼

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৬৭ ইংরেজী।
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০০৬ ইংরেজী।
৬ষ্ঠ প্রকাশ : ২৫ জুন ২০১২ ইংরেজী।

▼

ডিজাইন ও মুদ্রণে
মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১-৮১৭২৭৪
ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮
E-mail : prokashoni@maizbhandarsharif.com
Website : www.maizbhandarsharif.com

▼

মূল্য : ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) সাহেবের জীবনী, ইতিহাস আলোচনায় ও তাঁহার জীবনের অমূল্য কেরামতাবলী এবং রূহানী তছর্রোপাত প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্য তথ্য সংগ্রহে যাহারা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বইখানা মওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভূঁইয়া আমার সংগৃহীত নোট মূলে লিখিয়া দিয়াছেন। মওলানা আফছার উদ্দিন আহমদ বি-এল সাহেব এবং মাষ্টার খায়ের-উল-বশর সাহেব ভাষা সংশোধন প্রভৃতি কাজে সক্রিয় সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সহৃদয় পাঠকবর্গ বইখানা পাঠে উপকৃত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি
বিনীত
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
১লা চৈত্র, ১৩৭৩ বাংলা

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রকাশকের কথা

আল্লাহতায়ালার বিশ্বব্রহ্মান্ডে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া স্রষ্টা শক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতঃ খোদার খলিফা হিসাবে যাঁহারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রূহানী শক্তি ধর্ম-জগতে দূর দূরান্তে প্রসারিত হওয়ায় তাঁহাকে জানিবার ও চিনিবার জন্য মানবের মনে আগ্রহ জন্মে। তাহাদের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাঁহার অনুগ্রহ ও খেদমত ছোহবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী তাঁহার পবিত্র গদী শরীফের স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন, খাদেমুল ফোক্‌রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব "হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থখানি ১৯৬৭ সালে প্রকাশ করিয়া আশেকানের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মাইজভাণ্ডার ও মাইজভাণ্ডারী তরিকা বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই গ্রন্থখানির চাহিদা সর্বাধিক। হজরত আক্‌দাছের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও রূহানী বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হওয়ার কারণে এই "জীবনী ও কেরামত" বইখানি সকলের জীবন পথে আলোক বর্তিকা স্বরূপ।

ইতিমধ্যে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের হযরত ছাহেব কেবলা কাবার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ড পৃথক হওয়ার দরুণ এই মহান শরাফতওয়ালার দরবারে আগত সর্বস্তরের আশেক, ভক্ত, মুরিদান ও জায়েরীনগন "গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত" বইখানি আমার নিকট তালাশ করিতেছে।

তাই তাহাদের আগ্রহকে স্বাগত জানাইয়া, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীন হিসাবে "হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থখানা ছাপাইয়া তাহাদের চাহিদা মিটাইতে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছি।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থখানি আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনন্তকাল ব্যাপী অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হইয়া থাকুক, গাউছে পাকের ফয়জ বরকত সর্বক্ষেত্রে আমাদের উপর বর্ষিত হউক, আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। "আমিন"।

ইতি-

আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানশীন

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার শরীফ, থানা-ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

বিশ্বভূবনের একমাত্র প্রভু পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিজগতকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন করিতেছেন। সকলের উদ্দেশ্য তিনি। সমস্ত প্রশংসা কীর্তন তাঁহার। তাঁহারই প্রতি সকলের গতি ও প্রত্যাবর্তন।

তাঁহারই নূরে সৃজিত প্রিয়তম মানব, তাঁহার প্রণয় সংশ্রব হইতে বহুদূরে পর্দার আড়ালে পতিত হওয়ায় পুনঃ সঙ্গ লাভে উভয়ের মধ্যে ভীষণ বিচলিত ভাব। তাই পর্দা উন্মোচনে তাঁহার সুমধুর শান্তিময় মিলন অর্জনের জন্য তাঁহার মনোনীত নবী-অলি হাদির একান্ত প্রয়োজন।

কালের দূরত্বে মহান প্রভূর আদর্শকে মানব যখন তাঁহার পরিচিতি জ্ঞান ও প্রেম প্রীতি ভুলিয়া বসে, তখন এই হাদিরাই মানব জগতকে তাঁহার স্মৃতি, প্রীতি ও প্রেম-প্রেরণায় উদ্ভুদ্ধ করিয়া তাঁহার মিলন পথে পৌঁছাইয়া দেন।

তাই যুগে যুগে এই মহান নবী অলি-পীর হাদীকুল নানা প্রকার যুগোপযোগী চিত্তাকর্ষক সবল কৌশলী ভাবধারা, কার্যকলাপ ও রীতিনীতি দ্বারা মানব জাতিকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রেম পথে আহবান করিয়া মানবের সর্বপ্রকার মুক্তি পথের সন্ধান দান করিয়া আসিতেছেন।

কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে ইয়াজদানী, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব শাহ্ ছুফী হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) বিশ্বগুরু, তৌহিদ পথের অদ্বিতীয় বাহক ও মিলনদ্বার উদ্‌ঘাটক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা (সঃ) এঁর প্রতীক, সর্বগুণাধীকারী "আহমদী বেলায়েত ক্ষমতার ঝাণ্ডাবাহী একমাত্র নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন "পীরে ফায়াল", মুক্ত যুগনায়ক।

বিশ্বমানব জগতে পরম করুণাময় খোদাতা'লার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন এই মহান গাউছুল আজমের পরিচয় একান্তই দরকার। খোদা সন্ধানী মানবও এই সহজ সরল আধ্যাত্মিক পথের বাহক সফলকাম যুগ হাদীর অনুসন্ধানে ও অনুসরণে, তাঁহার মহত্ব মাহাত্ম্য ভাবধারা জানিতে উদগ্রীব।

এই মহান অলি উল্লাহ্‌র পরিচয় দিতে বহু খোদা তত্বজ্ঞানী ভাষাবিদ ভক্ত সহচরগণ আরবী, উর্দু, ফারসী ও বাংলা ভাষায় নানাভাবে নানা ছন্দে তাঁহার পরিচয় গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। উহাদের প্রায় গ্রন্থ মুদ্রিত না থাকায় বর্তমানে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। হযরতের অনুগৃহীত অলিয়ে কামেল জ্ঞানসাগর শাহ্ ছুফী মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আয়নায়ে

বারী" উহাদের অন্যতম। উহার উর্দুকপি প্রকাশিত হইয়াছে। শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ইছাপুরী সাহেবের বাংলায় সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত হযরতের জীবনীখানিও ছাপানো না থাকায় বাংলা ভাষায় পরিচয় ও তথ্য সন্ধানী জনসাধারণ ও ভক্ত-অনুরক্তদের পক্ষে তাঁহার প্রাথমিক পরিচিতি জ্ঞান অর্জন প্রায় দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। তাই নানা দেশ হইতে হযরতের বাংলায় জীবন চরিত তল্লাসী পত্র সমূহ মাইজভাণ্ডার গাউছিয়া আহ্মদিয়া মঞ্জিল অফিসে আসিতেছে এবং প্রতিদিন বহু উপস্থিত আগত অভ্যাগত ভক্তবৃন্দ উহা সংগ্রহে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। উক্ত পীরে কামেল সোলতানে আজম হযরতের শুভ ছোহবত প্রাপ্ত সহচর এবং হযরতের একমাত্র উত্তরাধিকারী সাজ্জাদানশীন পৌত্র গাউছে জামান হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা দেলাওর হোসাইন সাহেবের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি বহুদিন পূর্বে এই দুঃসাহসিক মহান কার্যে দৈবযোগে আদিষ্ট হইলেও সুযোগ না ঘটায় উহা কার্যকরি করিতে সক্ষম হই নাই। একদা আমার পীরে তরিকত উক্ত হযরত কর্তৃক প্রকাশ্যে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুমতি ও ইঙ্গিত বাহী হিসাবে তাঁহার সংগৃহীত হযরত আক্দাছের অসংখ্য কেরামত ও অলৌকিক ঘটনাবলী হইতে অতি বিশ্বস্ত দীনদার সাহচর্য প্রাপ্ত ভক্তমন্ডলীর বর্ণিত এবং জন সমাজে সুবিদিত কয়েকটি ঘটনার অবিকল সংক্ষিপ্তসার নমুনা, আদর্শ স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া হযরতের পবিত্র পরিচয় দেওয়ার চেষ্টায় অত্র গ্রন্থখানি জ্ঞান ও ভাষাহীন অবস্থায় অতি বিনয় ভীত সংকোচিত মনে সম্পাদিত করিয়া হযরতের তথ্য অনুসন্ধানী ভক্ত অনুরক্ত ও সুধীমণ্ডলী সমীপে উপস্থিত করিতে সাহস করিলাম।

খোদাতত্ত্বজ্ঞানী পাঠকগণ, তত্বজ্ঞানে উপকৃত হইলে হযরতের অসীম অনুগ্রহে ও আদর্শবাদী ভক্তগণের শুভ আশীর্বাদে নিজকে ধন্য ও সফল মনে করিব।

এই পবিত্র গ্রন্থখানী কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে ইয়াজদানী, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব শাহ্ ছুফী হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর উত্তরাধিকারী আমার মুর্শিদে কামেল গাউছে জামান হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন কেব্লার পবিত্র করকমলে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার ও মহান দয়ালু হযরতের অনুমোদনীয় কৃপাবারিতে দোজাহানের সফলতা ও চিরদাসত্ব কামনা করিতেছি।

আমিন।

খাদেম
বিনীত গ্রন্থকার

মওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভূঁইয়া
(এম.এম. গোল্ডমেডালিষ্ট, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা)
মুরাদপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
▲ প্রথম পরিচ্ছেদ	
হামদ্	১
প্রাকৃতিক অবস্থা	
▲ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জন্মভূমির প্রাকৃতিক অবস্থান	৩
▲ তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
বিকাশ গুরুত্ব	৫
▲ চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
জন্ম পূর্বাভাষ	১১
▲ পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
বংশ পরিচয়	১৪
▲ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
জন্ম বৃত্তান্ত	১৫
▲ সপ্তম পরিচ্ছেদ	
প্রকৃতির কোলে শিশু গাউছ	১৭
▲ অষ্টম পরিচ্ছেদ	
বাল্যাচরণ ও বিদ্যা অর্জন	১৯
▲ নবম পরিচ্ছেদ	
কর্ম জীবন	২২
▲ দশম পরিচ্ছেদ	
বেলায়ত অর্জন	২৪
কামেলিয়ত অর্জন	২৬
▲ একাদশ পরিচ্ছেদ	
বিবাহ বন্ধন ও সাংসারিক জীবন	২৮
▲ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	
বেলায়তের প্রথম বিকাশ ও ফতুহাত আরম্ভ	৩১
▲ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	
হযরতের আলেম সমাজে পরিচিতি ও অলৌকিক কেরামতাবলী	৩৫
হযরতের প্রভাবে বিপরীত দ্রব্যে রোগ মুক্তি	৩৬
হযরতের অন্তর্দৃষ্টি ও কশ্‌ফক্ষমতার পরিচয়	৩৮

পৃষ্ঠা

হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মোহছেনিয়া মদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও মোদার্রেছ নিযুক্ত ৩৯
হযরতের কশ্‌ফ ক্ষমতায় হাটহাজারী মদ্রাসার স্থান নির্ধারণ ৪০
হযরতের প্রভাবে আহমদীয়া মদ্রাসা ও মসজিদের স্থান নির্দেশ ও পত্তন ৪০
হযরতের প্রভাবে সাগর ডুবি হইতে সামগ্রীসহ ভক্ত উদ্ধার ৪১
"আনার" প্রদানে হযরতের আশ্চর্য কেরামত ৪৩
মসজিদে হযরতকে নূরানী জ্যোতির্ময় দেখা ৪৫
হযরতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা সর্বাঙ্গ আলোড়নে ফয়েজ জারী ৪৫

▲ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নযোগে হযরতের বেলায়তের পরিচয় ৪৭
স্বপ্নযোগে হযরতের বাতেনী এলেম শিক্ষাদান ৪৮
বেলায়তী ক্ষমতায় রোগ মুক্তিতে হযরতের পরিচয় ৫০
হযরতের পদমর্যাদা ও কশ্‌ফ শক্তির পরিচয় ৫১
হযরতের ফয়েজ এর্শাদ ও পরিচয় ৫২

▲ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মওলানা কাঞ্চনপুরীর প্রতি ফয়েজ এর্শাদ ও অপূর্ব বাণী ৫৬

▲ ষষ্টদশ পরিচ্ছেদ

মহাজেরে মক্কীর সালামের উত্তরদানে অলৌকিক কেরামত প্রদর্শন ও সালাম প্রেরণ ৬১

▲ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হযরতের ছোহবতে জৈনপুরী মওলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব ৬৩
হযরতের দরবারে জৈনপুরী মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব ৬৪

▲ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রেশমী পরিচ্ছেদে মোহছেনিয়া মদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব ৬৫
তবারোক প্রদানে সন্তান দান ৬৫
কলিকাতা আলিয়া মদ্রাসার মওলানা জনাব সফিউল্লাহ সাহেব মারফত হযরতের পরিচয় ৬৬
মেয়েলোকের প্রতি হযরতের ফয়েজ রহমত এবং বেহেস্ত ও মনদীর নদীর সম্পর্কে তাঁহার তত্ত্বরোপাত ৬৬

▲ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হযরত আকদাছের বেলায়ত প্রাপ্ত প্রধান খলিফাদের নাম ৬৮

▲ বিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের জন সমাজে পরিচয় কেরামত ৭১
খান বাহাদুর ফজলুল কাদেরের প্রতি পরীক্ষার হলে রহমত বর্ষণ ৭২
সাবরেজিষ্ট্রারী পরীক্ষায় হযরতের রহমত বর্ষণ ৭৩
হযরতের অনুগ্রহে আকরম আলী চৌধুরীর সন্তান লাভ ৭৩
তবারোক মারফত সন্তান দান ৭৪

পৃষ্ঠা

মুর্দাদের প্রতি হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও দয়া ৭৫
হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবের পরিচয় ৭৫
হযরতের বেলায়তী প্রভাবে অযোগ্যকে যোগ্যতা দান ৭৮
কলা মারফত জাফর আলী শাহ্‌কে "কশ্‌ফ" শক্তিদান ৭৯
সাগর জলে হযরতের অসাধারণ প্রভাব ও খালের গতি পরিবর্তন ৮০
সাগর গর্ভেও হযরতের প্রভাব এবং শাহ্ কুলজামের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিদর্শন ৮১

▲ একবিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে এক রাতে মক্কা শরীফ হইতে চট্টগ্রাম শহরে হাজীর প্রত্যাগমণ ৮৪
আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বাড়ীতে থাকিয়া মক্কা মদিনা ছায়ের ৮৭
হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় বাহুতে হাত রাখিয়া জনৈক হাজীর অলৌকিকভাবে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন ৮৭
হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় নাজিরহাট হইতে বাজার প্রেরণ ৮৯

▲ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব ৯০
হযরতের প্রতি ব্যাঘ্রের আনুগত্যতা ৯০
হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে সাধারণ দ্রব্যে অদ্ভুত ভাবে কলেরা রোগ নিরাময় ৯১
যষ্টির প্রহারে কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ে হযরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রকাশ ৯২
যষ্টির প্রহারে আধ্যাত্মিক ফয়েজ ও অনুগ্রহ বর্ষণ ৯২
পানি তবারোক দানে গলক্ষত রোগ আরোগ্য ৯৪
তবারোক মাধ্যমে জটিল রোগ মুক্তি ৯৫
সরবত দানে হযরতের ফয়েজ বর্ষণ ও আত্মশুদ্ধি করণ ৯৬
হযরতের আদেশের প্রভাবে দুধ ও কলা খাইয়া কামড়ি রোগ মুক্তি ৯৭
রুটি প্রদানে ফয়েজ এনায়ত ৯৭

▲ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের অপূর্ব কেরামত-ব্যাঘ্রের কবল হইতে প্রাণ রক্ষা ৯৮
হযরতের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রভাবে ব্যাঘ্রের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার ৯৯
হযরতের যষ্টির প্রহারে ফয়েজ-রহমত দান ও মৃত দেহের প্রাণ সঞ্চার ১০০
হযরতের বেলায়তী প্রভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত ১০১
হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে গরুর দুগ্ধ তিক্তস্বাদে রূপায়িত ১০১
হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে বন্য-জন্তুর কবল হইতে ইক্ষু ক্ষেত রক্ষা ১০২
ধান্য ক্ষেত হেফাজতে হযরতের প্রভাব ১০৩
হযরতের পবিত্র জুতা মোবারকের ধূলায় দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় ১০৩

▲ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কাঁঠালের অর্ধাংশ রাখিয়া বাকী অংশ ফেরত দানে কশ্‌ফ শক্তির পরিচয় ১০৪

পৃষ্ঠা

হযরতের প্রভাবে দোয়াতের মাধ্যমে জীবিকার্জন ১০৪
টাকার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার ও কর্জ হইতে মুক্তিদান ১০৫
উকিল বাবুর প্রেরিত কলা রাখিয়া দুগ্ধ ফেরত ১০৬
হযরতের নির্দেশে হিজরতে বিস্ময়কর উন্নতি ১০৭
সুদ খোরের পয়সা নিক্ষেপান্তে দেহে প্রভাব বিস্তার ও রহস্যময় কেরামত প্রদর্শন ১০৭
হযরতের অলৌকিক প্রভাবে বৃষ্টি বারি বরিষণ ১০৮
হযরত কেবলার বেলায়তী প্রভাবে ষ্টিমার রক্ষা ও মহামারী নিবারণ ১১০

▲ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের বেলায়তী প্রভাবে মৃত্যুকালে আজরাইল ফেরত ও ষাট বৎসর আয়ু বৃদ্ধি ১১২
হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় আজরাইল হইতে রক্ষা ও মৃত্যুর সময় পরিবর্তন ১১৪
মৃত্যুকালে হযরতের দর্শন দানে ছকরাতি কষ্ট লাঘব ও ঈমান রক্ষা ১১৪
মৃত্যুকালে দর্শনদানে ঈমান রক্ষা ১১৫
মৃত্যুকালে হযরতের দর্শনদান ১১৫

▲ ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

খাদ্যের মধ্যে হযরতের প্রভাব ১১৬
হযরতের প্রভাবে অল্প খাদ্যে তৃপ্তি ১১৭
হযরতের অল্প দ্রব্য অসংখ্য লোকের মধ্যে বন্টন ১১৭
হযরতের প্রভাবে ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত সুযোগ অর্জন ১১৮
হযরতের আদেশে হিজরত করিয়া অপূর্ব অর্থশালী ১১৮
হযরতের আদেশে রেয়াজউদ্দিন উকিলের ভূ-সম্পত্তি খরিদ ও রেয়াজউদ্দিন বাজারের পত্তন ১১৯
হযরতের বাক্য সিদ্ধি ও কশ্‌ফ কেরামতে নিরুদ্দেশ প্রাপ্তি ১২০
মূর্খের প্রতি কোরান পাঠের আদেশে অদ্ভুত কেরামত ১২১
হযরতের বাক্যে আশ্চর্য রহস্য ও কেরামত ১২১
হযরতের বাক্য সিদ্ধি ও দোয়ার ফল ১২২
মানব অন্তরে হযরতের আশ্চর্য প্রভাব ১২২
হযরতের কার্যে অন্তর্যামীর নিদর্শন ১২৩
হযরতের অন্তর্চক্ষু ক্ষমতার অলৌকিক পরিচয় ১২৩
অলৌকিক প্রভাবে একজনকে পানি পড়া দানে অপরের রোগ মুক্তি ১২৪
পরীক্ষকের উপর হযরতের প্রভাব বিস্তারে অদ্ভুত কেরামত ১২৫
হযরতের অসাধারণ ক্ষমতা-হাকিমের অন্তরে প্রবেশ ও মোকদ্দমার রায় প্রদান ১২৫
হযরতের আশ্চর্য কেরামতে বগলের নীচে কা'বা শরীফে মুছল্লি প্রবেশ করিতে দেখান ১২৬
হযরত খিজির (আঃ) এঁর সঙ্গে হযরতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ১২৭
৫৯ মঘির প্রলয়ঙ্করী ঝড়-তুফানের ভবিষ্যদ্বানী ১২৭
বিনা ঔষধে হস্তপঁচা ও ক্ষতনালী রোগ আরোগ্য এবং হযরতের বাক্যে আশ্চর্য কেরামত ১২৮

পৃষ্ঠা

▲ **সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ**

হযরতের আচার আলাপ ও ভাব ভঙ্গি ১২৯
পাহাড়ীয়া চাকমা জুমিয়া প্রভৃতি জাতির প্রতি হযরতের ব্যবহার ১২৯
মজহাবী মাহ্‌ফিলে হযরতের অদ্ভুত উপস্থিতি ১২৩
জনাব মুন্সেফ সৈয়দ আমিন উদ্দীন সাহেবের জানাজায় হযরত ১৩০
জনাব হায়দার আলী গোমস্তা সাহেবের জানাজায় হযরত ১৩০
ছুফী মমতাজ আলীর জানাজায় হযরত ১৩১
হযরতের মজহাবী মছায়েলার উত্তর দান ১৩১
ফিতরার মছায়েলার উত্তর ১৩১
বাহাছ মোনাজেরা ১৩২
ফাতেহাখানি মছায়েলায় হযরতের উত্তর ১৩৩
শরিয়ত পালনে হযরত ১৩৩
পারিবারিক মোয়ামেলাতে হযরতের আপোষভাব ১৩৪
অতিব্যয় অত্যানন্দ ও সংসার ধর্মে অনাসক্তি ১৩৪
হযরতের পর-দুঃখ কাতরতা ১৩৪
সকলের প্রতি হযরতের দয়ার্দ্রভাব ও শিষ্টাচারিতা ১৩৬
বিলাসী পোষাক-পরিচ্ছেদ ও অলঙ্কার পরিধানে হযরতের অসম্মতি ১৩৬
হযরতের ধর্মনিরপেক্ষতা ১৩৬
হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ চৌধুরীকে স্ব-ধর্মে দীক্ষা ও উপদেশ দান ১৩৭

▲ **অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ**

হযরতের শান ও বেলায়ত মর্যাদার পরিচয় ১৩৮
হযরতের পৌত্রের প্রতি অবর্ণনীয় অনুরাগ ও প্রীতির নিদর্শন ১৩৯
হযরতের পৌত্রের শানে রহস্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী ১৩৯
হযরতের গাউছিয়ত স্বীকৃতি ১৪০
হযরতের উত্তরাধিকারী খলিফা নির্ণয় ও গদী অর্পণ ১৪০
হযরতের পৌত্রের মর্যাদা নির্দেশে তাঁহার নবী অবয়বতার পরিচিতি ১৪১
হযরতের নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবাজান কেবলার প্রতি ফয়েজ বর্ষণ ও খেলাফত স্বীকৃতি ১৪২
হযরতের হাকিকত রহস্যময় জজ্‌বাতী কালামে স্বমর্যাদা নির্দেশ ও উপদেশাবলী ১৪২
দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিতে নবীর অবয়ব দৃশ্য ১৪৪
হযরতের বেলায়ত মর্যাদার দৃশ্য ১৪৬
প্রভাব বিস্তার ও ফয়েজ বরিষণের স্বরূপ ১৪৭
কেরামত গুরুত্ব ১৪৮

▲ **ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ**

বিশ্ব মানবের প্রতি হযরতের অবদান

পৃষ্ঠা

নিরপেক্ষ তৌহিদ দ্বার উদ্ঘাটন ১৫০
খোদার একত্ব পথের সন্ধানের প্রেরণা দান ১৫১
একত্ব পথের সহায়ক নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা ১৫১
আউলিয়া বুজুর্গানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন ১৫২
হযরতের শানে মওলানা জুলফিকার আলী সাহেবের নাতিয়া ১৫৩
অশ্লীলতা মুক্ত-ভাব জনিত গীতি জগত ১৫৪

▲ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের ওফাত এবং আল্লাহতা'লার "মহাজাতে" মিলন ১৫৭
হযরতের ওয়ারেছ ১৫৭

▲ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সমাধিস্থ অবস্থায় হযরতের অলৌকিক কেরামত ও ফয়েজ রহমত দান ১৫৮
ওফাতের পরে হযরতের প্রত্যক্ষ দর্শন দান ১৫৮
ভক্তিপূর্ণ আবেগের প্রতি-উত্তরে হরিণ দানে ভক্ত বৎসলতার নিদর্শন ১৫৯
মহাসাগর গর্ভে হযরতের প্রভাবে জাহাজ ডুবিতে আরোহী উদ্ধার ১৬০
হযরতের প্রভাবে মৃগীরোগ আরোগ্য ১৬১
হযরতের ওরশ শরীফে উট বুকিং-এ আশ্চর্য কেরামত ১৬১
হযরত কর্তৃক স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হইতে নিরাপদে রাখার আভাস ও অভয় দান ১৬২
হযরতের কালাম ও "কবা" মারফত প্রভাব বিস্তারে বিস্ময়কর কেরামত ১৬৩
দরবার শরীফে নবাগত ব্যক্তির প্রতি অপূর্ব দর্শন দানের কেরামত ১৬৪
হযরত কর্তৃক পূর্ব হইতে ঠিক সময়মত সওগাত প্রেরণ ও অতিথি সেবা ১৬৫
হযরতের প্রভাব ও গাউছিয়ত ক্ষমতার পরিচয় ১৬৬
হযরতের প্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি ও মৃত্যুবরণ ১৬৬
মাজার শরীফ জেয়ারতে নবী করিম (সঃ) এঁর রওজা মোবারকের সাদৃশ্য মাহাত্ম্য ১৬৮
দারুল উলুম মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মোদাররেছ মওলানা নজির আহমদ সাহেবের অভিমত ১৬৮
হযরতের প্রতি দেওবন্দি মওলানা অলি আহমদ নেজামপুরী সাহেবের অভিমত ১৬৯
শ্রেষ্ঠ কেরামত ১৭০

▲ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বার্ষিক ওরশ শরীফের দৃশ্য ১৭১
তবরুক বিতরণ ১৭২
পবিত্র ওরশ শরীফে নেয়াজ-ফাতেহার প্রচলন, ধরণ সংক্রান্ত ইঙ্গিত মূলক হযরত আকদাছের ভবিষ্যদ্বাণী ১৭২
হযরত আকদাছের তরিকত পরিচয় ১৭৩
সজরায়ে আহমদিয়া কাদেরীয়া গাউছিয়া

▲ পরিশিষ্ট

প্রথম সংস্করণ প্রকাশকের বিবৃতি ১৭৫

بسم الله الرحمن الرحيم

জীবনী ও কেরামত

প্রথম পরিচ্ছেদ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى حَبِيْبِهِ الَّذِيْنَ سَلَكُوْا طَرِيْقَهٗ

প্রাকৃতিক অবস্থা

বিশ্বস্রষ্টা মহান প্রভুর কি বিচিত্র লীলা! সৃষ্ট মানবের কি বিচিত্র অবস্থান! কতই যে তাহাদের পরিবর্তন! কতই না রহস্যময় কৌশলে তাহাদের উথান ও পতন। মহা কৌশলে করুণাময়ের করুণা চক্রেই তাহাদের দোজাহানের সুখ-শান্তি ও দুঃখ গ্লানি নিহিত। তাঁহার কৃপা বিন্দুতেই এই মহান শ্রেষ্ঠ জাতির সৃজন পালন রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই তাহাদের উদ্দেশ্য ও কাম্য। তাহারাই একমাত্র প্রভুর উদ্দেশ্য ও পোষ্য। তাই তাহাদের খাতিরেই এই বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃজিত ও সংরক্ষিত।

তাঁহার সর্বসৃষ্টি স্বভাবতঃ পরিবর্তনশীল ও ক্ষণ-ভঙ্গুর। এই পরিবর্তনশীল জগতে যুগে যুগে অলি ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বরিক শক্তির অভাবে চতুর্বিধ পার্থিব পদার্থে গঠিত মানব নানাভাবে বিভিন্নমুখি নাছুতি স্বভাব, রিপূ ও ইন্দ্রিয় জালে স্বভাবতঃ জড়িত হইয়া পড়ে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য, গুরুদায়িত্ব ও প্রেম প্রীতি ভুলিয়া ভব প্রকৃতির ধাপে ধাপে বিপথে, বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

মানব-কান্ডারী জগতগুরু মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর অন্তর্ধানের প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর কাল পর ছয় শত শতাব্দীতে যখন ধরণীর বুকে ধর্মীয় জগতে খোদাপ্রেম প্রেরণা ধর্মীয় আলোক রশ্মি নির্জীবতা ও অজ্ঞানতার আবরণে আচ্ছাদিত হইতেছিল, তখন যুগোপযোগী আধ্যাত্মিক সবল হাদীর অভাবে ইসলাম রবি অস্তমিত প্রায় ডুবুডুবু অবস্থায় উপনীত হইতেছিল। আদল, সৎজ্ঞান ও ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বিহনে ধর্মাগ্রহী মুসলিম সমাজ বহুবিধ ধর্ম মতবাদী ধর্মীয় পন্থায় বিভ্রান্ত ও ধাঁধায় পতিত হইয়া নিষ্প্রাণ ধর্মনীতি পালনে এ'দিক ও'দিক ঢলিয়া পড়িতেছিল। এ'হেন মহা সংকট মুহূর্তে দয়াময় খোদাতা'লা তাঁহার চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আধ্যাত্মিক করুণা-প্রেম প্রেরণাধারী বিশ্ব

অলি হাদীকুল শিরমণি হযরত গাউছুল আজম মহিউদ্দিন শাহ্ সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) কে ধর্মনীতি সংস্কারক, পুনঃ ধর্মসঞ্জীবক মহিউদ্দিন খেতাব ও ক্ষমতা দানে ভবে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারই আধ্যাত্মিক প্রভাবালোকে মোছলেম ধর্মীয় জগত পূর্ণোজ্জ্বল ও সজীব হইয়া পুনর্জীবন লাভ করে। তিনি তাঁহারই বেলায়ত প্রভাবে অনুকূল শাসন শক্তির সহায়তায় শরিয়ত মোতাবেক বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে টানিয়া আনিয়া নবজীবন দান করিয়া সুপথগামী করিয়াছিলেন।

ইহার সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচশতাধিক বৎসর কাল পর, আবার মুসলিম জাহান সনাতন ইসলামিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান খোদায়ী প্রেরণা শক্তি ও সময়োপযোগী মৃত সঞ্জীবক যুগসংস্কারক শক্তিশালী হাদীয়ে কামেল রূপী সূর্যের আধ্যাত্মিক রশ্মির অভাবে পতিত হয়। এবং ধীরে ধীরে খোদা প্রেম প্রেরণা হারা হইয়া ধর্মনীতি পালনে এবং আধ্যাত্মিকতায় অনাসক্ত ও উদাসীন হইতে থাকে। মুসলিম জাহান পার্থিব মোহ, রিপু ও ইন্দ্রিয় প্রভাবে বিভোর হইয়া "তাকওয়া" ও বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিতে থাকে। খোদাভীতি ও প্রেমপ্রীতি ভুলিয়া আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া অতি সুখ, অতি বিলাস ও অতি লোভে নানা প্রকার শঠামী পন্থা অবলম্বনে অন্যায় ও অবৈধ আচরণে লিপ্ত হইতে থাকে।

ঠিক এমন সময় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর বাংলায় এবং কিছু কালের মধ্যে সমগ্র ভারত এমন কি ভূখণ্ডের প্রায় অঞ্চলে ইংরেজ শাসন ও প্রভাব প্রবর্তিত হয়। সমস্ত ধর্মীয় প্রভাব ও প্রভাবে পরিচালিত শাসন শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কালক্রমে এক নূতন ধর্মবিহীন রাষ্ট্রনীতির পত্তন হয়। এই সময়ে ধর্মীয় আহকাম, বাধাগড়া শরীয়ত শাসন শক্তি সহায়তা হারাইয়া প্রাধান্যতা ও ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ে। দায়িত্ব কেবল মাত্র বিবেক ও সৎজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হইয়া দাঁড়ায়।

এই যুগে নির্জীব ধর্মীয় মানবকূল খোদায়ী দায়িত্ব, বিচারবুদ্ধি, খোদাভীতি ও পরকালীন পরিণতি ভুলিয়া নাছুতী স্বভাবকাম্য নীতিতে পরিচালিত হইতে থাকে। ভবস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবাদতে মালী-জাকাত, ছদকা, কোরবাণী, আমানত আদায় প্রভৃতি তাহাদের স্বভাবগত ইচ্ছার একেবারে প্রতিকূলে গিয়া দাঁড়ায়। পরকালীন স্বার্থ নিহিত এবাদতে-বদনী একমাত্র তাহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া পড়ে।

ক্রমে তাহারা ধর্মীয় প্রেরণা-খোদাভীতি ও ধর্মাচরণ হইতে দিন দিন দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে। এবং যুগের তালে তালে বিধর্মীয় আচরণ ও সভ্যতাকে নিজ কৃষ্টিভূক্ত করিতে থাকে। কাজেই বিপরীত সাজে সজ্জিত জীবনহীন ধর্মাচার কেবল মাত্র ধর্ম নামের বোঝাবাহী স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আবার কেহ কেহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান প্রভাবে পড়িয়া অজ্ঞতার চাপে বিজ্ঞান শক্তির উৎস বুঝিতে না পারিয়া খোদার অস্তিত্ব ও নবী-অলির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বসে। ইহাতে তাহারা খোদার অভিশপ্ত জাতিতে পরিগণিত হইয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরিয়া, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক চরিত্র হারা হইয়া পশু ও পুতুল সদৃশ্য ব্যবহৃত হইতে থাকে।

ফলে খোদার অভীপ্সিত শাস্তি, অভাব অনটন লাঞ্ছনা গঞ্জনা এবং পদদলনে জর্জরিত হইয়া ধনমাল বিবর্জিত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্মভূমির প্রাকৃতিক অবস্থান

পরম করুণাময় প্রভুর অপার করুণা। দয়ালু দাতার অপরিসীম দান। তাঁহার কার্যকলাপ মানব ধারণার অতীত। যাহাকে তিনি ভালবাসেন তাঁহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা তিনি নিজ হাতেই করিয়া থাকেন। তাহাকে তিনি তাঁহার সর্বোচ্চ শান্তি নিকেতনে স্থান দিয়া থাকেন। তাঁহারই খাতিরে দোজাহানে অতুলনীয় স্বর্গের সংস্থান ও পত্তন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই কারণে সর্বপ্রকার নেয়ামতপূর্ণ অবদান সুরক্ষিত। তাঁহার মাহবুব কাহারো মুখাপেক্ষী হইতে তিনি কিছুতেই রাজী নহেন। তাঁহাকে সকল জাতির মাননীয় ও সর্বপ্রকার ভক্তিভাজন করিয়া সেবার পাত্র করাই তাঁহার বাসনা। তাঁহার উছিলায় সকল সৃষ্টজীবে কৃপাকণা বিতরণে তাঁহার মহিমা বিস্তারই একান্ত কামনা।

তাই ভূমন্ডল মধ্য রেখার পূর্বকূলে এশিয়ার প্রাচ্যদেশে চীনা, বর্মী, মগ, চাকমা, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আবাস ভূমির সংমিশ্রণে ও মধ্যস্থলে, চীন পাহাড়ের পাদদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল চট্টগ্রামের মধ্যখানে রাম লক্ষণ সীতাদেবীর স্মৃতি জড়িত সীতাকুণ্ডের পূর্বাঞ্চলে, সকল জাতির মিলন কেন্দ্র করিবার অভিপ্রায়ে মহান আল্লাহতা'লা তাঁহারই প্রিয়তম মাহবুবের জন্মভূমিকে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া তোলেন। ইহাই ইবনে বতুতার সবুজ শহর। আরববাসী ব্যবসায়ীদের "ছত্ত্বলা"। পাহাড়ীয় আহম জাতীদের ছাতংগং "শান্তিসেরা"। বদরশাহ্ ও উর্দু কবি বর্ণিত চাঁটগাম। হিন্দুদের কথিত চট্টলা। ইংরেজদের লোভনীয় সুপরিচিত স্বাস্থ্যনিবাস চিটাগাং। মোসলেম বাংলায় প্রচলিত চট্টগ্রাম। এবং মোসলিম নরপতিদের প্রিয় আবাদী ভূমি ইসলামাবাদ। ইহা পৃথিবীর অতুলনীয় ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুপরিচিত প্রাকৃতিক সুরম্য লীলা নিকেতন। সাগর উপসাগর নদ নদী নির্ঝরিণী অহরহ সুস্নিগ্ধ অমৃত তুল্য পানীয় যোগায়। পাহাড় পর্বত উপত্যকা প্রভৃতি ইহাদের পুষ্প মাল্যে বিভূষিত করিয়া ইহাদের সেবায় রত ও দন্ডায়মান আছে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দ্বীপ উপদ্বীপ ও সমতল প্রাঙ্গন আনন্দে ইহার আহার্য যোগায়। ইহার শান্তিময় বক্ষে সকলকে স্থান দিয়া নিয়তঃ দয়াময়ের অপার করুণার যশোগান করিতে সুযোগ দেয়।

এ মহা পুরুষের শুভাগমন সংবাদে ইহার যৌবন যেন পুলকানন্দে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। যাঁহার অভিনন্দন-প্রতীক্ষায় যুগ যুগান্তর ধরিয়া নবনিত্য সাজে সজ্জিত হইতেছে, যাঁহার পবিত্র চরণ চুম্বনে অভিবাদন করিতে সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সুদৃঢ় ভাবে দন্ডায়মান থাকিয়া-পথ পানে তাকাইয়া রহিয়াছে, যাঁহার বিলম্বাগমনে বিরহক্রন্দনে নয়ন বারিধারায়

নদী বহিয়া সাগর বক্ষ পরিপূর্ণ করিতেছে, আজ তাঁহার আগমনে খোশ আমদেদ জানাইবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এই পূণ্য ভূমিতে দয়াময়ের প্রিয়তম বন্ধু ও মাহবুব ভাবী গাউছুল আজম আল্লাহতা'লার ইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাই তাঁহার কৃপাকণা লাভের অভিলাষে তাঁহারই গৌরবময় সিংহাসন অত্যুজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাকে যথাযথ অভিবাদনে সম্মান প্রদর্শন মানসে অসংখ্য সাধক অলি মুনিঋষিগণ যেন পূর্ব হইতে এই পূণ্য ভূমিতে স্ব-স্ব আসন গ্রহণে ইহাকে সু-সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। অত্র কারণেই- এই চাটগামকে আউলিয়া দরবেশগণের জন্মভূমি সাধনাগার ও সমাধি নিকেতন বলা হয়। তাঁহারা যেন আশুবিশ্বঅলির আসনের চতুষ্পার্শে আসন পাতিয়া তাঁহারই এন্তেজারে তাঁহার শুভ-আগমন কামনা করিতেছিলেন।

তিনি যেই থানায় বিকাশ লাভ করিলেন, ইহার নাম ফটিকছড়ি, যাহার বক্ষের উপর দিয়া স্বচ্ছ সুপেয় স্ফটিকবৎ জলধারায় পরিপূর্ণ অসংখ্য স্রোতস্বিনী প্রবাহিত আছে। স্বভাবত এই জলধারাঃ ধরণীর বুকে বেহেস্তের "ছালছাবিল জান জাবিল" তুল্য স্নিগ্ধ হজমী ও সুপেয়। ইহা ঝরণারূপে পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপত্তি হইয়া দেশের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া সাগর পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই দেশের বর্ষা প্রকৃতি, প্রেমের উন্মাদনায় যখন নদী গিরি, বন, জল বরিষণে প্লাবিত করিয়া দেয়, তখন এই স্নিগ্ধ নহরগুলির মাতাল স্রোত ক্ষিপ্ত গতিতে বহিয়া আনে পাহাড়ীয় সম্পদ রূপী উর্বরা পলিমাটি। উহারা ঐ পলিমাটি, যাওয়ার পথে সমতল ভূমিকে দিয়া যায়। আর দিয়া যায় তাহাদের দ্বারা বাহিত কচি কচি মৎস্য রাজি। ইহার বদৌলতে এই দেশবাসী বর্ষার পর আল্লাহ বর্ণিত "আশরা আমছালাহা" দশগুণ পরিশ্রমের প্রতিদান ও সঞ্চিত মৎস্য আহরণে পরম সুখে সানন্দে আল্লাহতা'লার গুণকীর্তন করিতে থাকে। তাই স্নেহমায়া পাহাড়ী নহর বক্ষে রাখিয়া এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় ফটিকছড়ি। এই সমস্ত পাহাড়ী নহরগুলির প্রভাবে এই দেশ অপেক্ষাকৃত সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা ও মনোরম দৃশ্যে সুশোভিত এবং দেশবাসীর অবস্থা অতি শান্তিময় ও স্বচ্ছল।

দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেই পবিত্র গাঁয়ের বুকে তিনি লালিত-পালিত হইয়া বসবাস করেন, উহার নাম "মাইজভাণ্ডার"। ইহা ইছাপুর পরগণার অংশ বিশেষ। মগ মুসলিম সংগ্রামকালে মগশক্তির বিরুদ্ধে অভিযানকারী মুসলিম সৈনিকদের খাদ্য ও যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহের জন্য উত্তর চট্টগ্রামে কয়েকটি সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হয়। তৎমধ্যে ইহাই ছিল মধ্য এলাকায় অবস্থিত। তাই ইহা মাইজভাণ্ডার বা মধ্য এলাকাস্থিত রেশন ও সামগ্রী সরবরাহ আগার বা ভাণ্ডার নামে সুপরিচিত হয়। আল্লাহতা'লার রহস্যমাখা লীলা বুঝা বড়ই দুস্কর। ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়ের সু-সাংকেতিক বিকাশ। কালে যাহাকে তিনি বিশ্বমানব জাতির পার্থিব রিপু জনিত গোপন শত্রুর সঙ্গে মহা সংগ্রামে অভিযানকারিকে প্রেম প্রেরণারূপী খাদ্য ও ঈমানরূপী যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করিবেন,-যাহাকে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণ শক্তি কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; তাঁহাকে তিনি আজ মহামুসলিম অভিযান শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র করিয়া দেখাইলেন। বিশ্ব অলি মাইজভাণ্ডারী যেই ভাণ্ডারে বসিয়া বিশ্বমানবের অভাব অভিযোগ আপদ বিপদ ও সংগ্রামে সাহায্য এবং শক্তি সরবরাহ করিবেন-তাহার নাম হইল "মাইজভাণ্ডার"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিকাশ গুরুত্ব

দৃশ্য ও অদৃশ্যমান জগতের প্রভু! পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা যখন প্রেমের উন্মাদনায় মত্ত হইয়া প্রেমলীলায় প্রভুত্ব বিস্তার অভিলাষে নিজ নূরে, "নূরে মোহাম্মদী" সৃজন করিলেন তখন উহা তাঁহার লুপ্ত জগতে সুরক্ষিত ছিল। গুপ্ত প্রেমের লুপ্ত লীলায় তাঁহার তৃপ্তি হইল না। বিচ্ছেদ বিনা তাঁহার প্রেমসাধ ফুটিয়া উঠিল না। তাই তিনি "মোহাম্মদী নূরে" সৃজন করিলেন সমস্ত সৃষ্টি। তাঁহারই সমীপে উপস্থিত করিলেন সমস্ত সৃষ্টি, পরীক্ষা করিতে প্রথম বারের মত দীপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,-"আলাছতো বেরাব্বেকুম"? আমি কি তোমাদের প্রভু নই? এক সুরেই প্রতি উত্তর হইল-"বালা"-হাঁ তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু। খোদার নূর মোহাম্মদী জাতি এই ভাবে প্রথম পরীক্ষায় অদৃশ্যমান জগতে উত্তীর্ণ হইল। তিনি দৃঢ় সংকল্প করিলেন তাহাদের এই বিশ্বক্ষেত্রে ভবলীলায় পাঠাইবেন। এবং শেষ বারের মত প্রেমের পরীক্ষা করিয়া নিজ বন্ধুত্বে বরণ করিয়া লইবেন। এবং বিরহ বিচ্ছেদে প্রেম মিলনে চিরতরে একত্বে মিশাইয়া তাঁহার লীলাচক্র সাঙ্গ করিবেন। দৃশ্যমান জগতে পাঠাইতে হইলে তো-আকার নিশ্চয় দরকার! তাহারা তো নূরী। নৈরাকারই আছে। স্থির করিলেন, মুহাম্মদী গঠন হইবে তাহাদের নির্দিষ্ট আকার। এই আকারেই তাহাদিগকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাইবেন। মহাপ্রভু আল্লাহরই স্বরূপ মোহাম্মদী আদম ছুরত। সেই ছুরতেই সৃষ্টি করিলেন আদি পিতা আদম। তাঁহারই "ফরমাতে" গঠন হইবে সমস্ত মানবজাতি। পার্থিব অভিনয় ক্ষেত্রে তাহাদের কিছুকাল থাকিতে হইবে। পার্থিব সংশ্রব তাহাদের অনেকটা দরকার। তাই সিদ্ধান্ত হইল, চতুর্বিদ পার্থিব পদার্থের সংমিশ্রণে মানব আকৃতি গঠন, উহা কার্যকরী করা হইল। মৃত্তিকা, অনল, জল ও পবন, এই চারি প্রকার ভবপদার্থে- সৃষ্টির সেরা আদম-প্রতিমা গঠিত হইল। ইহাতে তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন-তাঁহার প্রবল জাতি নূরী ক্ষমতা "রূহ্"। যাহার প্রভাবে আদম প্রতিমা সজীব ও আলোকিত হইয়া গেল। আদমকে আল্লাহ তাঁহার প্রতিনিধিত্বে বরণ করিবেন। তাই তাঁহার মধ্যে আল্লাহ্তা'লার সমস্ত রূপের গুণজ আলো দান করিলেন। ইহাতে হইল খোদায়ী খেলাফত শক্তি-প্রতিনিধিত্বের পত্তন। ইহা হইল মানবদেহে আল্লাহতা'লার বেলায়তী ক্ষমতা ভিত্তি। এখন আল্লাহ তাঁহার ক্ষমতা ও খেলাফত অর্পিত সাকার আদমকে নিরাকার সমস্ত সৃষ্টি ও ফেরেশতাগণের প্রতি সেজদায় অবনত মস্তকে তাঁহার খেলাফত ও প্রাধান্য মানিয়া লইতে আদেশ দিলেন। সকলেই তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া আদি পিতা আদম

খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকারে মস্তক অবনত করিল। কিন্তু ফেরেশ্‌তা সর্দার আজাজিল অহংকারে তাঁহার প্রাধান্য মানিল না। ইহাতে হইল সে পদচ্যুত অভিশপ্ত শয়তান। এই সময় হইতেই আদম জাতীর বিরোধী দলের সৃষ্টি। ইহাতে হইল আদমের প্রতি তাহার আক্রোশ। এইবার আল্লাহ্‌ আদমের আড়ালে গোপনে বসিয়া সৃষ্টিকে দ্বিতীয় বারের মত পরীক্ষা করিয়া নিলেন। আদমকে তিনি "বেহেস্তে"-শান্তি নিকেতনে স্থান দিলেন।

পরস্পর বিপরীত চার প্রকার ভব পদার্থে গঠিত মানবদেহে স্বভাবতঃ সপ্ত নফ্‌ছ একে অন্যের প্রবল বিরোধী রিপুর উন্মেষ হইয়া বসিল। আম্মারা, লাওয়ামা, মোলহেমো, মোতমাইন্না, রাজিয়া, মর্জিয়া ও কামেলা এই সাত প্রকার রিপু তাহার মধ্যে সঞ্চার হইল।

মানব জাতি এই সপ্ত প্রকৃতির প্রভাবে পরিচালিত হইতে বাধ্য। ইহাতেই উৎপত্তি হইল সপ্ত প্রকৃতির মানুষ। কাফের, মোশরেক, ফাছেক, মোয়াহিক্‌ মোমেন, মোমেনে ছালেহ, অলি ও নবী। এই সাত প্রকৃতির গঠনের মানব চরিত্র স্বভাবতঃ গঠিত হইবার কারণ হইয়া উঠিল।

তাহাদের উপযুক্ত সংস্থান তো নিশ্চয় দরকার। তাই তাহাদের জন্য সৃজিত হইল, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাত প্রকার জান্নাত ও সাত প্রকার দোজখ। আল্লাহতা'লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকে দোজখগামী করা তো তাঁহার মোটেই ইচ্ছা নয়। তাই তিনি নির্দেশিত করিলেন সুপথ ও কুপথ। ইহাতে আইন কানুনের একান্ত প্রয়োজন হইল। পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা আইন প্রণয়ন করিলেন। ইহার নাম দীনে ইসলাম। মহাশক্তির সামনে ক্ষুদ্র শক্তি মাথা নত করা। বিশ্বস্রষ্টা মহাশক্তিমান প্রভুর নিকট তাঁহার সৃষ্ট ক্ষুদ্র শক্তি অবনত মস্তকে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া দাসত্ব মানিয়া নেওয়া। এবং তাঁহার ক্ষমতায় ক্ষমতাশীল প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব অকাতরে মানিয়া নেওয়া। ইহাতে অশান্তি নিবারন হইয়া শান্তি বিরাজমান হয়। ইহাতে বিশৃঙ্খলা নিবারিত হইয়া শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। ইহাই হইল খোদার রচিত পদ্ধতি শান্তিময় "ইসলাম।" ইহা কাহারও ব্যক্তিগত সাম্প্রদায়িক শরিয়ত বা আইন নহে। ইহা সার্বজনীন একমাত্র খোদা প্রদত্ত নীতি সনাতন ইসলাম। ইহাই বাস্তব সত্য ও সত্য পথের দিশারী। ইহার পরিচালনা প্রচেষ্টায় নবী, অলি, মোজাদ্দেদ ও এমামের অবির্ভাব হয়।

আল্লাহতা'লার আধ্যাত্মিক জগতের সাধারণতঃ চারিটি স্তর আছে। আলমে লাহুত, আলমে জবরূত, আলমে মালকুত ও আলমে নাছুত বা পার্থিব জগত। মানব চরিত্রের মধ্যেও চারি প্রকার স্বভাবের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। রহমানী, মালকানী, হায়ওয়ানী ও শয়তানী।

হযরত আদম (আঃ) যখন শয়তানের প্ররোচনায় শয়তানী প্রকৃতির অধীন হইয়া রহমানী স্বভাবের প্রাপ্য স্বর্গের সর্বোচ্চ সিংহাসন হইতে শয়তানী স্বভাবের যোগ্য মোকাম, আলমে নাছুতে আসিয়া পড়িলেন, তখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া খোদার দরবারে পুনঃ তাঁহার রহমানী মোকাম জান্নাত অর্জনের জন্য কাতর কান্নায় রত হইলেন। ইহাতে আল্লাহ তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন-"ইম্মা এয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদাম"-অর্থাৎ তুমি এবং

তোমার জাতিকে পুনরুদ্ধার করিয়া আনিতে আমার নির্দেশিত সুপথ তোমাদের নিকট অর্পিত হইবে।

আল্লাতা'লার জাতি নূরে সৃষ্ট মোহাম্মদী মহামানব যদিও উহার খোলস আদমছুরত পার্থিব পদার্থে গঠিত, তবুও উহাকে স্বভাবমুক্ত নূর করিয়া স্বজাতে মিশাইয়া লইতে তিনি সর্বদা সজাগ ও চেষ্টিত। তাঁহার প্রিয় মাহবুব মোহাম্মদী গঠনকে বিপদগামী করিতে তিনি কিছুতেই রাজি নহেন। দ্বিতীয় সুপথ প্রদানের জন্য তিনি আদমের নিকট প্রতিশ্রুত।

তাই তিনি প্রতি যুগে, প্রতি আদম গোত্রে, বিভিন্ন নবী অলি যোগে তাঁহার রচিত ইসলামিক ভিত্তিতে ছহিফা কেতাব নামক আইন দপ্তর পাঠাইয়া আদম জাতিকে সজাগ ও সুপথ নির্দেশ করিয়াছেন।

নবুয়ত এক বিশিষ্ট পদমর্যাদা। মহাপ্রভু যুগ কাল ও কওম অনুযায়ী কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাহাকে নবুয়ত ক্ষমতা দান করেন। ইহা একমাত্র আল্লাহতা'লার দান; তাঁহার নির্বাচন ও দয়া। কেহ ইহা কামনা ও সাধনা করিয়া অর্জন করিতে পারে না। ইহা স্থানান্তরিত, পরিত্যক্ত ও নষ্ট হয় না। কোন নবী পদচ্যুত পথভ্রষ্ট হয় না। কারণ আল্লাহতা'লার নির্বাচন যথাযথ ও নির্ভুল। ইহা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারাই সমাধা হইয়া থাকে। নবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নবুয়ত কার্য সমাপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় না। শুধুমাত্র কিছু দিন উহার ফলই বাকী থাকে। উহা ইসলামের বাহ্যিক দিক মাত্র। ফেরেস্তা জিব্রাইল মারফত অহির দ্বারা ভালমন্দ জানিয়া চিনিয়া জনসাধারণকে উহা জ্ঞাত করাকেই নবুয়ত বলে। নবুয়ত দুই প্রকার। নবুয়তে খাচ্চা ও নবুয়তে আম্মা। নবুয়তে খাচ্চাঃ - যাহারা নবুয়ত ও রেছালত উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া মোরছেল, তাঁহাদের উপর কানুন সংক্রান্ত কেতাব অর্পিত হয়। তাঁহারা শুধু দৃশ্যমান জগতেই প্রচার কার্য করিতে সক্ষম। নবুয়তে আম্মা-যাহারা মোরছেল নন্ বরং ছহিফা প্রাপ্ত সাধারণ নবী। নবীদের মধ্যে খোদাদাদ শক্তি বেলায়তও থাকে; যাহা খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব রহস্যময় বেলায়তী সম্পর্ক বা গুণ। তাই নবীগণ অলিগণ হইতে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আদেশ-নিষেধ মূলক কার্যই তাঁহাদের প্রধান। বেলায়ত খোদায়ী শক্তি ও তাঁহার রহস্য জ্ঞান বলিয়া নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটন সহজতর হয়। তাই এল্‌কা ও এল্‌হামের দ্বারা খোদাতা'লার প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার গুপ্ত ব্যক্ত রাজ্য সমূহের শৃঙ্খলা ও শান্তি বিধানের ক্ষমতা অর্পিত হওয়াকেই বলে বেলায়ত। বেলায়ত আদেশ নিষেধের বিধান অপেক্ষা-মূলরহস্য উদ্‌ঘাটনকেই বিশেষ প্রাধান্য দেয়। ইহাই দীনে ইসলামের সঠিক-রহস্যপূর্ণ আভ্যন্তরীণ দিক।

বেলায়ত দুই প্রকার। বেলায়তে ঈমান ও বেলায়তে এহ্‌ছান। "বেলায়তে ঈমান"-যাহা-খোদায়ী, খেলাফতী গুণ ও সম্পর্ক। ইহা প্রত্যেক মোমেন নেককারের মধ্যে থাকে। নবীদের মধ্যে এই বেলায়তে ঈমানই শুধু থাকে এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হইয়া যায়। যাহা বেলায়তে ঈমানকে অতিক্রম করিয়া ফানা ফি'ল্লাহা মোকাম ত্যাগ করিয়া বাকা বিল্লাহ্ শক্তি অর্জন করিতে সহায়তা করে তাহাকে বেলায়তে এহ্‌ছান

বলে। বেলায়ত পদবী আল্লাহতা'লার-একমাত্র করুণার দান। তিনি যাহাকে ইচ্ছা, এই মহান নেয়ামত দান করিয়া থাকেন। ইহা সাধনার ফল স্বরূপও অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু সাধিত বেলায়তে ভুল ভ্রান্তি ও পদচ্যুতির আশঙ্কা থাকে।

আল্লাহ ও তাঁহার অলির মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে উহাকে বেলায়তে ঈমান বলে। এই বেলায়ত প্রাপ্ত অলি, পরলোক গমন কালে, বেলায়তে ঈমান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে-চলিয়া যায়। আর বেলায়ত শক্তি যাহা-অলি ও জনসাধারণের সঙ্গে হেদায়ত রহস্যমূলক সম্পর্ক, উহা তাঁহার মনোনীত যে কোন ব্যক্তিকে তিনি দান করিতে পারেন। যে কোন যোগ্যতম ব্যক্তিকে তিনি প্রতিনিধি অলি নিযুক্ত করিতে সক্ষম। উহা সমাপ্ত হয়না বরং প্রতিনিধিযোগে প্রচলিত থাকে।

নবীর শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহতা'লার একমাত্র বাঞ্ছিত সর্বোত্তম প্রিয় বন্ধু। তিনিই সৃষ্টির আদি এবং তিনিই সৃষ্টির অন্ত। তিনিই সর্বসৃষ্টির একমাত্র যোগ্যতম প্রতিনিধি। তিনি পরম করুণাময় কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ নবুয়ত ও রেছালত প্রাপ্ত হন। এবং সর্বযুগ উপযোগী ইসলামী নীতি মহাগ্রন্থ "কোরান" মজিদ প্রাপ্ত হন। তিনিই একমাত্র নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বেলায়তে ঈমান ও সর্বনিকটতম রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক বেলায়তে এহছান পদবী অর্জন করেন। ইহাতেই তিনি বেপরওয়া মুক্ত খোদা-দিদার মেরাজ প্রাপ্ত হন। ইহাই হইল আদম জাতির নাছুত জগতে অবতরণের পর বাধাহীন প্রথম দিদার ও প্রভু-মিলন। ইহাতেই হইল মিলন পথ উদ্‌ঘাটন। তিনি হইলেন মুহাম্মদীয় নবুয়ত নীতিধারী ও আহমদীয় বেলায়ত শক্তিবাহী বিজয়ী প্রথম মাহবুব। তিনি সমস্ত জাতির মুক্তি পথের একমাত্র পাথেয়।

বহুকাল বিরহের পর আল্লাহ তাঁহার প্রিয়তম মাহবুব মোস্তফাকে হাতে পাইয়া গেলেন। এখন আর নীতি ও পদ্ধতি প্রচার তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন রহিল না। সুপথ ও রহস্যপথ আবিষ্কার হইয়া গেল। এই পথে তাঁহারই বদৌলতে শুধু মোহাম্মদী মানবকে তাঁহার একত্ব পানে পৌছান বাকী রহিল। তাই তিনি রেছালত ও নবুয়ত চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিলেন। খোলা রাখিলেন শুধু আহমদী শক্তিতে উদ্‌ঘাটিত তাঁহার একত্ব মিলন পথখানি। ইহাই হইল দীন-ই-ইসলাম, ইহাই হইল পবিত্র "কোরান" গ্রন্থের মূল রহস্য ও প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিশ্বে প্রত্যেক নবী অলির এই একই উদ্দেশ্য ছিল। সকল নীতির একই রহস্য। তাহা আজ আবিষ্কার ও নির্দেশিত হইয়া গেল। ইহাতে হইয়া বসিল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বেলায়ত পদ্ধতির প্রাধান্যতা।

কিছুকাল পর নবীবর মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার স্থায়ী আহমদী বেলায়ত পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব হযরত আলী (কঃ)কে অর্পণ করিলেন, এবং অস্থায়ী মোহাম্মদীয় নবুয়ত পদ্ধতির খেলাফত হযরত আবু বকর (রঃ)কে দিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার জাতে মিশিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তির অগোচরে ও আড়ালে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার পর হযরত আলী (কঃ)ই এই বেলায়তী তরিকায় বায়াত গ্রহণ করিয়া ফয়েজ এরশাদ করিতেন। এই সময় তিনি সাধারণতঃ তিন তরিকাতেই বায়াত গ্রহণ করিতেন।

১। আখিয়ারে ছালেহীনের তরিকা-যাহা হযরত আবু বকর (রঃ) হইতে হযরত ওমর, ওসমান ও হযরত আলী পর্যন্ত হুকুমত ও খেলাফত পদ্ধতীতে আসিয়া পৌছিল যাহাতে স্বীকারোক্তি, ঈমান ও আমল অপরিহার্য।

২। আবরারে মোজাহেদীনের তরিকা-যাহা মুখে স্বীকার, ঈমান প্রেরণা ও আমল অপরিহার্য। যাহাতে কঠোর-প্রেমপূর্ণ রেয়াজত সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়।

৩। শোহাদায়ে আশেকীনের তরিকা-যাহাতে ঈমান ও প্রেম প্রেরণা একান্ত অপরিহার্য। নিজ প্রিয়ার প্রতি প্রাণ উৎসর্গে প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করা। শেযোক্ত তরিকাই আধ্যাত্মিক প্রেরণা শক্তি স্বরূপ। ইহা তিনি নবী করিম (সঃ) হইতে আহাদী শক্তির খেলাফত হিসাবে অর্জন করিয়াছিলেন।

তিনি আবরারে ছালেহীনের ভার হযরত হাসান বছরী (রাঃ) কে. শোহাদায়ে আশেকীনের ভার হযরত ওয়ায়েছ করণী (রাঃ) কে দিয়া এবং আবরারে মোজাহেদীনের ভার হযরত হাসান ও হোসাইন (রাঃ) কে দিয়া যান। এই ভাবে তাঁহার পর হইতে তরিকত ত্রিধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। লক্ষ লক্ষ মানব উক্ত তরিকা মারফত প্রেমসুধা পানে নিজ নফ্ছাক্রান্ত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়া আল্লাহ্র প্রেমরাহে অগ্রসর হইতে থাকে। বহু সংখ্যক লোক ছালেক, আশেক ও মোজাহেদ হইয়া নির্বিঘ্নে খোদায়ী বেলায়ত অর্জন করিয়া সফলকাম হইতে থাকে।

এ'দিকে বেলায়ত প্রভাব ও আশেক ছাড়া নবুয়ত প্রভাবান্বিত শরিয়ত পদ্ধতিতে আগুয়ান মুসলিম জনসমাজে, সঠিক তথ্য প্রকৃত খোদাদাদ রহস্য জ্ঞানাভাবে নানা প্রকার ধর্ম মতবাদ, ফেরকাবন্ধি মজহাব গঠিত হইতে থাকে। প্রচলিত সত্যসন্ধানী চার মজহাব ছাড়া আরো বিভিন্ন ধর্মমতবাদীগণ দিন দিন চরম হইতে চরমে উপনীত হইতে থাকে, ফলে বহু ঈমামের উৎপত্তি হয়। তাহাদের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রভাবে জন সমাজ বিভ্রান্ত ও দিগবিদিক হারা হইয়া নানাভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

কালক্রমে নবীবর মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর পর ছয়শত শতাব্দীতে কালের দীর্ঘতায়, যুগের তালে ও যুগোপযোগী বেলায়ত প্রভাবশালী যুগ সংস্কারক ঝান্ডাবরদার অলি আধ্যাত্মিক রশ্মির অভাব দেখা দেয়।

নাছুতী জগতের স্বভাব হইল মানবকে তাহার নাছুতী নফ্ছ কবলে আবদ্ধ করিয়া রাখা। এই অভাব ও ধর্মীয়-অচেতনার সুযোগ নিয়া বিভ্রান্ত ও ধাঁধাঁয় পতিত মানবকে রিপু ও ইন্দ্রিয়রূপী সেনাবাহিনী বিদ্রোহী চিরশত্রু শয়তানের নেতৃত্বে স্বজোরে আক্রমন করিতে লাগিল। আক্রান্ত মানবকুল ক্রমে চরম অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা মোজাদ্দেদ পাঠাইয়া আধ্যাত্মিক আলোদানে ধর্মে নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন; এবং গাউছুল আজম হযরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) কে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া ধর্মে আধ্যাত্মিক প্রাণ দানে দীন-ই-ইসলামকে সজীব ও সুপ্রশস্ত করিয়া লইলেন।

তাঁহার পাঁচ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল পর পুনঃ সুদীর্ঘকালের ছায়ায় ও যুগ পরিবর্তনকালে ধর্মে আধ্যাত্মিক প্রেরণা শক্তির অত্যন্তই অভাব হইয়া উঠিল। মুসলিম জাতি প্রায় পর গলগ্রহ ও পরাধীন হইয়া গেল। তাহারা ধর্মের সহায়ক রাষ্ট্রশক্তি হারাইয়া ফেলিল। এবং

খোদার অভিশপ্ত জাতি হিসাবে পরাধীনতা ও নফ্ছ শয়তানীর শৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া গেল। নবী করিম (সঃ) এঁর পর ইহাই মুসলিম জাহানের বৃহত্তম অন্ধকার যুগ। ইহা একটি অপূর্ব যুগ পরিবর্তন।

ইহাতে যেন যুগ যুগান্তরের পূঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিল। শুধু মুসলিম নয়, বিশ্বমানবের বুকে যেন এক নিরাশার অপূর্ব বেদনা জাগাইয়া দিল। খোদার বিশ্ব সৃষ্টি বুকে এক নূতন শোক উচ্ছাস তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। রবি শশী গ্রহ তারায় আকাশে বাতাসে এক ভয়াবহ চাঞ্চল্যকর রব উঠিল। কি এক অতৃপ্তিকর দৃশ্য। আল্লাহতা'লার সেরা সৃষ্টি মানব আজ বিপথে নফ্ছের কবলে। সে আজ নফ্ছের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাহারা কাতরে; বিশ্বত্রাণকর্তা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এঁর পবিত্র দরবারে প্রার্থনায় রত হইল। হে বিশ্বের শান্তি, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)! হে জীবনের ত্রাণ কর্তা মহান নবী! আজ কোথায় তুমি! বিশ্ববাসী আজ প্রবল অন্ধকারের কবলে নিপতিত! তোমার ছুরতবাহী মানব আজ তোমারি প্রেরণা অভাবে নাছুত প্রকৃতির শয়তানী চক্রে শৃঙ্খলিত, পরাধীন। তোমার নুরে সৃষ্ট মানব আজ দোজখ পথের যাত্রী। তোমার ইসলাম রবি আজ অস্তমিত প্রায়।

তাহাদের কাতর আরাধনায়, দয়াল নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রেমমাখা করুণা সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। করুণাময়ের একত্ব দেশ হইতে মদীনার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তিনি যেন তাঁহার সোনালী সিংহাসনের নূরানী পর্দার আড়ালে করুণ অথচ দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন,-হে আমার বিশ্বজোড়া সেবক! হে আমার প্রেমিকগণ! আমি চির অমর! আমার মোহাম্মদী দীনরবি চির উদ্ভাসিত। দেরী নাই। সময় আসিয়াছে। গোমরাহী শত্রুর কবল হইতে আমার অনুগামী বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করিতে আমি চির উন্মুক্ত তরবারী হস্তে পুনঃ আসিতেছি। আমি যুগোপযোগী নিরপেক্ষ সার্বজনীন আহমদী পুর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা লইয়া নির্জীব মানব হৃদয়ে ও ধর্ম জগতে নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিব। বিজ্ঞান আমার শক্তি। শাসন শক্তি আমারই ছায়া এবং ইঙ্গিত বাহী। সকল অধর্মীয় বিরূপ প্রতাপ চিরতরে খর্ব করিয়া আধ্যাত্মিক বিশ্বধর্ম প্রবর্তন করিব।

তাই রাষ্ট্র শক্তির বিনা সহায়তায় ঘোর বিপাকে পতিত বিপথগামী মানবকে নফ্ছ শয়তানের মহাচক্রজাল ছিন্ন করিয়া সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বাধাহীন বেলায়তে মোত্লাকার অধিকারী পূর্ণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধারী নিরপেক্ষ বিশ্ব অলির প্রয়োজন হইল। এমন এক মহান অলির প্রয়োজন দেখা দিল, যিনি সর্ববাধার আড়ালে বসিয়া সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করিয়া বিশ্ববাসীকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে স্ব-স্ব তরিকায় স্ব-ধর্মীয় স্থানে রাখিয়া আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগাইয়া সহজতর উপায়ে আল্লাহ্র একত্বালোকে আনিতে পারেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্মপূর্বাভাষ

বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহতা'লার এমন সুন্দর বিধান! কৃপাময় খোদাতা'লার অপার করুণার এমন এক অপূর্ব মহিমা। তাঁহার সৃষ্ট জগতে যাহাতে নৈরাশ্যের সঞ্চার না হয়, তাহারই বিধি ব্যবস্থা তিনি বহু পূর্ব হইতে আড়ালে বসিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। নিখিল ধরিত্রীর একমাত্র করুণাময় বিশ্বমানবের প্রেমাস্পদ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর আরো কিছুকাল পূর্বে দয়াময় প্রভু হযরত আবদুল্লাহ যোগে বিশ্ববাসীর প্রতি সাঙ্কেতিক ভবিষ্যত আভাস বাণী প্রকাশ করেন। মুহাম্মদী নূর শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। একভাগ আরবে উজ্জ্বলিত হইয়া সারা বিশ্বভূবন আলোকিত করিবে। অপর ভাগ মূলকে আযমে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে উদিত হইয়া নিখিল ধরণীর অন্ধকার দূরীভূত করিবে। ❈

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত আবদুল মোতালেব (রাঃ) কে বলিয়া ছিলেন যে, যখন তিনি মক্কাভিমুখে যাইতেন তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার পৃষ্ঠ মোবারক হইতে একখণ্ড পবিত্র নূর বাহির হইয়া মাটিতে দো-খন্ডিত হইত। উহার একখন্ড আরবে আলো বিস্তার করিত অপর খন্ড ক্ষণেক তাঁহাকে ছায়া দিত, ক্ষণেক আকাশ পানে ছুটিয়া যাইত। পরে দেখিতেন উহা মূলকে আজম, সুদূর এশিয়ার প্রতি দ্রুতবেগে গতিশীল হইয়া যাইত। "আরশের" দ্বার তিনি খোলা দেখিতেন। ফেরেশতাগণ "আচ্ছালামু আলাইকুম এয়া হাবিবাল্লাহ" রবে অভিবাদনে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে শুনিতেন।

আরবের সু-প্রসিদ্ধ অন্যতম অন্তঃচক্ষুধারী অলি, হযরত মহিউদ্দিন এবনে আরবী, যিনি হযরত মহিউদ্দিন গাউছুল আজম আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) এঁর অদ্বিতীয় শিষ্য ও তাঁহার উপাধি নামে বিভূষিত ছিলেন। জনাব হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ইহ জগতে আত্মপ্রকাশের আরো প্রায় ৫৮৬ বৎসর পূর্বে ৬৩৬ হিজরীতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান যে, নবী করিম (সঃ) এঁর আরবে অস্তমিত রবি এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে পুনঃ উদিত হইবে। তাঁহার নাম থাকিবে খোদার জাতি নাম আল্লাহ এঁর সহিত সংমিশ্রিত নবী করিম (সঃ) এঁর বেলায়তী নাম আহমদ। অতএব মনে হয়, "আহমদ উল্লাহ" আল্লাহ এঁর জাতি নাম ও নবী করিমের (সঃ) বেলায়তী নামের সংমিশ্রণ। তাঁহার জন্মস্থান ভূখণ্ড মধ্য রেখার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত থাকিবে। উহা চীন পাহাড়ের পাদদেশে বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন জাতীর সমাবেশ স্থল হইবে। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি হইবে-নবীবর

❈ মৌলুদে দিল-পর্জির দ্রষ্টব্য

আহমদ মোজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) পূর্ণ সাদৃশ্যতার প্রতীক। তিনিও খাতেমুল অলদ হইবেন। নবীবর (সঃ) এঁর মত কোন পুত্র সন্তান জগতে রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ভাষা হইবে সংমিশ্রিত এক ভাবপ্রবণ ভাষা। তাঁহার রহস্যময় কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি, চালচলন সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা নিতান্তই দায় হইবে।

দেখা যায় যে, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) পবিত্র নাম স্বাভাবিকভাবে আহমদ ও আল্লাহ্র নামে সংযুক্ত আহমদ উল্লাহ্ রাখা হয়। তিনিই আকৃতি প্রকৃতিতে নবী করিম (সঃ) এঁর অবয়বতার সম্পূর্ণ সাদৃশ্যতার প্রতীক হন। ধরাধাম ত্যাগকালে তিনি কোন পুত্র সন্তান জীবিত রাখিয়া যান নাই। তাঁহার মাতৃভাষা সর্বভাষার সংমিশ্রণে মিশ্রিত এক অভিনব চাটগামী ভাষা। তাঁহার ভাবভঙ্গি সাধারণ লোকের জ্ঞানের উর্দ্ধে ছিল। তাঁহার জন্মভূমি "চাটগাম," ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে চীন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধ ও নানা জাতির আদি আবাস ভূমি। ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যায়, খৃষ্ট যুগে চীনা, তিব্বতী ও আহম জাতীয় লোকেরা–এ'দেশের অধিবাসী ছিলেন। কালক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানেরা এই দেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে।

সৃষ্ট জীবের অতৃপ্ত বেদনা, গভীর নৈরাশ্যের ছায়া ও তাহাদের সুপ্ত হৃদয়ের অন্ধকার চিরতরে তিরোহিত করিবার মানসে শেষকালে বারোশত তেতাল্লিশ হিজরীর এক গভীর রাত্রে পরম কারুণীক আল্লাহতা'লা হযরত মওলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ সাহেবের প্রতি এই শুভ আভাস দিলেন যে, অনতিবিলম্বে জগদ্বাসীর আশার আলো উদিত হইবে। একদা রাত্রে তিনি এশার নামাজের পর খোদার পবিত্র নাম স্মরণান্তে নিদ্রাভিভূত হইলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি আলমে মালকুতে–ফেরেশ্তা জগতে ভ্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ আল্লাহতা'লার বাস্তব রহস্যদ্বার উৎঘাটিত হইল। তিনটি প্রদীপ আলোক তাঁহার সামনে উপস্থিত হইল। উহাদের একটি হইতে অপরটি অত্যুজ্জ্বল। তন্মধ্যে একটি প্রদীপ সূর্যসম জ্যোতির্ময়, উহার রশ্মিতে যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিশ্বজীবে যেন এক নূতন প্রানের সঞ্চার হইল। তাহাদের মনে প্রাণে যেন এক অভিনব আনন্দ স্পন্দন জাগিয়া উঠিল। এতদ্দর্শনে সচকিত অবস্থায় তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে এক অপূর্ব আহলাদ উদয় হইল। এই স্বপ্ন রহস্য উদঘাটনে তাঁহার মন আকুল হইয়া পড়িল। কাহার কাছেই বা ইহার অর্থ জানিবেন। কে এই গুপ্ত রহস্যের তথ্য দিতে পারিবে। মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মওলানা আবদুল হাদী সাহেবের নিকটে এই বৃত্তান্ত বলিয়া ইহার তাবির রহস্য জানিয়া নিবেন। তিনি অভিজ্ঞ মোত্তাকী আলেম। তাঁহার স্বপ্ন রহস্যের মর্ম ব্যাখ্যায় নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা থাকিবে। তাঁহার মন বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। ভোর হইলে তিনি তাঁহার নিকট গেলেন। নির্জনে স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। মওলান হাদী সাহেব তাহাকে বলিলেন; যেন এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের কথা আর কাহারো কাছে না বলেন। তিনি কোরানে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আঃ) এঁর ঘটনা তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলেন এবং "আল্লাহু নূরুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আর্দে মেছলু নূরেহি কা মেশকাতিন ফিহা মেছবাহুন আল মেছাবাহু ফি যোজাজাতিন্" ইত্যাদি আয়াত পাঠান্তে বলিলেন যে, তাঁহার পবিত্র ঔরসে

তিন জন সু-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন। সকলেই হাদী অলি হইবেন। তন্মধ্যে একজন সুবিখ্যাত বিশ্ব অলি হইবেন। যাঁহার আধ্যাত্মিক আলোকে সারা বিশ্বভূবন আলোকিত ও মোহিত হইবে। তিনি সর্বদা খোদার পবিত্র দরবারে ইহার সফলতা কামনা করিতেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইল। একরাতে তাঁহার সহধর্মিনী সৈয়দা বিবি খায়রউন্নেছা সাহেবা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার স্বামী হযরত মতিউল্লাহ সাহেবকে বলিলেন যে–তিনি এক আনন্দপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্বামী স্ত্রী দু'জনে এক সাগরতীরে দন্ডায়মান। অনেক লোক সাগরে নৌকাযোগে এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতেছে। কেহ কেহ সাগর জলে ডুব দিতে লাগিলেন। অতি সুন্দর চকচকে একটি ঝিনুক পাইয়া তিনি অতি সত্বর নৌকায় উঠিলেন। ঝিনুক খুলিয়া দেখিলেন, অত্যুজ্জ্বল একটি মুক্তা। উহার চাকচিক্যময় আলোক সমস্ত নৌকা আলোকিত হইয়া গেল, তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন দেখিয়া সকলে তাঁহাদের প্রতি তাকাইল এবং "মারহাবা" রবে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তাঁহারা আরো মুক্তার আশায় ডুব দিয়া পর পর আরো দুইটি মুক্তা আহরন করিলেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। অনেকে অনেক মুক্তা পাইল। কিন্তু তাঁহাদের প্রথম মুক্তার সমতুল্য জ্যোতির্ময় মুক্তা কেহই পাইল না। তাঁহারা আহলাদিত চিত্তে খোদার শোকরিয়া আদায় করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিলেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া হযরত মতিউল্লাহ সাহেব উৎফুল্ল চিত্তে বলিলেন, "মোবারক"। সত্যই আপনি সৌভাগ্যবতী। দয়াময় আল্লাহ আপনার ও আমার স্বপ্ন সফল করুন। আপনার গর্ভে আল্লাহ এমন এক অত্যোজ্জ্বল মুক্তারূপী সন্তান দান করিবেন, যাঁহার সু-কীর্তি জগত মুখরিত করিবে। যাঁহার আলোতে সারা ভুবন আলোকিত হইয়া যাইবে। খোদারই কৃপা, মোহাম্মদী দীনরবি মোহাম্মদী আকাশে উদিত থাকিয়া সৃষ্ট সমস্ত জগত রওশন করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বংশ পরিচয়

কোরাইশ বংশীয় মদিনাবাসী মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশধর নয়নমণি হযরত এমাম হাছান ও হোছাইন (রঃ) ছিলেন। এই পবিত্র দুই ধারায় নূর-নবী এশিয়ার প্রান্তরে আরবের বক্ষে ধীর গতিতে প্রসার লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রকৃতির কি বিচিত্র কৌশল! কালক্রমে আরব পারস্য সাগর উপকূলে বাগদাদের অন্তর্গত জিলান শহরে এই দুই পবিত্র ধারার শুভ মিলন হয়। ইহাতে আবির্ভাব হয় অলিকূল শিরোমণি কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ছোবহানী গাউছুল আজম হযরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী আল্‌হাছানী ওয়াল হোছাইনী রাজিয়াল্লাহু আনহু। তাঁহার পিতৃকুল হাছানী ও মাতৃকুল হোছাইনী ছিল।

এই মিশ্রিত শক্তিশালী ধারা আরব দেশ অতিক্রম করিয়া মূলকে আজমের প্রাঙ্গণে এশিয়ার প্রাচ্য দেশে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। স্বভাবতঃ তাঁহারা নবী প্রদত্ত হেদায়তী লীলায় সুদক্ষ। ধর্মীয় নেতৃত্বই তাঁহাদের বংশীয় সৈয়দী মিরাছ।

হেদায়ত ও এমামতী উপলক্ষে তাঁহাদের কেহ কেহ দিল্লী সম্রাটের আমন্ত্রণ ক্রমে দিল্লী শাহী মসজিদের এমাম, হেদায়ত কার্য ও কাজী পদে নিযুক্ত থাকেন। কালক্রমে তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড় নগরে মুসলিম নবাব কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া এমামতী ও কাজীর কার্য পরিচালনা করেন।

সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী নামক তাঁহাদেরই এক কৃতি সন্তান গৌড় নগরের বিচারালয়ে কাজী পদে নিয়োজিত হন। এক সময় গৌড় নগরে ভীষণ মহামারীর ফলে প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে। এই সময় খৃষ্টীয়-১৫৭৫ সনে কাজী সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী হেদায়তের সর্বোত্তম মঞ্চ খোদার অদ্বিতীয় শান্তি নিকেতন চট্টগ্রামে শুভ পদার্পণ করেন। তিনি পটিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে বসতি স্থাপন করেন এবং হেদায়ত ও এমামতী কার্যেরত থাকেন। তথায় তাঁহার নামানুসারে হামিদগাঁও নামক একটি গ্রাম আছে। তাঁহারই এক পুত্র সন্তান সৈয়দ আবদুল কাদের (রঃ) ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত আজিম নগর গ্রামে এমামতি উপলক্ষে আগমন করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র সৈয়দ আতাউল্লাহ এবং তৎপুত্র সৈয়দ তৈয়বউল্লাহ্ উক্ত আজিম নগরেই বসতি ও এমামতি কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার তিন পুত্র সন্তান জন্মে। মধ্যম সন্তানের নাম মওলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ। তিনি মাইজভাণ্ডার গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তিনি নিতান্ত দীনদার মোত্তাকী আলেম ছিলেন। তাঁহাকে সকলে অতি সম্মান ও ভক্তি করিত। তাঁহারই পবিত্র ঔরসে-বিশ্ব অলি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সৌভাগ্যবতি সৈয়দা খায়েরউন্নেছা বিবিই হযরত গাউছুল আজমের জননী হইয়া বিশ্ব-বরণ্যা হইতে পারিয়াছেন। মা ফাতেমা খায়েরউন্নেছা (রঃ) এঁর উপাধি নাম খায়েরউন্নেছায় অলংকৃত হইয়াছেন। তাঁহারই পবিত্র নামে হাসর ময়দানে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীকে আল্লাহপাক ডাকিয়া লইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জন্ম বৃত্তান্ত

একদা এক শুভ মুহূর্তে হযরত সৈয়দ মতিউল্লাহ সাহেবের মস্তক হইতে হযরত গাউছুল আজম তাঁহার জননী বিবি খায়েরউন্নেছা সাহেবার পবিত্র উদরে স্থান গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার জননী হৃদয়ে এক নূতন পুলক আভার উদ্ভব হয়। তিনি দিন দিন যেন নব যৌবন লাভ করিতে থাকেন।

সাগরাদি আহলাদে আত্মহারা হইয়া মেঘের মারফত রীতিমত অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে। জমি করুণার সুধাবারী গ্রহণে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া সহস্রগুণ সতেজ সবল হইয়া উঠে। বৃক্ষরাজি তরুলতা প্রেমানন্দে নাচিয়া নাচিয়া-প্রচুর ফলফুল দান করিতে থাকে। কাল, ঋতু সকলেই যেন হাসিতে হাসিতে রীতিমত তাহাদের কর্তব্যে রত হইয়া পড়ে।

আকাশ বাতাস জড় চেতনে এক জিজ্ঞাসার রোল পড়িল, কখন আমাদের আশা রবি উদিত হইবে। কখন-আমাদের প্রাণ নিধি ধরায় আগমন করিবেন। কেন তাঁহার এত দেরী?

তাঁহার গর্ভকাল শেষ হইয়া গেল। এমন সময় প্রকৃতি যেন তাঁহাদের ডাকিয়া বলিল ঃ-

সুসংবাদ! সুসংবাদ! সজাগ হও হে বিশ্ববাসী! তোমাদের বাঞ্ছিত আশা-রবি-উদিত হইতেছে। তোমাদের মুক্তি দিশারী ভবে পদার্পণ করিতেছেন। খোশ আমদেদ জানাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন কর। এই দিকে আল্লাহতা'লা স্বয়ং বিবি খায়েরউন্নেছাকে স্বপ্নযোগে খোশ-খবরি দিলেন।

জাগিয়া উঠো বিবি। আর ঘুমাইওনা! আমার প্রিয় মাহবুব আসিতেছেন। তাঁহাকে স্নেহ ভরে কোলে তুলিয়া নাও। স্নেহ চুম্বন কর। তুমি যে তাঁহার স্নেহময়ী জননী।

সন ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ ইংরেজী, ১১৮৮ মঘী ১লা মাঘ রোজ বুধবার দিবা দিপ্রহরান্তে জোহরের সময় আল্লাহতালার হুকুমে শিশু গাউছ ভবে আত্মপ্রকাশ করিলেন। খায়েরউন্নেছা বিবি আনন্দে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। এক অতুলনীয় অপূর্ব দিব্যকান্তি শিশু ভবে নামিয়া আসিয়াছেন! যেন পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর হাসিয়া হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে প্রভুর কৃতজ্ঞতা স্বীকারে স্নিগ্ধ স্নেহমাখা চুম্বনে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন।

জগত যেন এক নূতন আলোকে ছাইয়া গেল। চারিদিকে হাস্যময় কোলাহল। পুলক ধ্বনিতে এক অভূতপূর্ব আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল। দিগ্‌দিগন্ত যেন "মারহাবা" "মারহাবা" রবে মুখরিত হইয়া উঠিল। কি আনন্দ! যাঁহার অপেক্ষায় বিশ্ববাসী ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল তিনি আজ ধরায় পদার্পণ করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরের পর অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি নম্রতাসহকারে তাঁহার পদচুম্বন করিল। পাখীরা দলে দলে-তাঁহার আগমনী গীতি গাহিতে লাগিল। সমীরণ-দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার শুভ বিকাশ খবর দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া দিল। ফুলবাগ আনন্দে রং বেরং এর সাজে সজ্জিত হইতে লাগিল, নদ-নদী আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া কুলকুল রবে-সাগর পানে ছুটিয়া চলিল। ভুবন ব্যাপী আজ আনন্দলহরী। সমবেত দীপ্ত কণ্ঠে সবাই যেন গাহিতে লাগিল :-

ছদ্‌ মারহাবা ছাল্লেআলা গাউছে খোদা পয়দা হোইয়ে।
জানে জাঁহা ও কেব্‌লায়ে আহলে ছফা পয়দা হোইয়ে।।
তাহারা যেন তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,
মারহাবা এয়া-মারহাবা এয়া-মারহাবা
গাউছুল আজম-মাইজভাণ্ডারী মারহাবা।

সকলের মনে উল্লাস। সকলের মনে নতুন হাসি। আজ যেন বিশ্বের সর্বত্র চরম মুক্তি পরম প্রবলতা। কোথাও দুঃখ নাই। দৈন্য নাই, রিক্ততার বেদনা নাই। সর্বত্র যেন অপূর্ণতার অবসান ঘটিয়াছে। অশান্তির বাগানে যেন প্রশান্তির ফুল ফুটিয়াছে। বিশ্বভুবনে আল্লাহ্‌র অপার করুণা, অনন্ত আশীর্বাদ যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সকল দিকে বিস্ময়পূর্ণ ধ্বনি, কে এই নতুন অতিথি ? যাঁহার শুভাগমনে সমগ্র বিশ্ব আজ আনন্দমুখর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতির কোলে শিশু গাউছ

হযরত বিকাশ লাভ করিলেন। তিনদিন গত হইয়া গেল। সপ্তম দিবসে শিশুর নাম রাখা হইবে, তাঁহার আব্বাজান আয়োজন করিতেছেন। রাত্রিকালে তিনি এক স্বপ্ন দেখিলেন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) তাঁহাকে বলিতেছেনঃ -"হে মতিউল্লাহ! তোমার ঘরে আমার প্রিয় মাহবুব আহমদ উল্লাহ আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কাহাকে হযরত প্রিয় মাহবুব আহমদ উল্লাহ বলিতেছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না। নবীবর তাঁহাকে পুনঃ বলিলেন, - "তোমার ঘরে আমার মাহবুব বিকাশ লাভ করিয়াছে। আমি তাঁহার নাম আমার "আহমদ" নাম আল্লাহ যুক্ত করিয়া আহমদ উল্লাহ রাখিলাম।" এইবার তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার শিশু সন্তানের কথাই বলিতেছেন। ক্রমে সপ্তম দিবস আসিয়া পড়িল। তাঁহার নাম রাখার আয়োজন করা হইল। ছুন্নতি প্রথায় তাঁহার আকিকা করা হইল। আত্মীয়স্বজন জমায়েত হইয়াছেন। সকলেই নাম প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতাকে নাম প্রস্তাব করিতে বলা হইল। তিনি বলিলেন, তাঁহার নাম আহমদ উল্লাহ রাখিতে আমি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছি। আহমদ উল্লাহ রাখাই বাঞ্চনীয়। সবাই স্বপ্নে প্রদত্ত পবিত্র গুরুত্বপূর্ণ নাম শুনিয়া খুশি হইলেন। খোদার দরবারে দুই হাত তুলিয়া সবাই মোনাজাত করিলেন। এখন তিনি আহমদ উল্লাহ নামে সমাজে পরিচিত হইবেন। আল্লাহতা'লার কি অপার মহিমা! যাঁহাকে তিনি সর্বোত্তম মাহবুব রূপে গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদি ও অনন্তকালীন মাহবুবের গুপ্ত ব্যক্ত নামে ও সমস্তগুণে সজ্জিত করিবেন। তাই তাঁহার বিকাশের বহু পূর্বেই তাঁহার নাম আহমদ উল্লাহ রাখিয়া তাঁহার জাতি নাম "আল্লাহ" ও প্রিয়তম মাহবুবের বেলায়তী নাম "আহমদের" সর্বগুণে রূপায়িত করিয়া গোপন জগতে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং পরে ধরাবক্ষে তাঁহার নামের বিকাশ করিলেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার গুণও বিকশিত করিবেন।

তাঁহার ইচ্ছা প্রকৃতির এমনি বিধান, তাঁহার খোশনুদি বিকাশের এমনি অবস্থান! এই ধারা কি সহজে কেহ বুঝিতে পারে! এই পবিত্র নামের রহস্য কি যে কত প্রশস্ত, কত গভীর। ইহার গুরুত্ব যে কত অসীম। ক্ষুদ্রজ্ঞানী মানবের সাধ্যই বা কি তাঁহার ইচ্ছা রহস্য বুঝার।

তাঁহার নামের বৈশিষ্ট্য

অলি-সর্দার গুপ্তজ্ঞানবীর মওলানা মহিউদ্দিন এবনে আরবী, জনাব হযরত গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। এই নামের

অধিকারী ও তাঁহার বর্ণিত লক্ষণধারী মহামানব পরম দয়াময় বিশ্বস্রষ্টার জাতে ফানা হইয়া তাঁহারই জাতে বাকী ও স্থায়ী হইয়া মিশিয়া থাকিবেন।

"আহমদু" ইহা একটি আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের রূপ "হামদুন" ধাতু হইতেই উৎপন্ন। একবচন উত্তম পুরুষ এবং বর্তমান ভবিষ্যত উভয় কাল বুঝায়। অর্থঃ- আমি প্রশংসা করিতেছি বা করিব। আহমদ আল্লাহ অর্থ ঃ- আমি আল্লাহতা'লার প্রশংসা করিতেছি ও করিব। ইহা একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ বাক্য। "আহমদ উল্লাহ" ও আলহামদু লিল্লাহ উভয় বাক্যের একই অর্থ।

ইহা আরবী গ্রামার বা ব্যাকরণ মতে ছেফতে মোবালাগাতেও ব্যবহৃত হয়। ছেফতে মোবালাগা, কর্তৃ ও কর্ম বাচক উভয় রূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব "আহমদুল্লাহ" "মোহাম্মদুল্লাহ" অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আহমদ উল্লাহ অর্থ আমি আল্লাহ্র প্রশংসাকারী এবং আল্লাহ্র প্রশংসিত বন্ধু উভয়ই হয়! 'আহমদু' শব্দটি গায়েরে মনছারেফ রূপে ব্যবহৃত হয় স্বভাবতঃ উহা নিম্নগামী কোন হরকত দ্বারা রূপান্তরিত হয় না। বরং উহা স্বাধীন শব্দ। কোন আমলের প্রভাবে পরিচালিত নহে। উহার উর্দ্ধে ব্যবহৃত হরকতই শুধু গ্রহণ করে। তাই আহমদ নামীয় ব্যক্তির স্বভাব সর্বদাই উর্দ্ধগামী। স্বভাবও সাধারণতঃ উর্দ্ধগামী হয় এবং স্মরণকারীকে আল্লাহ্র প্রতি উর্দ্ধগামী করাই উহার অন্তর্নিহিত অভ্যাস। "আল্লাহ্র" আহাদ নামের সম্পর্কই উহাতে অত্যধিক।

"আল্লাহ" এই নামটি আল্লাহতা'লার সর্বগুণে সর্ব ছেফতে বিরাজ মান থাকিবার প্রথম স্থান। ইহা হইতেই সমস্ত নামাবলীর উৎপত্তি। এই শক্তিতে সমস্ত সৃজন-কার্য সম্পাদিত। ইহাতেই সমস্ত নাম, গুণ ও সৃষ্টি সমষ্টিবদ্ধ ও সম্মিলিত হইবে। ইহার স্বভাব সমস্ত "মখলুক" কে উর্দ্ধে টানিয়া আনা।

"আল্লাহ" এবং "আহমদ" সংযোগে যে আহমদ উল্লাহ শব্দ গঠন হয় উহা নামাজের অন্তর্গত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া সমূহের নির্দেশ বাহক। যেমন নামাজে দাঁড়ান অবস্থায় "আলেফ"। রুকু অবস্থায় "হে"। সেজদা অবস্থা "মিম"। বসা অবস্থা "দাল"। প্রথম রাকাতে আহমদু হয়। পুনঃ দাঁড়ান অবস্থা "আলেফ"। রুকু অবস্থা "লাম" সেজদা অবস্থায় হায়ে দো-চশমী আকারে আল্লাহ গঠিত হয়। বসা অবস্থায় "মোহাম্মদ" পূর্ণ আকার হয়। অতএব আহমদ উল্লাহ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মোহাম্মদ সাদৃশ্য আল্লাহতা'লার আহকামাবলী ও উহার কার্যকরী ব্যবস্থার নির্দেশ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার নামের অর্থ যেইরূপ আমি আল্লাহতা'লার প্রশংসা করিতেছি সেইরূপ কাজ-কর্ম উপাসনা এবং ভাবভঙ্গির ভিতর দিয়াও তিনি উহা প্রমাণ করিয়া যাইতেছেন। প্রতি অক্ষরেই তিনি স্বনাম ও গুণে কার্যকরী, তাঁহার আকার অনুযায়ী নামাজ গঠিত এবং তিনি নামাজরূপে গঠিত। নামাজই তিনি। সুতরাং আহমদ উল্লাহ নাম আল্লাহ পাকের জাহের বাতেন সমস্ত গুণ সমবায়ের বিকাশস্থল। আহমদ উল্লাহ নামের বৈশিষ্ট্য অনেক। যাঁহার নাম আহমদ উল্লাহ তিনি নিতান্তই গৌরবময় ও আল্লাহতা'লার প্রশংসিত। স্বাভাবিক ভাবে উক্ত নামের তাছির ও গুণ তাঁহার উপর অর্পিত হইয়া থাকে।

তাঁহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তিনি স্বইচ্ছায় তাঁহার মাতার দুধ পানে ক্ষান্ত দেন। তিনি যেন শিশু প্রকৃতির আড়ালে বসিয়া আল্লাহ পাকের কোরানে বর্ণিত আদেশ পালন করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার মাতা বিষ্ময় বোধ করিলেন। খোদার দরবারে অত্যানন্দে শোকরিয়া আদায় করিলেন। কারণ দুধ ছাড়াইতে কোন বেগ তো পাইতে হইলও না বরং তিনি যেন মাতাকে কোরানের আদেশ পালন করাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাল্যাচরণ ও বিদ্যা অর্জন

ক্রমেই তাঁহার চারি বৎসর চারিমাস বয়স অতিবাহিত হইল। তাঁহার পিতা-মাতা তাঁহাকে যত্নসহকারে গ্রাম্য মক্তবে পাঠাইলে তাঁহাকে আরবী ও বাংলা শিক্ষা দেয়া আরম্ভ হইল। প্রকৃতির কি মধুর লীলা! তাঁহাকে এখন মক্তবে যাইতে হয়, অথচ তাঁহার কোন সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। পরম করুণাময়ই তাঁহার যথেষ্ট সঙ্গী। তিনি প্রত্যহ যথা সময়ে পাঠশালায় যান। যথারীতি তাঁহার শিক্ষকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে থাকেন। পড়াশুনায় কখনও অবহেলা করেন না! পাঠশালায় সাথীদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সম্প্রীতি। কাহারো সাথে কোন বিবাদ নাই। হিংসা বিদ্বেষ নাই। অনাবশ্যকীয় কোন আলাপ নাই। গুরুভক্তি ও পাঠে মনোনিবেশই তাঁহার স্বভাব হইল! শিশুকাল হইতে তিনি নির্জনতা প্রিয় ছিলেন। তিনি অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাশালী ছিলেন। পাঠের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একদিকে আল্লাহ ও নবী বর্ণিত রহস্যরাজী কোরান ও মছায়েলার কেতাবাদি পঠনীয়, অপরদিকে তাঁহার করুণাময়ের বিশাল বিচিত্রময় প্রাকৃতিক পটভূমি তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থ। তাঁহার মনে কত যে জিজ্ঞাসা জাগে। কতই না প্রশ্ন তাঁহার মনের গহনে আন্দোলন করে। কে এই বিশাল ধরণীর পটভূমি সৃজন করিল। কেনই বা ইহার সৃজন। সৃষ্টির আড়ালে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য লুকায়িত আছে। নগর-কাননে, জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে এত কোলাহলই বা কিসের। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা কিভাবে পরিচালিত হয়। কে তাহাদের পরিচালক। পশু-পক্ষী প্রভৃতি কার জয় গান গায়! কাহাকেই বা তাহারা স্মরণ করে। আল্লাহ আবার কেমন। আমাদের সৃজন রহস্য কি! কাহার ইঙ্গিতে এই সমস্ত পরিচালিত হইতেছে। কে তিনি! তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য কি! এই সমস্ত প্রশ্নের তাৎপর্য সমাধানে প্রায় সময় তিনি মগ্ন থাকিতেন।

একদিকে গুরুজন, অন্যদিকে মহাপ্রভূ আল্লাহ, সৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান নানা ইঙ্গিতে তাঁহার জ্ঞানচক্ষুর সামনে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাকে জ্ঞানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি নামাজ শিক্ষা করেন। এখন হইতে তিনি মহাপ্রভুর উপাসনায় রত। রীতিমত তাঁহার বাবার সাথে জামায়েতে নামাজ আদায় করিতেন। নামাজের সময় হইলে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেন। নামাজ আদায় না করা পর্যন্ত তিনি শান্ত হইতেন না। লিখাপড়ায় সব সময় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার

সহিত প্রতিযোগিতায় কেহ পারিয়া উঠিত না। তাঁহার লেখাপড়া ও আচার ব্যবহারে গুরুজন ও দেশবাসীর তিনি স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন। তাঁহার ভক্তি, নম্রতা ও একাগ্রচিত্ততার গুণে সকলের মন জয় করিয়া ফেলিলেন। দেশবাসীর মনে এক নতুন আশার সঞ্চার হইল। কালে এই বালক নিশ্চয় দেশের ও বংশের গৌরব হইবে। তাঁহার বাল্য আচরণ যেন সমগ্র জীবনের সূচীপত্র গঠন করিয়া দিল। এমনিভাবে তিনি বাল্যকালীন শিক্ষা সুনামের সহিত শেষ করিয়া নিলেন।

এখন দেশীয় কোন স্কুল মাদ্রাসায় তাঁহার লিখাপড়ার সুব্যবস্থা আর নাই। চট্টগ্রামে তখন উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। তাঁহার বাবার আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়। অথচ তাঁহাকে যাইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার মানসে সুদুর কলিকাতা ছাড়া ধর্মীয় আরবী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা বাংলায় অন্য কোথাও ছিল না। দেশবাসী তাঁহার উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁহার বাবাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় প্রেরণ করা হইল। তখনকার দিনে বর্তমানের মত রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই। জল পথে নৌকা ও স্থল পথে হাঁটিয়া বালক গাউছুল আজম ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সুদূর কলিকাতা অভিমুখে চলিলেন।

অতপর ১২৬০ হিজরীতে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি স্বভাবতঃ ছুফী ও মোত্তাকী প্রকৃতির সততা ও সত্য নিষ্ঠায় তিনি আল-আমীনের প্রতীক ছিলেন। পাঞ্জেগানা নামাজ তিনি মসজিদে জামাত সহকারে আদায় করিতেন। কোন প্রকার নফল নামাজ তিনি ত্যাগ করিতেন না। প্রায় সময় তিনি নফল রোজা রাখিতেন। তাঁহার জীবনে কোন দিনও তিনি শেষ রাত্রে বিশ্রাম করিতেন না। তাহাজ্জুদ ও ছালাতে তছবিহ নামাজে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। কোরান ও অজিফা পাঠ তাঁহার অপরিহার্য ছিল। প্রায় সময় ছুন্নত নফল এবাদত নিয়া তিনি মসজিদে এতেকাফের মতই থাকিতেন। ঐশ্বরীক প্রতিভা ও তেজস্বীতা ছিল বলিয়া তিনি অল্প সময় অধ্যয়নে সমস্ত পাঠ্য বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া নিতেন। রাত্রের দুই ভাগ তিনি আল্লাহ্‌র এবাদত ও ধ্যানে কাটাইতেন। বিভোর ঘুমের অভ্যাস তাঁহার মোটেই ছিল না। বিশ্রাম অবস্থায় তন্দ্রাতেই এক তৃতীয়াংশ রাত যাপন করিতেন। তন্দ্রায় ও জাগ্রত অবস্থায় সর্বদা তিনি বাঅজু পরিষ্কার পবিত্র থাকিতেন। মধুস্বর ও মৃদুহাসি তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি কখনও অতি আলাপ ও অট্টহাসি পছন্দ করিতেন না। সময়ে সময়ে তিনি মুক্ত মাঠে, নির্জন নিভৃত স্থানে এবং নদীপারে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সময় সময় এদিক ওদিক চিন্তারত অবস্থায় পায়চারী করিতে থাকিতেন। আবার কোন সময় নিরবে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। সময় মত নিজ গন্তব্য স্থানে দ্রুত আসিয়া পড়িতেন। পথে ঘাটে সালাম ছাড়া কালাম কারো সাথে করিতে চাহিতেন না। গতিপথে এদিক সেদিক দর্শন ও গৌণ করা তিনি পছন্দ করিতেন না। বরং অধঃ দৃষ্টিতে মাদ্রাসায় যাওয়া আসা করিতেন। জুমা রাত্রে শবে-কদর ও শবে-বরাতের রাত্রিতুল্য এবাদত করিতেন। জুমার দিনে ঈদের দিনের মত সম্মান ও সমারোহের সহিত জুমার নামাজ পড়িতে যাইতেন। ইসলামী সমস্ত পবিত্র ও বড় দিনগুলি তিনি অতি সম্মানে যাবতীয় ছুন্নত মোস্তাহাব পদ্ধতি পালনে উদ্‌যাপন করিতেন। এমন কি মেছওয়াক, ঢিলা কুলুপ ও

সুগন্ধি ব্যবহার তুল্য সাধারণ মোস্তাহাবও তিনি ত্যাগ করিতেন না। খোদাপ্রেম গুরুভক্তি ও পবিত্র আচরণে ছাত্র শিক্ষক ও জনসাধারণ মোহিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার সঙ্গে যে একবার সাক্ষাৎ করিত, তাঁহার মৃদুমধুর আলাপে মুগ্ধ হইয়া যাইত। এবং চিরকাল তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইত। তিনি নিতান্তই ধীরস্থির বিচার বুদ্ধি ও নম্র স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাকে ছোট বড় সকলে অতি সম্মান ও ইজ্জতের চক্ষে দেখিতেন। অনেকেই তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে নিয়া আদর যত্নে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাকে শারীরিক ও আর্থিক পাঠোন্নতির সেবা দানে সহায়তা করিতে অনেকেই আগ্রহশীল ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো মুখাপেক্ষী হওয়া পছন্দ করিতেন না। জায়গীর থাকা পর্যন্ত তিনি পছন্দ করিতেন না। বাল্যকাল হইতে তিনি ওয়ায়েজ নছিহত, দরূদ ও মিলাদ শরীফ শ্রবণ নেহায়েত ভালবাসিতেন। মিলাদ মাহফিলের সংবাদে তিনি যথায় তথায় চলিয়া যাইতেন। প্রায় সময় তিনি অলি আল্লাহদের মাজার শরীফ জেয়ারতে বাহির হইতেন। কোন কোন সময় সারারাত মাজার পার্শ্বে কাটাইয়া দিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি অধ্যয়ন কার্য মসজিদেই সমাধা করিতেন। এইভাবে প্রায় আট বৎসর কাল তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। প্রতি বৎসর তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। মাসিকবৃত্তি, পুরস্কার ও সুনাম অর্জন করিতেন। ১২৬৮ হিজরী সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। হাদিছ, তফছির, ফেকাহ, মন্তেক, হেকমত, বালাগত, উছুল, আকায়েদ, ফিলছফা ও ফরায়েজ সহ যাবতীয় শাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। আরবী, উর্দু, বাংলা ও ফার্সী ভাষায় তিনি অশেষ পারদর্শী ছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন

হিজরী-১২৬৯ সনে যশোর জেলায় বিচার বিভাগে তৎকালীন কাজী পদে নিয়োজিত হইয়া স্ববংশীয় পূর্বপুরুষগণের প্রথম মিরাছ প্রাপ্ত হন। এক বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্তকার্য পরিচালনা করিয়া নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট সুনাম অর্জনে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়েন। দোষীর প্রতি শাস্তি দিলে তাঁহার মন বিষাদে মুষড়িয়া পড়িত। রহমতুল্লিল আলামীনই তাঁহার স্বরূপ। সৃষ্ট বিশ্ব জীবের প্রতি দয়াই তাঁহার কার্য। দয়া না করিয়া তো তিনি পারেন না। উক্ত কার্যে তাঁহার মন বসিল না।

তাই তিনি অন্য উপায় স্থির করিলেন। তিনি মুন্সেফী অধ্যয়ন করা স্থির করিলেন। স্বত্ব সাব্যস্তে মানব স্বত্ব "হক্কোল এবাদ" রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভার নিবেন। যেই খানে নিষ্ঠুর কোন আচরণ নাই; আছে শুধু স্বত্ব ও সত্যের তথ্য আবিষ্কার, আছে শুধু হক ও না হকের স্বার্থপূর্ণ মহা সমস্যার সমাধান। তাঁহার আর্থিক উপার্জনও দরকার। তাহা না হইলে কিভাবে তিনি অধ্যয়ন সমাপন করিবেন। শুধু উপার্জন করিলেও চলিবেনা, আল্লাহ্‌র খোসনুদী অর্জনও নিতান্ত দরকার। ঠিক করিলেন, তিনি আল্লাহতা'লার দীনে ইসলাম শিক্ষা দিবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মানবের উপকার করিবেন। সে সময় কলিকাতায় মুন্সী বো আলী (রঃ) এঁর মাদ্রাসায় প্রধান মোদার্রেছের পদ খালী ছিল। তিনি শিক্ষা কার্যে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কর্তৃপক্ষ অতি সাদরে তাঁহাকে আহবান জানাইলেন।

অতঃপর ১২৭০ হিজরীতে যশোর জেলার কাজীপদে তিনি স্বইচ্ছায় ইস্তফা দিলেন। এবং কলিকাতা আগমনে উক্ত মোদার্রেছি কার্যভার গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে তাঁহার কর্তব্য কার্য আরো বাড়িয়া গেল। একেতো খোদা প্রদত্ত আমানত-রূপী পবিত্র কোরান ও হাদীস শিক্ষাদান, এবং নিজ এবাদত ও তদুপরি মুন্সেফী আইন গ্রন্থ অধ্যয়ন।

এই ভাবে তাঁহার এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল। মুন্সেফী পরীক্ষার সময় আসিল। কাগজ কলম হাতে তিনি মানব কল্যাণে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী। তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইল। ফলাফলের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন। গুজব রটিল, এইবার দুষ্কৃতিকারীরা পরীক্ষার প্রশ্ন বাহির করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে। ধীরে ধীরে গর্ভণমেন্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরীক্ষার ফল বাহির হইল, হযরত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই দিকে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেও

দুষ্কৃতিকারীদের আচরণের ফলে এইবার সকলের পরীক্ষা নাকেছ ও অগ্রাহ্য করা হইল। কাহাকেও সনদ দেওয়া হইবে না। ইহা কার্যকরী করা হইল। কাহাকেও পরীক্ষার সনদ দেওয়া হইল না। যাহাকে আহ্‌কামূল হাকেমিন নিজ প্রতিনিধিত্ব অর্পণে সর্বোত্তম হাকিমের আসন দান করিয়াছেন, তাঁহাকে কি তিনি সাধারণ হাকিমী আসনে বসিতে দিবেন। সেই সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইল না। সামান্য একটি পার্থিব বিচারালয়ের কার্যে তাঁহাকে আটক রাখা আল্লাহ্ পাকের অভিপ্রায় ছিল না। খোদার বন্দেগী সমাপনই তাঁহার একমাত্র কর্তব্যপূর্ণ চাকুরী ছিল। কলিকাতা নগরীর অলিতে গলিতে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতাবাসী তাঁহাকে অত্যধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহার জন্য ওয়ায়েজ মাহফিলের আয়োজন করিতেন। অতি সম্মান ও আদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইত। পাল্কী যোগেই তাঁহাকে প্রায় সময় মজলিসে নেওয়া হইত।

দশম পরিচ্ছেদ

বেলায়ত অর্জন

একদা হযরত পাল্কীযোগে ওয়ায়েজ মাহফিলে যাইতেছিলেন। পথে এক দূরদর্শী তীক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন সাহেবে কশ্‌ফ অলির অন্তঃচক্ষুতে তিনি ধরা পড়িলেন। ইনিই হইলেন সু-প্রসিদ্ধ বাগদাদবাসী হযরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম মহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এঁর বংশধর ও উক্ত তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত সুলতানুল হিন্দ সরদারে আউলিয়া গাউছে কাওনাইন শেখ সৈয়দ আবু শাহ্‌মা মুহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহোরী (রঃ)। তাঁহারা তিন ভাই! তাঁহার বড় ভাই এঁর পবিত্র নাম হইল হাজীউল হারমাইন হযরত শাহ্ সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (রঃ)। তিনি খোদার ভাবে চিরকুমার ছিলেন। হযরত শাহ্ সৈয়দ দেলাওয়ার আলী (রঃ) অতি জজ্‌ব পূর্ণ কুতুবে জামান ছিলেন। তিনি সর্বদা খোদা প্রেম প্রেরণায় মত্ত অবস্থায় হুজুরায় গোশানশীন থাকিতেন। সপ্তাহে শুক্রবার একদিন মাত্র তিনি হুজুরার বাহিরে আসিতেন। তিনি কাহাকেও হাত ধরিয়া মুরীদ তলকীন করিতেন না। কথিত আছে তিনি যখন বাহিরে পদার্পণ করিতেন, তাঁহার চেহারা দর্শনে মানুষ কি পশুপক্ষী পর্যন্ত জজ্‌বাতী অবস্থায় অজ্‌দ ও প্রেরণায় প্রেম নৃত্য করিতে থাকিত। তাঁহার ছোট ভাইয়ের পবিত্র নাম ছিল, হযরত শাহ্ ছুফী মুহাম্মদ মুনির। তিনিও সুপ্রসিদ্ধ পীরে কামেল ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব পুরুষগণ দিল্লী ও লাহোরে থাকিয়া হেদায়েত কার্য করিতেন। ক্রমান্বয়ে লাহোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত তাঁহাদের হেদায়েত কার্য চলিতে থাকে। হেদায়ত উপলক্ষে তাঁহারা কলিকাতা নগরীতে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের শিষ্য ও ভক্ত অনেক। হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবু শাহ্‌মা তাঁহার অর্জিত "লাল" অর্পণ করিবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে আছেন। একদা জোহর নামাজান্তে তিনি তারকা বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মত তাঁহার ভক্ত মন্ডলীর মধ্যে তাঁহার বালাখানায় বসিয়া ধর্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন, তখন কে যেন আড়ালে থাকিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,-"হে জ্যোর্তিময় "লালধারী" আবু শাহ্‌মা! তোমার বাঞ্ছিত মুরাদ, অতুলনীয় উপযোগী পাত্র, তোমার সম্মুখ দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে অতি সত্বর সাদরে গ্রহণ কর।" দেখিতে দেখিতে হযরতের পাল্কী সোয়ারী তাঁহার বালাখানার সম্মুখস্থ বৈঠকখানার পার্শ্ববর্তী রাস্তার দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। প্রেমিক শিকারী শিকারের আশায় নয়ন তীর নিক্ষেপ করিতে শিকার যেন তীর বিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যেন পাল্কীর ফাঁদে হযরতের চন্দ্রাকৃতি

অত্যুজ্জ্বল চেহারা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বিষ্ময়ে বিমুগ্ধ ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে তিনি কৃতি সন্তান সোয়ারী। নিশ্চয় তিনি হাদীকুল বীর কেশরী। তোমরা কি কেহ তাহাকে চিন?" সকলে স্বচকিত ও নীরব। কেবল মাত্র তাঁহার শিষ্য প্রবর শাহ্ এনায়েত উল্লাহ সাহেব উত্তর করিলেন, "হাঁ হুজুর চিনি।" তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করিলেন। ইহাতে তিনি আরো অধিক আকৃষ্ট হইয়া গেলেন। শাহ্ এনায়েত উল্লাহ সাহেবকে তড়িৎ গতিতে তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ বাসনা জানাইতে আদেশ দিলেন। শিষ্য প্রবর হযরতের পাল্কীপাশে যাইয়া সংবাদ জানাইলেন। হযরত দ্বিধায় পড়িলেন। বহু লোক ওয়ায়েজ মাহফিলে তাঁহার জন্য এন্তেজারে রহিয়াছে। আয়োজিত মাহফিল। আবার এইদিকে একজন মহান অলি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আহবান উপেক্ষা করা চলে না। নিশ্চয় ইহাতে কোন প্রকার খোদায়ী রহস্য নিহিত আছে। হযরত ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া চুপ রহিলেন। তৎপর বলিলেন, "আচ্ছা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ। তাহাই হউক। চলুন।" সোয়ারী ফিরাইয়া দেওয়া হইল। পাল্কী হইতে তিনি অবতরণ করিলেন। উপস্থিত শিষ্যরা তাঁহাকে অতি আদর অভ্যর্থনায় তাহাদের পীর সাহেবের বৈঠকখানায় নিয়া গেলেন। হযরত খেদমতে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন জানাইতে হযরত শাহ্ সৈয়দ আবু শাহ্‌মা সাহেব তাঁহার গদীশরীফ হইতে দন্ডায়মান হইয়া সাদরে তাঁহার সহিত ছুন্নতী করর্মদন ও বক্ষ মিলামিলি করিয়া তাঁহার পালঙ্কের উপর নিজ গদীতে পরম বন্ধুর মত পার্শ্বে বসিতে দিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রেম বিনিময় ও রহস্যপূর্ণ প্রেমালাপ আরম্ভ হইল। শিষ্যবৃন্দ এই অভিনব অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে অবাকচিত্তে তাঁহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই প্রেম অভিনয় ক্রীড়ায় লাহোরী সাহেবের প্রেম মঞ্চে বসিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী গোপনে লভিয়া লইলেন তাঁহারই অর্জিত গাউছিয়া "লাল"। নয়ন ঠারে আহরণ করলেন তাঁহারই আহরিত সৌভাগ্য পরশমণি। তাঁহারই দস্তে বায়াত হইয়া প্রতিদানে প্রাপ্ত হইলেন গাউছিয়তের খোদা-দাদ খনি।

অতঃপর শাহ্ ছুফী হযরত আবু শাহ্‌মা তাঁহার অন্যতম খলিফা উক্ত এনায়েত উল্লাহ সাহেবকে আন্দর বাবুর্চি খানায় পাঠাইয়া যাবতীয় তৈয়ারী খাসখানা হযরতের সামনে উপস্থিত করিতে নির্দেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে উহা প্রতিপালিত হইল। এনায়েত উল্লাহ সাহেব পাত্রপূর্ণ সমস্ত খাসখানা হস্তে খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত আবু শাহমা সাহেব উহা কবুল করিতে হযরত সাহেবকে নির্দেশ দিলেন। হযরত নিজ বাসভবন হইতে যথারীতি পানাহার করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। তবুও তাঁহার পীর সাহেব প্রদত্ত ফয়েজ বরকতপূর্ণ তাবারোকী খানা গ্রহণে তিনি বিরত হইলেন না। "বিছমিল্লাহ" বলিয়া খানা গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে পাত্রপূর্ণ খানা নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার তৃপ্তি হইল না। যদিও পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ খানা ছিল। তিনি আরো খানা চাহিলেন। হযরত আবু শাহ্‌মা সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হে প্রিয়তম! আমার বাবুর্চি খানায় আপনার জন্য যাহা সুরক্ষিত ছিল তাহা আনিত হইয়াছে। আরো অধিক প্রয়োজনে আপনি স্বহস্তে পাকাইয়া খাইবেন।"

সত্যই যেন তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কলবরূপী বাবুর্চি খানায় সারাজীবনের অর্জিত খোদায়ী নেয়ামত, যাহা মওজুদ ছিল সবই তাঁহাকে অর্পণ করা হইয়াছে। আরো

প্রয়োজন হইলে, তাঁহাকে উহা নিজ প্রেম প্রেরণায় এবাদত ও রেয়াজতের বদৌলতে অর্জন করিতে হইবে। এমনি করিয়া হযরত আক্দাছ অপ্রত্যাশিত ভাবে পীরের প্রথম সাক্ষাতে তাঁহার সঞ্চিত যাবতীয় নেয়ামত ও খোদা দাদ শক্তি লুটিয়া নিলেন এবং প্রথম দর্শনে তাঁহার সমগুণে রূপায়িত হইয়া প্রধান খলিফা রূপে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর গাউছে পাক সেইদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর হযরত শাহ্ ছুফী আবু শাহ্মা সাহেব বলিতে লাগিলেন, "এইবার খোদা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। যাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলাম তাঁহাকেই আল্লাহতা'লা মিলাইয়া দিলেন। সারাটা জীবনে সবেমাত্র একটি লোকের হাতেই হাত মিলাইলাম। আল্লাহ তাহাকে মহামহিমান্বিত করুন।"

হযরত বিদায় গ্রহণান্তে বাসায় ফিরিলেন বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমনি এক যোগ সূত্র পাতিয়া রহিল যাহার কোন সীমা পরিসীমা নাই। আছে শুধু সুদূর প্রসারী দাহন। তাঁহারা একে অন্যের মিলন প্রয়াসী, দর্শন প্রত্যাশী। একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কালচক্রে কোনদিন সাক্ষাৎ করিতে অপারগ হইলে হযরত আবু শাহ্মা বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং হযরত আক্দাছের বাসায় আসিয়া পড়িতেন। এমনি ভাবে দুই দেহে এক প্রাণ হইয়া হযরত আক্দাছ ফানাফিশেখ মোকাম অতি সত্বর পূর্ণাকারে অতিক্রম করিয়া লইলেন। এমতাবস্থায় কিছুদিন যাওয়া আসা চলিতে লাগিল।

এই হেন অবস্থায় তিনি পূর্ব বর্ণিত শাহ্ সাহেবের বড় ভাই কুতুবুল আক্তাব জনাব হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (রঃ) সাহেবের খেদমতে গিয়া ফয়েজ গ্রহণে আদিষ্ট হইলেন। পীর সাহেবের এই আদেশে তিনি অতি আহলাদিত চিত্তে তাঁহার খেদমতে রওয়ানা হইলেন। এমনি সময় চিরকুমার আলহাজ্ব হযরত শাহ্ দেলাওয়ার আলী (রঃ) সাহেব আপন হুজুরা শরীফ হইতে বাহিরে পদার্পণ করিলেন। হযরত আক্দাছ তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতেই তাঁহার শুভদৃষ্টি হযরতের প্রতি আকর্ষিত হইল। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর ফয়েজ এত্তেহাদীর প্রভাব বিস্তার করিলেন এবং তাঁহার অর্জিত সমস্ত খোদাদাদ শক্তি এবং বাতেনী নেয়ামত কুতুবিয়ত পরশমণি হযরত আক্দাছকে সাদরে দান করিয়া দিলেন। এইভাবে হযরত দুইজন মহান পবিত্র মণিধর আউলিয়ার দুর্লভ মণি আহরণ করিয়া নিলেন। না জানি কোন মোহিনী বলে কোন ঐশ্বরীক যাদুর আকর্ষণে প্রথম সাক্ষাতেই হযরত তাঁহাদের সর্বস্ব লুটিয়া নিতে পারিয়াছিলেন।

কামেলিয়ত অর্জন

এখন হইতে হযরতের জজ্বাতী অবস্থা অত্যধিক গালেব হইয়া পড়িল। ত্রিমুখী প্রবাহী চতুর্বিধ ধারাবাহী বাগদাদী সাগরের সংমিশ্রণে মহা প্রশান্ত সাগর সৃজিত হইল। "অলাল আখেরাতো খায়রুল লাকা মিনাল উলা।" প্রথম হইতে সর্বশেষ পরিণাম ফল অতি উত্তম। এই পবিত্র খোদাবাণীর সারবস্তু হইয়া উহাদের জজ্বাতী হিল্লোল মালায় সমস্ত

সাগর মহাসাগর হিল্লোলিত হইতে লাগিল। তবুও তিনি শান্ত নন ক্ষান্ত নন। তিনি আরো অসীমের প্রত্যাশী। সসীমে মিশিয়া কিভাবে তিনি শান্ত হইবেন? অপরিসীম বিশ্বজোড়া বিশাল সাগর হইতেই তাঁহার বাসনা। নিখিল ধরণীর সমস্ত মহাসাগর মিলন কেন্দ্র ও শক্তি উৎস গঠিত হইতেই তাঁহার একমাত্র কামনা। তাই তিনি দিবাভাগে দ্বীনি শিক্ষাদানে ও সারাটি রাত্র জাগিয়া নিঝুম ধ্যানে অক্লান্ত এবাদত ও অকাতর রেয়াজত সাধনায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি যেন তাঁহার পীর সাহেবের "সহস্তে পাকাইয়া খাইবেন" পবিত্র নির্দেশ বাণীকে সযত্নে কার্যকরী করিতে লাগিলেন। আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রাচুর্যে প্রায় সময় তিনি আত্মভোলা হইয়া পড়িতেন। মোরাকাবা মোশাহেদায় তাঁহার অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। ক্রমেই হযরতের জজ্‌বাতী হাল এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিল যে প্রেরণাধিক্যে বিভোর হইয়া পানাহার ত্যাগ পাইতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই, জীবন মরণের আশা ও ভয়ভীতি নাই। অনিদ্রা অনাহারে প্রায় দিন কাটিতে লাগিল। সময়ে যৎসামান্য নাস্তা বা পানীয় পানে রোজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সমস্ত শরীর কৃশ ও চক্ষু চেহারায় মলিনতার চিহ্ন দেখা দিল। বায়াত গ্রহণের প্রায় সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল পর ১২৭৩ হিজরীতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া একেবারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি নিতান্ত দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাতো তাঁহার সাধারণ রোগ নহে। ইহা তাঁহার অজানাকে জানিবার জন্য অন্তবিপ্লব। গোপন খোদা রহস্য হৃদয়ঙ্গমে অশান্তি ও উদ্বেগ। তাঁহার চিরবাঞ্ছিত স্থায়ী বন্ধুর প্রেমের দাহন। যাহার বিরাম ও উপসম নাই। ডাক্তার ও ঔষধ নাই, আছে মাত্র প্রিয় মিলনের দুর্জয় আশা। অন্তরে হিল্লোলিত নূরানী তরঙ্গমালা।

এই সময় তাঁহার দুইজন বন্ধু প্রাণপণে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছিলেন। একজন সুলতানপুরী মওলানা জান আলী সাহেব অপর জন হইলেন আসকরাবাদী জনাব মওলানা আবদুল বদি সাহেব। তাঁহাকে দেখিতে সর্বদা লোকসমাগম হইতে লাগিল। কাহারো সঙ্গে কোন কথা নাই শব্দ নাই। তাঁহারই ভাবে তিনি নিস্তব্ধ এবং অভিভুত অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

স্বদেশী বন্ধুদ্বয় দৈনন্দিন তাঁহার দৈহিক অবনতি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। কি করিয়া এমতাবস্থায় তাঁহাকে বাড়ী আনা যায়।

এই দিকে হযরতের পরিবারে এক মহা বিপর্যয় ঘটিল। তাঁহার আব্বাজান মওলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ সাহেব ১২৭৫ হিজরীর আষাঢ় মাসের ২৯ তারিখে রোজ সোমবার দিবা দ্বিপ্রহরান্তে জোহর নামাজের পর এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া জান্নাতবাসী হন। শোকে তাপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল, সকলেই অশান্তিতে আছেন। এমনি দুঃসময়ে আসিল হযরতের দুঃসংবাদের পত্র। সকলে মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। খোদার মহিমা! দুঃখের উপর দুঃখ। হযরতের জননী সন্তানের জন্য আকুল হইয়া পড়িলেন। সকলের পরামর্শ ক্রমে হযরতের মধ্যমভ্রাতা জনাব শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল হামিদ সাহেবকে কলিকাতায় পাঠান হইল। তিনি হযরতকে তাঁহার পীরের নির্দেশক্রমে উক্ত বন্ধুদ্বয়ের সহায়তায় অতি যত্নে বাড়ীতে আনিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ বন্ধন ও সাংসারিক জীবন

খোদাতা'লার অসীম কৃপা। বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁহার শরীর যেন দিন দিন সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। তিনি কিন্তু পূর্ববৎ ধ্যানরত এবাদত রেয়াজতে নিমগ্ন রহিয়া গেলেন। ক্রমে কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার শারীরিক অবস্থা বেশ উন্নতি লাভ করিল। সংসারের প্রতি তিনি যেন একেবারেই উদাসীন। কর্ম কোলাহল, সামাজিক জীবনের পঙ্কিলতা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্র জ্যোতির্ময় গতি স্রোত যাহাতে রুদ্ধ হইয়া না পড়ে, পারিপার্শ্বিকতার মলিনতা, পারিবারিক মায়ামোহ যাহাতে তাঁহার মানসক্ষেত্রে প্রেম পথে আবরণ সৃষ্টি করিতে না পারে তৎজন্য তিনি সর্বদা সচেতন ও সজাগ রহিলেন। প্রকৃতির অন্তরালে কি যেন তিনি দেখিতে পাইতেন; কি যেন বিস্ময়কর রহস্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি অবিরাম নয়নে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন।

তাঁহার স্নেহময়ী জননী পুত্রের এইরূপ অবস্থা দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিভাবে সংসারের প্রতি পুত্রের মন আকৃষ্ট করিতে পারে। স্থির করিলেন বিবাহের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলে নিশ্চয় তিনি সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন। বিবাহ ঠিক করা হইল। ১২৭৬ হিজরীর বৈশাখ মাসে ৩২ বৎসর বয়সের সময় একদা আজিম নগর নিবাসী মুন্সী সৈয়দ আফাজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের কন্যা মোছাম্মৎ সৈয়দা আলফুন্নেছা বিবির সহিত হযরতের বিবাহ বন্ধন স্থাপন করা হয়। প্রকৃতির লীলা; আল্লাহতা'লার মর্জি, ছয়মাসের মধ্যে তাঁহার এই বিবি জান্নাতবাসী হইলেন। ঠিক সেই বৎসরই হযরতের জননী তাঁহাকে পুনঃ উক্ত আজিম নগর নিবাসী সৈয়দা লুৎফুন্নেছা বিবির সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

তিনি উক্ত আজিম নগর নিবাসী জনাব সৈয়দ আফাজউল্লাহ সাহেবের স্নেহের কন্যা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও রূপ লাবণ্যময়ী রমণী ছিলেন। প্রেম প্রীতি ভালবাসায় তিনি নানাভাবে কায়মনোবাক্যে হযরতের চিত্তবিনোদনে খেদমত করিয়া সংসারের প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিশ্ববিমোহন পরম সুন্দরের অপরূপ রূপের এবং প্রেমের আকর্ষণে যাহার মনোপ্রাণ হরিয়া নিয়াছে তাঁহাকে কি দুনিয়ার মোহ বা মানবী সুন্দরীর প্রেম জাল অনুক্ষণ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। হযরত পূর্বের মত নির্বিকারে আরো অধিকতর রেয়াজত সাধনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এইভাবে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সুদীর্ঘ প্রায় দুই বৎসর কাল গত হইয়া গেল। ১২৭৮ হিজরীতে তাঁহার এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইল সৈয়দা-বদিউন্নেছা বিবি। ইনি চার বৎসর বয়সে জান্নাতবাসী হন। ইহার পর তাঁহার আর একটি পুত্র সন্তান হইয়াও অল্পদিনে ইহ সংসার ত্যাগ করেন। এখন হযরত নিঃসন্তান। সকলেই চিন্তিত। ১২৮২ হিজরী বাংলা ১৩ই চৈত্র তারিখ সন্ধ্যাকালে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম রাখা হয় সৈয়দ ফয়জুল হক। ইহার আরো আট বৎসর পর ১২৮৯ হিজরীতে তাঁহার এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হন! তাঁহার নাম রাখা হয় সৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা। হযরতের একমাত্র পুত্র সন্তান জনাব মওলানা ফয়জুল হক সাহেব দুনিয়াতে দুইজন পুত্র সন্তান এক কন্যা রাখিয়া অল্প বয়সে হযরতের পূর্বেই জান্নাতবাসী হন।

হযরত আক্‌দাছ ১২৭৬ হিজরী হইতে ১২৭৮ হিজরী সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র দুই বৎসর কাল, মাঝে মাঝে হেদায়ত কার্য ও ওয়ায়েজ নছিহত করিতেন, তাহাও যথারীতি নয়। সময়ে সময়ে তিনি দাওয়াত গ্রহণ করিতে মোটেই রাজী হইতেন না। কিছুদিন পর তিনি ওয়ায়েজ নছিহতও ছাড়িয়া দেন। এমনিভাবে সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল কাটিয়া গেল। তাঁহার সময় আসিল। বিশ্বপ্রভু পরম করুণাময় যেন তাঁহার প্রেম প্রেরণার টানে আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রেমপুষ্প সজ্জিত হৃদাসনে আসিয়া চিরতরের জন্য বসিয়া গেলেন। এইভাবে এমনি করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় যাবতীয় সুখশান্তি ও স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়া, অবিরাম অবিশ্রান্ত কঠোর নিঝুম সাধনার পর হযরত আক্‌দাছ সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি, সর্বোত্তম বেলায়ত পদবী ঃ- বেলায়তে ওজমার অধিপতি সাব্যস্ত হইলেন। পরম দয়াময় বিশ্বপতির অদ্বিতীয় মাহবুব মুহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) স্থানে উপবিষ্ট সর্বগুণাধিপতি ও শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

হযরত আর গোপনে থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে অসীম দয়াল! তৃষ্ণার্ত ভূবন বাসীর জন্যই তাঁহার সৃজন। তিনি কি আর প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারেন? খোদা যে নিজ হস্তে তাঁহার প্রচার ভার গ্রহণ করিলেন। হযরত ছিলেন বেপরওয়া। অর্থ উপার্জনে তিনি কোন চেষ্টাই করিতেন না। পরম দয়াময়ের প্রতি তিনি সুদৃঢ় নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার অটল বিশ্বাস, তিনিতো একমাত্র তাঁহারই। নিশ্চয়ই তিনি প্রতিপালন করিবেন। তাঁহার তাওয়াক্কোলের এই সুদৃঢ় রজ্জুই তাঁহার উপার্জনের একমাত্র প্রচেষ্টা।

তাঁহার ভাইগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাহারা ভাবিলেন, তাহাদের উপার্জিত অর্থ না পাইলে হয়ত তিনি উপার্জনে সচেষ্ট হইবেন। তাই তাহারা হযরতকে ভিন্ন সংসার ও পৃথকান্নের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিলেন। তাহারা হইলেন হযরতের ছোট ভাই। তাহারা যাহা করিলেন, ইহাতেই হযরত সন্তুষ্ট রহিলেন। হযরত বুঝিতে পারিলেন ইহা আল্লাহতা'লারই মর্জি। আল্লাহ যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

হযরতের পৈতৃক জমিতে কে চাষাবাদ করিবেন? স্থির করিলেন, তাঁহার ভাইয়েরা জমিতে চাষাবাদ করিবেন। তাহাদের পারিশ্রমিক বর্গা ভাগ অর্ধাংশ কাটিয়া বাকী অর্ধাংশ হযরতকে দিবেন। তখন সন ১২৮২ হিজরী। এখন হইতে হযরতকে মোট চাষাবাদী উপার্জনের এক ষষ্টাংশ দেওয়া হইবে। এই সিদ্ধান্তে এজমালী চাষ কার্য চলিতে

লাগিল। হযরতের আম্মাজানও তাঁহার সঙ্গে আছেন। হযরতের এখন ভিন্ন পরিবার। তবুও তাঁহার কোন চিন্তা নাই, উপার্জনের কোন প্রচেষ্টা নাই। আছে মাত্র পরম দয়াময়ের উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা। তিনি বলিতেন মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম বান্দা। ভক্তি ভরে তাঁহারই দ্বারে আত্মসমর্পণ করা একান্ত উচিৎ। অতএব পাপ হইতে বিরত থাক। তাঁহার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হও। তাঁহার সন্তুষ্টি ও শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর। তাঁহার সমস্ত কার্যে ছবর ও ধৈর্য ধরিয়া থাক। তিনি নিশ্চয় সর্বসমস্যা সমাধা করিবেন। দৃঢ় সংকল্পী হযরত কাহারো কথায় মন দেন না। কাহারো অনুরোধ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি শুধু আল্লাহ্‌র আদেশ ও ইঙ্গিত প্রতিপালন করিতেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বেলায়তের প্রথম বিকাশ ও ফতুহাত আরম্ভ

ধীরে ধীরে সাংসারিক অভাব আরো বাড়িয়া চলিল। তাঁহার আম্মাজান তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন। হযরত যে পর্ণকুঠিরে বাস করিতেন, উহা ছনের ছাউনি যুক্ত ছিল। অনেকদিন হয় উহার ছাউনি বদলান হইয়াছে। এখন ছাউনি বদলান নেহায়েত প্রয়োজন। হযরতের মাতা সাহেবানীর প্রচেষ্টায় কোন মতে বাঁশ ছনের সংস্থান হইল। ঘর ছাউনি দিতে লোক নিযুক্ত হইল। নির্দিষ্ট দিনে চারিজন লোক উপস্থিত। তাহারা দিন মজুরী "কামলা" কাজ করে। হযরতের আম্মাজান তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা আহারের সময় হইতেছে। মেহমান কর্মীদের তো খাবার দিতে হইবে। যোগাড় তো কিছুই নাই।" হযরত যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। তাঁহার মাতা সাহেবানী পুনঃ পুনঃ খাদ্য যোগাড় সম্বন্ধে হযরত আক্‌দাছের প্রতি তাগিদ দিতে লাগিলেন। হযরত মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আম্মা।" আবার পূর্ববৎ ধ্যানে রত হইলেন। তাঁহার উত্তরে মনে হইল যেন এখনও অনেক সময় আছে। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মজুরদিগকে উপবাসে ফেরত দিলে লোকের কাছে বড়ই নিন্দনীয় হইতে হইবে। এমনি করিয়া ঘরে বসিয়া আল্লাহ আল্লাহ করিলে, আল্লাহ ঘরে আনিয়া কি ভাত কাপড় দিবেন। কাজ কর্ম করিতে কি আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন?

এইদিকে ঘরের "কামলা" মজদুররা গোসল করিয়া খানা খাইতে আসিল। হযরত তাঁহার আম্মাজানকে বলিলেন, "আম্মাজান! মেহমানদের জন্য খানা খাওয়ার বিছানা দিতে হইবে। তাহারা খানা খাইবেন।" হযরতের আম্মাজান চিন্তিতভাবে, নিম্নস্বরে তাঁহাকে বলিলেন যে, "বিছানা দিয়া কি হইবে, ঘরে যে অদ্য রন্ধনের কোন প্রকার যোগাড়ও হয় নাই।" হযরত পুনঃ বলিলেন, "আম্মাজান! মেহমানদের জন্য খাওয়ার বিছানা দেওয়া হউক। আমিও আসিতেছি, এক সঙ্গে খানা খাইব।" অগত্যা হযরতের আম্মাজান বিছানার ব্যবস্থা করিলেন। মেহমান ঘরে আসিল। এখনও হযরত মেহমানদের নিকট আসিতেছেন না।

খোদার কি অপূর্ব লীলা! কি অলৌকিক বিস্ময়কর ব্যবস্থা! তাঁহার প্রিয়তম মাহবুবের ঘরে মেহমান আসিবেন, তাহাদের মেহমানদারী করিতে হইবে। তাহার বিধিব্যবস্থা তিনি পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুর মেহমান তাঁহারই

মেহমান। তাঁহার হাবিবের ইজ্জত তাঁহারই ইজ্জত। তাই তাঁহার উপর নির্ভরশীল সর্বোত্তম দোস্তের অতিথির আতিথেয়তা তিনি যেন স্বহস্তেই করিতেছেন।

মেহমান ঘরে উপবিষ্ট। আহার্যের প্রতীক্ষায় আছে। হযরত এখনও ঘরে আসেন নাই। তাঁহার আম্মাজান ও বিবি সাহেবা লজ্জায় ও চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। বাড়ীস্থ লোকেরা হযরতের উপর একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, বিছানা না দিয়া মেহমান উপবাস ফেরত দিলে কোন মতে চলিত। এখন একেবারে ইজ্জত যায়। চারিজন লোকের ব্যবস্থা আমরাই বা হঠাৎ কি করিয়া করিব! সকলে যেন শরমে মরিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় দেখা গেল, একজন লোক দুইজন মুটিয়া পিছনে, বাড়ীর দিকে আসিতেছে। মুটিয়াদের কান্ধে দুইভার আহরীয় সামগ্রী। তাহারা আসিয়া সামনের পুকুর ঘাটে বসিল এবং জানিতে চাহিল যে, ফকীর মওলানা সাহেবের ঘর কোনটি? তখন হযরত হুজুরার বাহিরে আসিলেন। তাহারা হযরতকে দেখিয়া অতি আনন্দে ভক্তিভরে সালাম ও কদমবুচি করিল এবং আনিত আহার্য হাদিয়া তাঁহার সামনে পেশ করিয়া আরজ করিল; হুজুর স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া-ই এ সামান্য হাদিয়াটুকু আপনার জন্য আনিয়াছি। হযরত সাদরে উহা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে অজু করিয়া ঘরে আসিতে নির্দেশ দিলেন। টুকরিতে বকরির কোরমা ও সরু চাউলের পোলাও খানাগুলি যেন এইমাত্র পাকাইয়া আনা হইয়াছে। তাহারা অজু করিয়া ঘরে আসিল। এখন হযরতের ঘরে সাতজন মেহমান। হযরত সাতজন মেহমান সঙ্গে নিয়া সানন্দে আহার করিলেন। সামান্য কিছু অংশ ঘরে রাখিয়া বাকীটুকু বাড়ীর অন্যান্যদের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এমনিভাবে আল্লাহতা'লা তাঁহার অনুগ্রহ ও প্রণয় বিকাশের প্রথম প্রবাহে তাঁহার প্রিয়তম মাহবুবের ঘরে স্বর্গীয় "মান্নাছালওয়া" সদৃশ্য উপঢৌকন দিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে অতিথি সেবা করিলেন।

কিছুদিন পর হযরতের স্নেহময়ী জননী এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া জান্নাতবাসী হইলেন। মাতৃ বিয়োগের পর তাঁহার খোদাভক্তি আরো ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হইয়া পড়িল। তাঁহার মাতৃপ্রেম ও আকর্ষণ উভয়ই কাটিয়া যেন নিজ প্রভুতে মিশিয়া রহিল। এখন হযরতের মুরব্বিস্থানীয় আর কেহই রহিলেন না। জন্মগুরু, ধর্মগুরু, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু সকলেই প্রস্থান করিয়া মহাশক্তি আল্লাহতা'লার জাতে সম্মিলিত হইলেন। সকলেই যেন সম্মিলিত ভাবে মহাপ্রভু "রাব্বুল আলামিনের" প্রতি তাঁহাকে স্বজোরে আকর্ষণ করিতেছেন।

এই দিকে হযরতের বয়সও চল্লিশ অতিবাহিত হইতে চলিল। তাঁহার একমাত্র মহাপ্রভূ তাঁহাকে আর গোপনে রাখিতে রাজী নহেন।

একদা হযরত আক্দাছ তাঁহার দায়রা শরীফ হইতে আন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন; এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের উঠানে ধান্য মাড়ান হইতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বিবি সাহেবানী হইতে ধান্য নেওয়ার জন্য টুকুরী চাহিলেন। বিবি সাহেবানী তাঁহাকে টুকুরী লইয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। কারণ ধান্য না দিলে

বড়ই লজ্জার কথা হইবে। ধান্য দিবার তাহাদের ইচ্ছা থাকিলে ডাকিয়া বলিত। হযরত তবুও পৈতৃক এজমালী জমিনের সরু ধান্য আনিতে টুকরীর জন্য বিবি সাহেবানীর নিকট পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা তিনি তাঁহাকে একখানা টুকুরী দিলেন। হযরত সাহেবানী তাহাদের স্বভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। হযরতও হয়তঃ দিবেন না জানিয়াও স্বয়ং গিয়াছিলেন। তাহাদের টুকুরীও আসিল। তাহারা স্ব স্ব টুকুরী ভরিয়া নিজ নিজ ঘরে ধান্য নিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত নিজ টুকুরীটিও তাহাদের সামনে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু হযরতের টুকুরী এখনো খালী। সরল বিশ্বাসী হযরত এখনও ধান্য আশায় বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ধান্য শেষ হইয়া গেল। তাহারা হযরতের টুকুরীতে ধান্য দিলেন না। হযরতকেও হাঁ-না কোন কথা বলিলেন না। হযরত বিস্ময়ে নির্বাক চিত্তে শুধু তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহারা স্ব-স্ব কুটিরে চলিয়া গেলেন। উদার হৃদয় হযরত ইতঃপূর্বে কোনদিন চিন্তাও করিতে পারেন নাই যে, সংসার কত কুটিল। সংসারী মানব যে এত স্বার্থপর। প্রেমবিহীন ভ্রাতৃত্বে যে এমনি কলুষ পূর্ণ স্বার্থপরতা ও অন্যায় জড়িত রহিয়াছে। স্বার্থ যে মানুষকে ন্যায় নীতি ও ভ্রাতৃস্নেহ পর্যন্ত ভুলাইয়া দিতে পারে। মানুষকে যে এমন অমানুষে পরিণত করিতে পারে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেন তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য তাঁহাকে দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি অপ্রতিভ অবস্থায় শূন্য টুকুরী হাতে লজ্জিত ভাবে নিজ কুটিরে ফিরিলেন। প্রতিবেশী মোয়াজ্জিন "শাহ্‌দুল্লাহ" অট্টহাসি দিয়া নিতান্ত ব্যঙ্গস্বরে বলিতে লাগিল কিহে! আপনারা যে মওলানা সাহেবের টুকুরীতে ধান্য দিলেন না। তাঁহাকে শূন্য টুকুরী হাতে ঘরে যাইতে হইল নাকি। আচ্ছা ঘরে যাইয়া তিনি কি বলিবেন? হযরতের বিবি সাহেবানী অতি অভিমান বশতঃ ও লজ্জিতভাবে বলিলেন কেন তিনি বারণ না শুনিয়া অপদস্ত হইবার জন্য টুকুরী লইয়া গেলেন। তাহারা যে এখন উপহাস করিতেছে। হযরত মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আমিতো আমার ন্যায্য প্রাপ্য আনিতে গিয়াছিলাম। তাহারা যে কেন দিল না, আমিতো জানিনা, আল্লাহ চায়তো অনেক ধান্য আসিবে।" এই বলিয়া তিনি নিজ ধ্যানে বসিয়া গেলেন।

এই ঘটনার দুই দিন পর মাইজভাণ্ডার গ্রাম নিবাসী আনর আলী সিকদার, গামরীতলা নিবাসী মুন্সী মিঞাজান এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট লোক প্রায় পঞ্চাশ আড়ী অতি উৎকৃষ্ট সরু ধান্য ও নানা প্রকার উপঢৌকন হাদিয়া লইয়া হযরতের দরবারে আসেন। এইদিন হইতে বহু হাদিয়া সামগ্রী নিত্য হযরতের খেদমতে আসিতে লাগিল। প্রতিদিন হাজতি মকছুদি ফরিয়াদি লোকজন হযরত সমীপে ভীড় জমাইতে লাগিল। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, কলা, দুগ্ধ, চাউল, মোরগ, মৎস্য, কোরমা পোলাও ইত্যাদি আসিয়া তাঁহার ঘরে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

দানবীর হযরত আক্‌দাছ এই সমস্ত হাদিয়া দ্রব্যাদি যৎসামান্য রাখিয়া বাকী সমস্তই বাড়ী ও প্রতিবেশীর প্রতি বিলাইয়া দিতে লাগিলেন। এমনকি কোন কোন সময় সমস্ত, গরীব দুঃখীদের জন্য দান করিয়া দিতেন। এবং সময়ে সময়ে বন্ধু ও আত্মীয় দুঃস্থদের জন্য লোক মারফত পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার দরবারে বহু গরীব দুঃখী ও

উপঢৌকন লোভীদের ভীড় জমিয়া যাইত। হযরতের নিকট যে যাহা চাইত অকাতরে দান করিয়া দিতেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) যেমন অনাথ দীনদরিদ্রের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য মহাসাম্রাজ্যাধিপতি আল্লাহতা'লার নিকট সাম্রাজ্যের প্রার্থী হইয়াছিলেন, তেমনি হযরত আক্দাছও দীনদরিদ্র অনাথের জন্য দোজাহানীয় দুঃখ বারণে দোজাহানের সাম্রাজ্য প্রত্যাশী হইয়াছিলেন। তাহাদের সৌভাগ্যেই পরম দয়াময় হযরতকে অক্ষয় অসীম সাম্রাজ্যের অধিপতি করিয়া অদ্বিতীয় ক্ষমতায় বিশ্বজীবের দুঃখহারি মহাত্রাণকর্তা হিসাবে শেষকালে এই বিশ্বে পাঠাইয়াছেন। বিশ্বকৌশলী পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রেমের দ্বিতীয় লহরীতে এমনি করিয়া তাঁহার প্রিয়তম মাহবুব, ভাণ্ডারের মালিক আউলিয়াদের শাহানশাহ, ছুফী মোত্তাকী সাধক ও মোজাহেদ বাহিনীর অগ্রনায়ক হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কে আর গোপনে থাকিতে না দিয়া প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করাইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হযরতের আলেম সমাজে পরিচিতি ও অলৌকিক কেরামতাবলী

দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা এবং খোদাদাদ অপূর্ব গুণজ্ঞানের মহিমা সূর্যরশ্মীর মত জগতে ছড়াইয়া পড়িল। মানব দানব, জ্বীনপরী, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁহার পবিত্র দরবারে হাজির হইতে লাগিল। জীবজন্তু পর্যন্ত যেন তাঁহার অনুগামী ও দাসত্ব বরণ করিয়া লইল। সবাই যেন নিজ নিজ আশা আকাঙ্খা পূরণ মানসে তাঁহার দরবার পানে ছুটিয়া চলিল। সবারই মুখে একই প্রচার, একই যশোকীর্তন দিগ্বিদিক ঘোষিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার "কশ্‌ফ কেরামত" বাক্য সিদ্ধি অলৌকিক ক্ষমতার যশোগান দেশদেশান্তরে তড়িৎবত ছড়াইয়া পড়িল। ফলে জনসমাগম এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহার বাড়ীঘরে স্থান সংকুলান কষ্টকর হইয়া পড়িল। হাদিয়া সওগাত, টাকা পয়সা এত অধিক পরিমাণে আসিতে লাগিল যে তাহা সামলান কষ্টকর হইয়া পড়িল। হযরতের বাড়ীঘরে হাট বাজারের মত জনসমাবেশ হইতে লাগিল। এমনকি হযরত আক্‌দাছ যথায় গমন করিতেন তথায় বিপুল জনতায় পরিবেষ্টিত হইয়া যাইতেন। হযরত কোনদিকে চলিলে পিছনে জনস্রোত বহিতে থাকিত। অগণিত গরীব মিছকিন ও অর্থলোভীরা তাঁহার খেদমতে আনিত হাদিয়া ও টাকা পয়সার আশায় তাঁহার বাড়ীর আশে পাশে, রাস্তাঘাটে সর্বদা প্রতীক্ষায় থাকিত। হযরত যাহাকে সামনে পাইতেন; যে যাহা চাহিত মুক্ত হস্তে অকাতরে বিলাইয়া দিতেন।

এখন হযরতের পরিবারে আর অভাব অনটন নাই। আছে মাত্র অতিথি সৎকার; ছায়েল প্রার্থীদের প্রতি আশাতীত দান। এমনকি অভাব ও দারিদ্রতা যেন হযরতের প্রতিবেশী দীন দুঃখীদের নিকট হইতেও চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

এই নবনিত্য বিপুল জনসমাগমে, হযরত তাঁহার আচরণ আলাপনে ভাবভঙ্গিতে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিচয়ে, তাঁহার বেলায়তে আস্থা-স্থাপনে ঐশ্বরিক অনুগ্রহকণা ও ফয়েজ বরকত অর্জন করিয়া স্ব স্ব আশা পূরণে আত্মা আলোকিত করিতে লাগিল। যেই বা তাঁহার খেদমতে একবার উপস্থিত হইত, কামনা তো পূরণ হইতোই তদুপরি পাত্র অনুযায়ী তাঁহার আধ্যাত্মিক সুনজরের শিকার না হইয়া পারিতো না। প্রত্যেকের অন্তরের সহিত তাঁহার পবিত্র নূরানী অন্তর যেন মিশাইয়া দিতেন। প্রত্যেকের আত্মার উপর

তাঁহার পবিত্র আত্মার করুণাস্রোত যেন প্রবাহিত করিয়া দিতেন। তাই এই অভিনব-জনসমাবেশে প্রত্যেকের অন্তরে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ঘুমে বা চেতনে কোন না কোন অলৌকিক ক্রিয়া থাকিত। কাজেই জাতি ধর্মনির্বিশেষে সবাই তাঁহার ভক্ত অনুরক্ত ও আসক্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব বরণে অনুগামী ও অনুসারী হইতে লাগিল। এই ভাবে তিনি জগদ্বাসীর বাহ্যিক উপকার ও আভ্যন্তরীণ খোদা প্রেমসুধা বরিষণে তাহাদের অন্তরে হেদায়তের আলোক বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিলেন।

এই দিকে তাঁহার আধ্যাত্মিক হেদায়ত অভিযান দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে। অপর দিকে নির্জীব ধর্মপ্রাণহীন বেশ পেশাধারী তথাকথিত আলেমগণ এবং কিছুসংখ্যক আধ্যাত্মিক প্রাণ হারা ক্ষুদ্রজ্ঞানী 'মওলানার' দল তাঁহার প্রেমরহস্য ও ভাবধারা বুঝিতে না পারিয়া কেহ বা জাতি হিংসায় নানা প্রকার অপপ্রচারে তাঁহার হেদায়েত অভিযানে বাধার অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিল। নবী করিম (সঃ) কে যেমন অবিশ্বাসীগণ "কাহেন" বা যাদুকর, পাগল ইত্যাদি অপবাদে অভিহিত করিয়াছিল, তেমনি ভাবে হযরত আক্দাছকেও বেলায়তে অবিশ্বাসী স্বল্পগুণী লোকেরা কেহ অপবাদ দিল "আমেলে ছিফলি" আর কেহ অপবাদ দিল "তছখিরে খালকের" আমলকারী বা সাধক বলিয়া। যদিও তাহারা নানাভাবে নানা অপচেষ্টায় জনগতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তবুও হযরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতারূপ মুক্ত তরবারীর সামনে নেহায়েত তৃণবৎ প্রতিবন্ধক ছিল।

হযরত গাউছে আজম পীরানে-পীর দস্তগীর মহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) সমীপে যেমন ধর্মমতবাদী আলেমগণ দলে দলে তর্কযুদ্ধে আসিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও খোদাদাদ শক্তির কাছে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব ও দাসত্ব বরণে চির অনুসারী হইয়াছিল। তদ্রুপ হযরত আক্দাছের সকাশেও অবিশ্বাসী আলেমগণ দলে দলে আসিয়া বিভিন্ন সূত্রে নানা কৌশলে হযরতের ঐশ্বরিক বেলায়তী প্রেরণা শক্তির সামনে মাথা নত ও শিষ্যত্ব গ্রহণে চির আসক্ত দাস শ্রেণীতে গণ্য হইতে লাগিল। বহু দূরদেশ হইতে তৃষ্ণার্ত সাধককুল এবং আমীর ওমরাহগণ অসীম বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তাঁহার বেলায়তী সুধা পান করার মানসে দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

হযরতের প্রভাবে বিপরীত দ্রব্যে রোগ মুক্তি

এই সময়ে পূর্ব মাইজভাণ্ডার গ্রাম নিবাসী জনাব কাজী মওলানা গোলাম কাদের সাহেবের দুই পুত্র ছিলেন। একজন আলহাজ্ব কাজী মওলানা আবদুল আজিজ ও অন্যজন ডাক্তার কাজী মওলানা খলিলুর রহমান সাহেব। ছেলে বেলায় তাহারা জ্বর ও নানাবিধ অসুখে ভীষণ ভাবে ভুগিতেছিলেন। বহু সুদক্ষ ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্য না হওয়ায়, তাহাদের পিতা-মাতা একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। তাহারা ভাবিলেন, পূর্ববর্তী ছেলেদের ন্যায় এরাও বোধ হয় ইহ সংসারে বেশী দিন থাকিবে না। তাহারা

হযরত সাহেব কেব্‌লার অনেক কেরামতি অলৌকিক দৃষ্টান্তের কথা শুনিয়া থাকিতেন কিন্তু বড় বিশ্বাস করিতেন না। সেকালে হযরত সাহেব "ফকির মওলানা সাহেব" নামে সুপরিচিত হইতেছেন মাত্র। কাজী সাহেবের বিবি একদিন নিরুপায় হইয়া কাজী সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলেন, "অনেক চেষ্টা তদ্বির তো করিলাম কিন্তু আল্লাহতা'লা তো কোন সুফল দিলেন না। ছেলেগুলি কি এমনি ভাবে মারা যাইবে। লোকে বলে আল্লাহতা'লার ফকিরেরা খোদার কলম পর্যন্ত রদ করিতে পারেন। এমন কি মৃত্যু কালে নাকি আজরাইলকে পর্যন্ত ফেরত দিয়া হায়াত বৃদ্ধি করিতে পারেন। মৃতকে পর্যন্ত জিন্দা করিতে পারেন। আমার বিশ্বাস-আপনি ছেলেদ্বয়কে ফকির মওলানা সাহেবের নিকট নিয়া দোয়া করাইলে আল্লাহ নিশ্চয় দয়া করিয়া রোগ মুক্তি ও হায়াত বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।" কাজী সাহেব উত্তর করিলেন, "বড়পীর জিলানী (রঃ) সাহেবের মত ফকির বর্তমান যুগে আর নাই। প্রায় সকলেই নানা পদ্ধতিতে আমল করিয়া এক একটি জীবিকা নির্বাহক উপায় স্থির করিয়াছেন মাত্র। এত ঔষধ পত্রে যদি আল্লাহ ভাল না করেন ফকির মওলানা কি করিবেন। আল্লাহ্‌র যাহা মর্জি তাহা হইবে। আমাদের ভাগ্যে যদি ছেলে না থাকে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। ইহাতে বিবি সাহেবা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, কাহাকেও যাইতে পাইলে ছেলেদ্বয়কে গোপনে তথায় তাঁহার দরবারে পাঠাইয়া দিবেন। যাহা হউক একদিন সুযোগ ঘটিল। একজন প্রতিবেশী হযরতের দরবারে আসিতেছে জানিয়া ছেলেদ্বয়কে গোপনে হযরতের খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার ছেলেদ্বয়কে বহুদিন যাবৎ আম খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আম টকে তাহাদের রোগবৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ ছিল। এই ভয়ে ছেলেরা আম খাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। ছেলেদ্বয় হযরতের সামনে উপস্থিত হইয়া সালাম করিতেই হযরত তাহাদিগকে তাঁহার সামনে ডাকিয়া বসাইলেন এবং অতি স্নেহের সহিত আম 'তবারোক' খাইতে দিলেন। ছেলেরা আম খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। বলিল যে আম খাইলে তাহাদের অসুখ বাড়িয়া যাইবে। আম খাওয়া তাহাদের নিষেধ। হযরত বলিলেন, "না না এইগুলি যে তোমাদের ঔষধ। এই আম খাইলে তোমাদের রোগ চলিয়া যাইবে।" ইহা শুনিয়া ছেলেদ্বয় আনন্দের সহিত আম খাইয়া নিল। তৎপর বিদায়ান্তে বাড়ীতে আসিয়া মাতাজানকে সমস্তই বলিল। তাহাদের মাতা মনে মনে ভয় পাইলেন। না জানি কি হয়? এই সমস্ত তাহাদের বাবাকে বলিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু দেখা গেল, ছেলেদ্বয় দিন দিন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কয়েক দিনের মধ্যে ছেলেদ্বয় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া স্বাস্থ্যেরও পরিবর্তন হইয়া উঠিল। তাহাদের পিতা কাজী সাহেব মনে করিতেছেন ডাক্তারের ঔষধে ছেলেরা আরোগ্য লাভ করিতেছেন। কিন্তু কথায় কথায় জানিতে পারিলেন যে ডাক্তারের ঔষধ অনেক দিন হইতে বন্ধ। বাড়ী আসিয়া ছেলের মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ছেলের চিকিৎসা করিতেছে? ছেলের মাতা উত্তরে বলিলেন, "ডাক্তার ফকির মওলানা সাহেব এবং ঔষধ হইল আম।" তিনি বিস্মিত হইয়া কথার তাৎপর্য জানিতে চাহিলে, বিবি সাহেবা অকপটে সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। কাজী সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়া খোদার দরবারে শোকরিয়া আদায় করিলেন এবং হযরতের বেলায়ত ও কেরামতে আস্থা স্থাপন করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি হযরতের

দরবারে যাওয়া আসা আরম্ভ করেন। তিনি নানা স্থানে হযরতের এই কেরামত বর্ণনা করিতেন। তিনি বলিতেন অলি আল্লাহর সুনজরে বিষও মধু হয় এবং কুপথ্যও ঔষধ হয়।

হযরতের অন্তর্দৃষ্টি ও কশ্‌ফ ক্ষমতার পরিচয়

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নানুপুর নিবাসী মোহাদ্দেছ মওলানা আবদুল আলী সাহেব হযরতের সমসাময়িক অতি প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি হযরতের বেলায়ত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। বরং আমলিয়ত ও সাধারণ সাধনা বলিয়া ধারণা পোষণ করিতেন।

একদা তিনি হালুয়া তৈয়ার করিবার মানসে মেওয়া ফল সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহার সুপরিচিত বাল্যবন্ধু হযরত ফকির মওলানা সাহেবের খেদমতে ছেলেকে পাঠাইবেন মনস্থ করিলেন। কারণ তিনি জানিতেন তাঁহার নিকট অনেক মেওয়া ফল আগত ব্যক্তিরা আনিয়া থাকে, সেখানে হয়ত কিছু ফল পাওয়া সম্ভব হইবে। একদিন তাহার বড় ছেলে মওলানা মুহাম্মদ সাহেবকে একটি টাকা ও একখানা রুমাল হাতে হযরতের বাড়ীতে পাঠাইলেন। এবং বলিয়া দিলেন "তুমি এই টাকাটি তাঁহার ছেলে সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবের হাতে দিয়া বলিও, আমার কতেক মেওয়া ফলের একান্ত দরকার। কোথাও সংগ্রহ করিতে পারিতেছিনা। তাই আমি কিছু মেওয়া চাহিতেছি। যে কয়েকটি পাও নিয়া আসিও। সবগুলি হয়তো পাওয়া সম্ভব হইবে না। কারণ আমার অনেক ফলের দরকার আছে।" তিনি কত পরিমাণ ও কি কি ফলের দরকার, কিছু উল্লেখ করেন নাই। পিতার আদেশ মত উক্ত মওলানা সাহেব হযরতের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। হযরতের ছেলে জনাব সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবকে সমস্ত কথা বলিয়া টাকা ও রুমাল দিতে চাহিলেন। তিনি ফল যত দরকার দিতে রাজী হইলেন। কিন্তু টাকা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু মওলানা সাহেব টাকা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন হযরত আন্দর বাড়ীর আন্দর হুজুরায় উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত তাঁহার ছেলে জনাব সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোহাদ্দেছ সাহেবের ছেলেকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন।" তাহাকে আন্দর বাড়ীতে পাঠান হইল। তিনি যাইয়া সালাম করিতেই হযরত রুমালখানা চাহিয়া নিলেন। কিন্তু টাকা নিলেন না। হযরত মেওয়ার টুকুরীসমূহ হইতে বাছিয়া বাছিয়া অনেক প্রকার ফল রুমালে বাঁধিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন "যান বাবা! এইগুলি আপনার বাবাকে দিয়া বলিবেন যে, তাঁহার নোছখা অনুযায়ী এখানে সমস্ত ফলই দেওয়া হইয়াছে। কোন অসুবিধা হইবেনা। পথে খুলিবেন না।" মওলানা মুহাম্মদ সাহেব রুমালের গাটুরীটি লইয়া সালাম প্রদানে বিদায় লইলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তাহাকে তো নোছখার কথা কিছুই বলা হয় নাই। কি করিয়া তিনি নোছখা অনুযায়ী কি কি ফল এবং পরিমাণ ঠিক করিয়া দিলেন। যাহা হউক বাড়ীতে নিয়া খুলিলেই তাঁহার কেরামত ও

সত্যতা বুঝা যাইবে। তিনি বাড়ী পৌঁছিয়া ফলের গাটুরী ও টাকাটি তাহার পিতার হাতে দিয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তাহার বাবা মোহাদ্দেছ সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমিতো আমার নোছখার কথা তোমাকেও বলি নাই। তিনি কি করিয়া আমার নোছখার পরিমাণ ও কি কি ফল দরকার তাহা বলিবেন।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ফলের পুটলীটি খুলিলেন। খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তিনি বিষ্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন তাহার নোছখায় লিখিত সমস্ত ফল তাহার মধ্যে আছে এবং নিক্তি লইয়া ওজন করিয়া দেখিলেন, তাহার নোছখায় লিখিত মতে সমস্ত ফলের ওজন যথাযথভাবে দেওয়া হইয়াছে। মোহাদ্দেছ সাহেব অবাক বিষ্ময়ে বলিতে লাগিলেন, "আমার ভুল আজই ভাঙ্গিল। তিনি সহজ লোক নন। তিনি নিশ্চয় একজন সাহেবে "কশ্‌ফ" অর্ন্তচক্ষুধারী প্রকৃত অলিআল্লাহ। তাহা না হইলে কি করিয়া তিনি আমার নোছকায় বর্ণিত এতগুলি ফল যথা পরিমাণে ও সংখ্যায় দিতে সক্ষম হইলেন। কি করিয়া তিনি উহার খবর রাখিলেন।" সেই দিন হইতে হযরতের বেলায়তে তাহার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিয়া গেল। এবং হযরতের খেদমতে আসিয়া ফয়েজ গ্রহণে তাঁহার ভক্তদের মধ্যে গণ্য হইয়া গেলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, হযরতের এই অপূর্ব কশ্‌ফ কেরামতের কথা ভুলেন নাই। তিনি ও তাহার ছেলে মওলানা মুহাম্মদ সাহেব যথায় যাইতেন হযরতের এই অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিতেন।

(ক) হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মোহছেনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও মোদার্রেছ নিযুক্ত

একদা জনাব শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ মছিহুল্লাহ মির্জাপুরী সাহেব "ছোবহ ছাদেকের" পূর্বে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার নিয়তে চট্টগ্রাম শহরস্থিত কাতালগঞ্জের মওলানা বশীর উল্লাহ সাহেবের মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কেবলমাত্র একজন লোক মসজিদে মোরাকাবা অবস্থায় আপাদমস্তক কাপড় আচ্ছাদনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে তাহার পীর ভাই মুছা মিঞা মনে করিয়া উপহাস ছলে বলিলেন, "দিনের বেলায় সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকিয়া শুধু রাত্রিকালে এইভাবে ফকিরী দেখানো কি শোভা পায়! মুখ ঢাকিয়া ফকিরী করিলে কি ফকিরী বেশী হাছেল হয়?" এইভাবে তিনবার বলার পরও কোন উত্তর না পাইয়া আবদার সহকারে স্বজোরে মুখ হইতে কাপড়খানি টানিয়া সরাইতেই দেখিলেন, তিনি তাহার কল্পিত মুছা মিঞা নন। তিনি মাইজভাণ্ডারী জনাব হযরত আক্‌দাছই। মোরাকাবায় তিনি বিভোর এবং নয়ন যুগল তাঁহার লোহিত বর্ণ। হযরতের সাথে বেয়াদবী হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন। তাহার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। হযরত আক্‌দাছ তাহার ভুল ও কাতরতা বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন, "সৈয়দ সাহেব নাকি! ভাই সাহেব। আমি নাছারাগণকে কালেকটারী পাহাড় হইতে নামাইয়া দিলাম, তথায় এক কুরছি আপনাকে; এক কুরছি মওলানা খোদা নওয়াজ সাহেবকে, এক কুরছি মওলানা জুলফিকার আলী সাহেবকে এবং আর এক কুরছি ছুফী আবদুল অদুদ সাহেবকে

প্রদান করিলাম" মওলানা সৈয়দ মছিহুল্লাহ সাহেব হযরতের এই পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণী এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ প্রভাবের তাৎপর্য মর্মরহস্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। প্রায় আট বৎসরকাল পর কোর্ট কাছারী উক্ত পাহাড় হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বর্তমান কাছারী পাহাড়ে চলিয়া যায়। এবং তথায় মোহছেনিয়া মাদ্রাসার পত্তন হয়। হযরতের ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত মতে উক্ত মওলানা ছাহেবগণও এই মাদ্রাসায় প্রথম মোদার্রেছ নিযুক্ত হন। তখন তিনি হযরতের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া তাঁহার কালাম ও প্রভাব রহস্য বুঝিতে পারিলেন। এইভাবে হযরতের ইঙ্গিতে ও প্রভাবে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথমে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইল।

(খ) হযরতের কশ্‌ফ ক্ষমতায় হাটহাজারী মাদ্রাসার স্থান নির্ধারণ

হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুকাল পূর্বে একদা ছায়ের করিতে করিতে হযরত আক্‌দাছ হাটহাজারী উপস্থিত হন। বর্তমান প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নিকটবর্তীস্থানে পৌছিয়াই বলিতে লাগিলেন, "এহাঁ কোরান আওর হাদিছ কি বো নেকাল রাহী হ্যায়।" অতঃপর তিনি উক্ত স্থানের চতুপার্শ্বে হাটিয়া উহার সীমা নির্দ্ধারণ করিলেন। সেই সময় তাঁহার এই পবিত্র ভবিষ্যত বার্তার রহস্য ও তাঁহার আচরণের সারমর্ম কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বহুকাল পর উক্তস্থানে ঐ নির্দ্ধারিত সীমাতেই হাটহাজারী মাদ্রাসার পত্তন হয়। তখনই উপস্থিত লোকগণ তাঁহার পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব ও স্থান নির্দেশের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন। হযরত যে অসাধারণ কশ্‌ফ কেরামত শক্তি রাখিতেন, উহা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিহিত হইলেন। তাই "নদওয়াতুল মোয়াল্লেফিন" নামক কেতাবের চতুর্থ খণ্ডে মওলানা নজির আহমদ সাহেব হযরতের কশ্‌ফ কেরামত সম্পর্কে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে তাঁহার প্রভাবে বাংলাদেশে বহু মাদ্রাসা, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

(গ) হযরতের প্রভাবে আহ্‌মদিয়া (জামেয়া মিল্লিয়া) মাদ্রাসা ও মসজিদের স্থান নির্দেশ ও পত্তন

বর্তমান তাঁহার পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত নাজিরহাট এলাকাস্থিত আহমদিয়া জামেয়া মিল্লিয়া মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন মসজিদ তাঁহারই পূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফল। উক্ত স্থানে একটি বড় বটবৃক্ষ ছিল। হযরত সাহেব কেব্‌লা "ছায়ের" কালে প্রায় সময় তথায় গাছ তলায় বসিতেন। একদা তিনি বটগাছের গায়ে পবিত্র কোরানের পাতা লটকাইয়া দিয়াছিলেন। এবং কালামে উক্ত মাদ্রাসা ও মসজিদের স্থানের প্রতি নির্দেশ

করিয়া বলিতেন "এখানে আমার ছয়টি কেতাব আছে" তোমরা পড়িও। ফলে বহুদিন পর উক্ত নির্দেশিত স্থানে হযরতের নামে এই মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে দেশবাসী হযরতের আচরণ ও কালাম রহস্য অনুভব করিতে সক্ষম হন।

হযরতের প্রভাবে সাগর ডুবি হইতে সামগ্রীসহ ভক্ত উদ্ধার

মওলানা রহিম উল্লাহ নামক হযরতের এক প্রতিবেশী আকিয়াব শহরে ওয়ায়েজ নছিহত ও হেদায়ত কার্য করিতেন। তিনি নিতান্ত দীনদার ছুফী মোত্তাকী ছিলেন। একদিন তিনি তথায় কোন এক বাড়ীতে ওয়ায়েজ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন আলেম বেশধারী লোক ভিখারী বেশে বাড়ীওয়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা জানাইলে বাড়ীওয়ালা তাহাদিগকে একখানা সিকি পয়সা দান করেন। ইহাতে তাহারা আরো বেশীর প্রত্যাশায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বাড়ীর মালিক অকথ্য ভাষায় তাহাদিগকে যথেষ্ট মন্দ বলেন। তবুও তাহারা চলিয়া না যাওয়ায় উক্ত মওলানা সাহেব মালিককে তাহাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার না করিতে বারণ ও উপদেশ দেন। বাড়ীর মালিক তাহাদিগকে আরো একসের চাউল আনিয়া দেন। অতঃপর তাহারা চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়া মওলানা সাহেব অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, অভাবে লোকের দ্বারস্থ হইলে তাহার কোন ইজ্জত ও মানবতা থাকেনা। অভাব মানবকে অতি হীন প্রকৃতির করিয়া দেয়। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন অভাব মোচনার্থে অর্থ উপার্জনে মানুষের দ্বারস্থ হইয়া আর হেদায়ত কার্যও করিবেন না। হেদায়তকারী মওলানা হইলেও মানুষ নিশ্চয় হেয় মনে করে। অন্তরের সহিত ইজ্জত করেনা। তিনি স্থির করিলেন চাকুরী করিবেন। এখন তিনি চাকুরীর সন্ধানে আছেন। একদিন শুনিতে পাইলেন তথায় হাসপাতালে কতগুলি লোক নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি তথায় গেলেন। কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপযুক্ত লোক দেখিয়া নার্সিং কার্যে ভর্তি করিয়া লইলেন। তিনি বাসায় আসিয়া স্বদেশী বন্ধু বান্ধবদের নিকট চাকুরীর খবর প্রকাশ করিলেন। তাহারা সকলে তাহার চাকুরীর সংবাদে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। তাহারা বলিলেন যে, তাহার মত একজন লোকের পক্ষে হাসপাতালে নার্সিং এর কাজ করিলে ইজ্জতের ক্ষতি হইবে।

এই চাকুরী না করিয়া বরং ব্যবসা করিলে অনেক ভাল হইবে। তিনি অর্থাভাবের কথা প্রকাশ করিলে, তাহাদের মধ্যে একজন ধনী লোক যত টাকার দরকার দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এবং উপদেশ দিলেন যে, মরিচের ব্যবসা করিলে ভাল হইবে, কারণ মরিচের চাহিদা এবং বাজার এক প্রকার ভাল দেখা যাইতেছে। তিনি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিলেন। তিনি চাকুরীতে যোগ না দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। সর্বপ্রথম এক হাজার টাকার মরিচ চালান দিলেন। ইহাতে তাহার পাঁচশত টাকার উর্দ্ধে লাভ হইল। এই সংবাদে অর্থ সাহায্যকারী বন্ধু ও অন্যান্যরা খুব খুশী হইলেন। বাজারের অবস্থা বুঝিয়া এইবার তিনি আরো কিছু টাকা লইলেন। এইবার দুই হাজার টাকার মরিচ ক্রয় করিয়া নৌকা যোগে আকিয়াব শহরের প্রতি রওয়ানা হইলেন। গ্রাম্য বাজার হইতে

মরিচ ক্রয় করিতেন। আকিয়াব শহর হইতে উহা অনেক দূরে। নৌকাপথে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর রাত হইয়া গেল। বেশী রাত্রে নৌকাপথে অসুবিধা হইবে মনে করিয়া ঘাটে নৌকা বাঁধিলেন এবং মাঝিগণ সহ ঘুমাইয়া পড়িলেন। শেষ রাত্রে মওলানা সাহেব স্বপ্নে দেখেন যে, কে যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন' "মওলানা সাহেব সাবধান হউন। বিপদ অতি নিকটে।" তিনি কম্পিত হৃদয়ে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন এবং আকাশের প্রতি তাকাইলেন; দেখিলেন ঘনকৃষ্ণ মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাইতেছে। তিনি মাঝিমাল্লাদের তাড়াতাড়ি ডাকিয়া তুলিলেন। তাহারা নৌকা ও মাল রক্ষায় চেষ্টিত হইল। আর তিনি বিপদ বারণে খোদাতা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনায় রত হইলেন। ভীষণভাবে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সবাই নৌকার আশা ছাড়িয়া প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চক্ষুর পলকে তাহার নৌকা সাগর গর্ভে বিলিন হইয়া গেল। মাঝি মাল্লারা কে কোন দিকে গেল তাহার ঠিকানা রহিলনা। তিনি তুফানের প্রবল বেগে বৃষ্টিপূর্ণ তরঙ্গের সাথে প্রাণরক্ষা অভিযানে মত্ত হইয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে বঙ্গোপসাগরে পৌছিয়া গেলেন। তিনি তখনও অচেতন হন নাই। এই হেন সঙ্কটময় অবস্থায় তাহার হৃদয়ে সৌভাগ্য তারা উদিত হইল। তিনি তাহার পীর ভাই স্বদেশী ফকির মওলানা সাহেবের কথা স্মরণ করিলেন। তিনি সাহায্য প্রার্থনায় নিয়ত করিলেন; যদি আল্লাহ এবার প্রাণে রক্ষা করেন নিশ্চয় ফকির মওলানা সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইবেন। অসীম ক্ষমতাশালী দয়ালু হযরত, স্মরণের সাথে সাথে তাঁহার স্মরণকারী পীর ভাইকে এই মহা সঙ্কট হইতে রক্ষা না করিয়া পারিলেন না। তিনি সাগর বক্ষে তাঁহার শুভ প্রভাব বিস্তার করিলেন। এই দিকে মওলানা সাহেব দেখিতে পাইলেন একখানা নূরানী জ্যোতিঃ অতি ক্ষিপ্ত বেগে তাহার দিকে আসিতেছে। চক্ষুর পলকে দেখিতে পাইলেন, জ্যোতির্ময় হযরত তাহার ডানবাহু এবং তাহার পীর হযরত শেখ মুহাম্মদ ছালেহ লাহোরী কাদেরী সাহেব তাহার বাম বাহু ধরিয়া তাহাকে সাগর জল হইতে উঠাইয়া আনিয়া সমুদ্র তীরে এক বৃক্ষতলে রাখিয়া শরীরের উপর তাঁহাদের পবিত্র হস্ত ফিরাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়া উভয়ে এক সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তিনি কাতর ও উলঙ্গ অবস্থায় তথায় পড়িয়া রহিলেন। ভোর হইলে সেখানকার একজন লোক তাহাকে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে দেখিয়া কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এক বাড়ীতে নিয়া সেবা যত্ন দ্বারা সুস্থ করে। যৎসামান্য পানাহারে পর তিনি ঘটনা বিবৃতি করিলেন। তাহার মন অস্থির। এতগুলি পরের টাকা। ধীরে ধীরে তিনি নদী পারে আসিলেন। মাঝিগণের কোন সন্ধান পাইলেন না। কিছুদূরে গমনের পর নৌকাখানিকে ভগ্নাবস্থায় পতিত দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন মরিচগুলি একস্থানে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে জমায়েত হইয়া ভিজা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নৌকা ডুবির সংবাদ পাইয়া সন্ধান করিতে করিতে তাহার বন্ধুরাও তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলের সাহায্যে মরিচগুলি শুকাইয়া পুনঃ নৌকা বোঝাই করিলেন এবং আকিয়াব শহরে নিয়া বিক্রয় করিয়া দেখিলেন, মাত্র পঞ্চাশ টাকা তাহার আসল টাকা হইতে ঘাটতি হইয়াছে। ইহাতে তিনি গাউছে খোদা হযরত সাহেব কেবলার অপূর্ব কেরামত ও দয়া স্মরণ করিয়া পরম করুণাময়

আল্লাহতা'লার শোকরিয়া আদায় করিলেন। এবং তাহার বন্ধুবর্গের কাছে সমুদ্র বক্ষে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তিনি ধনীকে সমস্ত মূলধন ফেরত দিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। বাড়ী আসার পরদিন হযরত সাহেব কেবলার খেদমতে হাজির হইয়া কদমবুচি করিতেই হযরত নিম্ন বর্ণিত এই ফারসী কছিদাটি আবৃতি করিতে লাগিলেন :-

বদরিয়া দর মোনাফা বেশুমার আস্ত।
আগর খাহী ছালামত বরকেনার আস্ত।।

"সাগর গর্ভে বাণিজ্যে বা মুক্তা আহরণে অপরিমিত লাভ আছে। কিন্তু বিপদ আপদের আশঙ্কাও যথেষ্ট রহিয়াছে। যদি নিরাপদে থাকিতে চায়, তবে স্থল ভাগই শান্তিময় নিরাপদ স্থান।" ইহাতে মওলানা রহিম উল্লাহ সাহেব আরো দৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত তাহার ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন এবং তাঁহারই কেরামতী তছার্রোফে সাগর গর্ভের সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

একদা তাহার পীর সাহেব বিদায় কালে তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি আমার কাছে আর না আসিলে চলিবে। তুমি মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ সাহেবের খেদমতে যাইয়া তাঁহার সাহচর্য ও ছোহবত গ্রহণ করিও।" এতদিন পর তিনি তাহার পীর সাহেবের পবিত্র বাণীর রহস্য বুঝিতে পারিলেন।

আনার প্রদানে হযরতের আশ্চর্য কেরামত

নানুপুর নিবাসী জনাব মওলানা আজিমুদ্দিন সাহেব ফরহাদাবাদ মাদ্রাসায় পড়াইতেন। বন্ধ উপলক্ষে বাড়ীতে আসিলে কিফায়েত নগরে এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহার দাওয়াত হয়। সেখান হইতে হযরত সাহেবের বাড়ীর পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া মাদ্রাসায় যাইতেছিলেন, তখন হযরত সাহেব পুকুরের ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হযরতকে দেখিয়া ছাতা আড়াল দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, যাহাতে হযরত তাহাকে লক্ষ্য করিতে না পারেন। কারণ তিনি হযরতের পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় হইতেন। তিনি হযরতের বেলায়তকে পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না বরং আমেলিয়ত সাধনা বলিয়া ধারণা পোষণ করিতেন। হযরত আক্‌দাছকে পাশ কাটিয়া যাইতেই হযরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মওলানা সাহেব, একটু এদিকে আসুন তো।" অগত্যা লজ্জায় পড়িয়া তিনি হযরতের সামনে আসিলেন। তিনি হযরত সমীপে আসিয়া সালাম করিতেই যেন তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া কলব জারী হইয়া গেল। তাহার হৃদয় যেন ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেল। তিনি অতিশয় নম্র ও বিনয় সহকারে তাহার সামনে বসিয়া গেলেন। জনাব হযরত সাহেব বলিলেন, "আপনি মওলানা আবদুল করিম সাহেবের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যাইবেন?" তিনি উত্তর করিলেন হাঁ হুজুর। তাহার হাতে একটি বড় আনার দিয়া বলিলেন, "এই আনারটি তাহাকে দিবেন এবং বলিবেন, আনারটির অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে। ইহাকে যেন লেপ ঢাকা দিয়া রাখিয়া দেন।" অতঃপর হযরত তাহাদের কল্পিত ও বর্ণিত কতেক পূর্ব আলাপ অবিকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হযরত আরো

বলিলেন, "ভাই সাহেব! আমলি সাধকের সাক্ষাতে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা ভাল নহে। আপনি চলিয়া যান। মাদ্রাসার সময় হইতেছে।" মওলানা আবদুল করিম সাহেব হযরতের পরিচিত একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। সময় সময় তাহারা উভয়ের মধ্যে হযরতের বেলায়ত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হইত। মওলানা আজিমুদ্দীন সাহেব বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমরা ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছি। হযরত সহজ অলি নহেন। আমাদের ধারণা ও আলাপ আলোচনা সম্বন্ধে হযরত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন। আমরা কি কি আলোচনা করিয়াছি তাহাও বলিয়া দিলেন।" তিনি হযরতের সামনে বসাকালীন অবস্থার কথা চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিলেন। "আনারের জ্বর হইয়াছে কেমন" ইহাতে নিশ্চয় কোন রহস্য লুক্কায়িত আছে। তিনি মওলানা আবদুল করিম সাহেবের নিকট পৌছিয়া আনারটি তাহার হাতে দিয়া হযরত যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া অট্টহাসিতে বলিলেন, "ইহা আবার কেমন অসম্ভব কথা যাহার কোন মূল্য নাই। আনারকে লেপ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে, লোকে তো হাসিবেই বরং আমাকেও পাগল বলিবে। আমি এই সমস্ত মাতলামী করিতে পারিবনা ভাই।" মওলানা আজিম সাহেব বলিলেন, "আপনি উপহাস করিবেন না। ইহাতে নিশ্চয় কোন রহস্য নিহিত আছে। যাহা আমরা বুঝিতেছিনা। তিনি সাধারণ ফকীর নহেন। আমাদের ধারণা ও আলাপ আলোচনা পর্যন্ত তিনি জ্ঞাত আছেন।" তিনি উত্তর করিলেন, "আপনিও বোধ হয় তাঁহার শিকার হইয়াছেন এবং আমাকেও ফকীরি ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় আছেন।" আজিম সাহেব বলিলেন, "ভাই তাই বটে। হযরত ওমরের মতই বোধ হইতেছে।" অতঃপর তিনি মাদ্রাসায় চলিয়া গেলেন। তাহার দেহমনে যেন এক অপূর্ব অবস্থার সঞ্চার হইয়াছে। তাহার হৃদয়ের শান্তি যেন হযরত হরণ করিয়া নিয়াছেন। সেইদিন গত হইল। পরদিন তিনি মাদ্রাসায় গিয়াছেন। খবর আসিল মওলানা আবদুল করিম সাহেবের ভীষণ জ্বর অতিশার। বাঁচিবার আশা নাই। এই কথা শুনিয়া তিনি হযরতের পবিত্র বাণী স্মরণ করিলেন এবং তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন ডাক্তার বসা আছে। এবং মওলানা সাহেব বলিলেন, হযরত সাহেব যে একটি আনার আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাহা কোথায়। তিনি আনারটি আজিম সাহেবকে দিলেন। আজিম সাহেব আনারটি সম্পূর্ণ অংশ করিম সাহেবকে খাওয়াইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পড়ে তাহার অত্যন্ত ঘর্ম হইল এবং শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা প্রায় লাঘব হইয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য লাভ করিলেন। দুই জনের মধ্যে পুনরায় আলাপ আরম্ভ হইল। মওলানা সাহেব এখন হযরতের "আনার রহস্য" বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, হযরত সাহেব অন্তঃচক্ষুধারী অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন অলি আল্লাহ। তিনি আপনার রোগ সম্বন্ধে জানিতে পারিয়া আমাকে আভাস দিয়াছিলেন এবং ঔষধ স্বরূপ তাঁহার কেরামতী প্রভাবান্বিত আনারটি পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাব জনিত রহস্যপূর্ণ কালাম বুঝা বড়ই কঠিন! এখন মওলানা আজিমুদ্দিন সাহেব আনারের লেপঢাকা রহস্য ও হযরতের কেরামত প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিলেন এবং হযরতের বেলায়তের উপর তাহাদের পূর্ণ আস্থা হইল। কিছুদিন পর তাহারা উভয়েই

এক সাথে হযরতের খেদমতে আসিয়া তাঁহার শিষ্য এবং ভক্তে গণ্য হইয়া গেলেন এবং পূর্ব ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। তাহারা সব সময় হযরতের গুণাবলী ও কেরামত ক্ষমতা সম্বন্ধে লোক সমাজে প্রচার করিতেন। এইভাবে হযরত দুইজন বিশিষ্ট মনকের আলেমকে এক তীরে শিকার করিয়া নিজ আশেকে গণ্য করিয়া লইলেন এবং খোদাতা'লার প্রেমপ্রেরণা ও ফয়েজ প্রদানে তাঁহার নৈকট্যে আগাইয়া দিলেন।

মসজিদে হযরতকে নুরানী-জ্যোতির্ময় দেখা

হযরত সাহেব কেবলার এক ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ নুরুল হক মিঞাকে নানুপুর নিবাসী মওলানা সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেবের জ্যৈষ্ঠাকন্যা বিবাহ করাইয়াছিলেন। একদিন তিনি হযরত সাহেব কেব্‌লার বাড়ী হইতে রাত্রিকালে তাহার ছেলে আবদুল বারী সহ নিজ বাড়ীর প্রতি রওয়ানা হইলেন। দরবার শরীফ সম্মুখস্থ মসজিদ অতিক্রম করিতেই তাহার ছেলে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা মসজিদে আগুন লাগিয়াছে। তিনি মসজিদের প্রতি তাকাইলেন। দেখিলেন, আগুন তো নয় বরং এক অপূর্ব অলৌকিক জ্যোতিঃলহরী-আকাশ হইতে মসজিদ ভেদ করিয়া হযরত আক্‌দাছের দেহমোবারকে পতিত হইয়াছে। এবং হযরত মসজিদে তন্ময় বিভোর মোরাকাবায় রহিয়াছেন। ছেলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা উহা কি?" তিনি চুপে চুপে বলিলেন, "এখন চুপ থাক পরে বলিব।" তিনি দরজায় আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া নিলেন। অন্য কেহ নহে, হযরতই উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে হযরতের চেহারা মোবারক এক অপূর্ব বিস্ময়কর শোভাধারণ করিয়াছে। হযরত উহাতে যেন মিশিয়া রহিয়াছেন। তিনি অতি সন্তর্পনে তথা হইতে সরিয়া গেলেন। তাহারা বাড়ীর পথ ধরিলেন। ছেলে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, উহা কি! ছেলে বুঝিবে না চিন্তা করিয়া তিনি সংক্ষেপে উত্তর করিলেন। "বাবা, উহা হযরতের কেরামতি জ্যোতিঃ!" তিনি মহা ভাবনায় পড়িলেন এবং স্থির করিলেন যে, উহা তাঁহার বেলায়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সকালে তিনি হযরতের দরবারে আসিয়া কদমবুচি করিলেন এবং তাঁহার হাতে দস্তবায়াত গ্রহণান্তে শিষ্যত্ব বরণ ও খোদাতা'লার অনুগ্রহ কণা ফয়েজ অর্জন করিলেন। তিনি প্রায়ই হযরতের এই অপূর্ব কেরামতি জ্যোতিঃ ও পরিচয় সম্বন্ধে জন সমাজে আলাপ করিতেন।

হযরতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা সর্বাঙ্গ আলোড়নে ফয়েজ জারী

আমবাড়ীয়া নিবাসী মওলানা আবদুল জলিল সাহেব অতি প্রসিদ্ধ ধর্মভীরু ও মোত্তাকী আলেম ছিলেন। তিনি হযরতের ভক্ত অনুরক্তদের সম্বন্ধে অনেক বিরূপ ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন আলাপ আলোচনা শুনিয়া এবং তিনি নিজেও হযরতের ভক্তদের নানা

সমালোচনা করিতেন। একদিন তিনি হযরতের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বিনাজুরী খালের ধার দিয়া দাওয়াতে যাইতেছিলেন। তিনি জোহর নামাজ পড়িয়া রওয়ানা হইয়াছেন। দেখিতে পাইলেন হযরত সাহেব কেবলা অনেক লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বিনাজুরী খালের পারে বসিয়া আছেন। হযরত তাহাকে দেখিতে না পায় মত ছাতা ধরিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন। হযরত হঠাৎ দীপ্তকণ্ঠে তাহাকে ডাক দিলেন- "মওলানা সাহেব কোথায় চলিয়াছেন? একটু এইদিকে আসুন তো!" ইহা শুনিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। তাহার মনে হইল, কি এক মহাশক্তি তাহাকে যেন হযরতের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। তিনি হযরত সমীপে উপস্থিত হইয়া সালাম করিয়া খোলা মাঠে বসিয়া পড়িলেন! হযরত তাহার সঙ্গে অতি মৃদুস্বরে নামাজ আদায় ও কা'বায়ে হাকিকী সম্বন্ধে রহস্যপূর্ণ আলাপ করিতে করিতে তাহার উপর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাহার সমস্ত শরীর ও কলব আলোড়িত হইয়া গেল। তাহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব প্রেরণাধিক্য দেখা দিল। ইহাতে তিনি তন্ময় ও বিহ্বল অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। তাহার সমস্ত লতিফাতে যেন বিদ্যুৎবত ক্রিয়া আরম্ভ হইল। বেলা প্রায় শেষ হইয়া যাইতেছে। আছরের নামাজের সময় গত প্রায়। সূর্য অস্তমিত হইতে চলিয়াছে। হযরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মওলানা সাহেব উঠুন। আছরের নামাজের সময় চলিয়া যাইতেছে।" ইহাতে তার চৈতন্য আসিল। তিনি সেখানেই নামাজ সমাধা করিয়া নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হযরতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আর দাওয়াতে গেলেন না। ইহাতে তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, হযরত একজন অতি ক্ষমতা সম্পন্ন অলি আল্লাহ। এরপর তিনি ভক্তদের সম্বন্ধে কখনও সমালোচনা করিলেও হযরতের বেলায়ত ও কেরামত সম্বন্ধে প্রশংসা ও প্রচার করিতেন। এই ভাবে বহু বীর মোজাহিদ ও আলেম হযরতের দরবারে আসিয়া তাঁহার গাউছিয়তে ও বেলায়তে বিশ্বাসী ও ভক্ত হইয়া তাঁহার প্রচার ভার ও খেলাফতের আসন গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে লাগিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নযোগে হযরতের বেলায়তের পরিচয়

সাবরেজিষ্ট্রার জনাব মওলানা সৈয়দ ফররোখ আহমদ সাহেব হযরতের একজন অন্যতম প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি প্রথমে স্কুল ইনসপেক্টর হিসাবে কাজ করিতেন। তিনি অনেক পীর আউলিয়াদের দরবারে যাইতেন। উপযুক্ত কামেল পীর পাইলে তাঁহার দাসত্ব বরণে আল্লাহতা'লার উপাসনা ও এবাদত করিতেন, ইহাই তাহার মনে একমাত্র অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কোথাও কামেল পীরের সন্ধান ও পরিচয় পাইলেন না। একদা তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পান, তাহার পরলোকগত পিতা মুন্সেফ সৈয়দ আমিন উদ্দীন সাহেব, যিনি হযরতের কামালিয়ত বিকাশের প্রথম অবস্থায় পরলোক গমন করিয়া জান্নাতবাসী হইয়াছেন, তিনি তাহাকে বলিতেছেন, "বৎস! এত চিন্তিত আছ কেন? তিনি বলিলেন, "বাবা উপযুক্ত ও মনেরমত পীরের অভাবে।" উত্তর পাইলেন, "বাবা প্রদীপের নীচে সাধারণতঃ অন্ধকার থাকে। "লড়কে গোদমে আওর ঢেন্ডেরা শহরমে।" কোলে সন্তান রাখিয়া শহরে ঢোল শোহরত করা! এই স্বপ্নের পর অতি চিন্তায় ঠিক করিলেন, বর্তমানে যাঁহার প্রশংসা শুনা যাইতেছে বোধহয় হযরতই এই প্রদীপ হইবেন। কারণ তিনি বাড়ীর নিকটে। অতএব একদিন তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত তাহাকে দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পড়িতেছিলেন:-

কশিশে কে এস্ক দারম ন গোজারমত বঁদিছা।
ব জানাজা গর না আয়ি ব মাজার খাহী আমদ।।

হযরতের এই ফারসী বায়াত পাঠ শ্রবণে তাহার মন ভক্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, "কেউ রোতে হো? তোম্‌তো হামারে বাগকা গোলে গোলাপ হো" অতঃপর তাহার প্রতি শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ তাওয়াজ্জো প্রদানে ফয়েজ বর্ষণ করিলেন। ইহাতে তাহার এক অপূর্ব এবং বিষ্ময়কর অবস্থার সঞ্চার হইল। তিনি শান্তভাবাপন্ন হইয়া হযরতের শিষ্যত্ব ও ভক্তশ্রেণীতে দাখিল হইয়া গেলেন। তিনি হযরতের সহিত দেখা না করিলে তাঁহার দর্শন না পাইলে আর শান্তি পাইতেন না। তিনি মনস্থ করিলেন চাকুরিতে থাকিয়া তাঁহার খেদমতে যাওয়া আসা অতি দুষ্কর। সুতরাং চাকুরী ছাড়িয়া দিলে সবসময় হযরতের খেদমতে থাকিতে পারিবেন। তাই একদিন তাঁহার খেদমতে আরজি পেশ করিলেন, "হুজুর! এত দূরদেশে থাকিয়া

হুজুরের খেদমতে আসা যায় না। আমি হুজুরের খেদমতে থাকিতে চাই। তাই চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। এখন হুজুরের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।" উত্তরে হযরত বলিলেন, "নেহি! নেহি তোম নকড়ি মত ছোড়। হামনে তোমকো এক কুরছি এনায়েত কিয়া হ্যায় তোম ফেরেস্তা বন্‌কে আপনে মোকাম পর বৈট রাহোগে।" তিনি হযরতের পবিত্র কালাম বুঝিতে পারিলেন না। তোমাকে চেয়ার দান করিয়াছি। তুমি নিজ মোকামে বসিয়া থাকিবে। ইহার প্রকৃত তথ্য তাহার হৃদয়ঙ্গম হইলনা। কিছুদিন পর তিনি সাবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়া বাড়ী হইতে তিন মাইল দূরে মুহাম্মদ তকীর হাট অফিস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন কাজ করার পর অফিস তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া তাহার বাড়ীর সামনে আসিল। সেখানে নিজ বাড়ীতে থাকিয়া তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল অতি সম্মানের সহিত সাবরেজিষ্ট্রারী কার্য সমাধা করেন। তিনি এখন সব সময় হযরতের খেদমতে আসিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিতে থাকেন। এখন তিনি হযরতের রহস্যপূর্ণ কালামের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেন।

স্বপ্নযোগে হযরতের বাতেনী এলেম শিক্ষাদান

পটিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চননগর নিবাসী জনাব মওলানা নুরচ্ছফা সাহেব মির্জাখিল অধিবাসী পীর জনাব মওলানা আবদুল হাই সাহেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি তাহার পীর সাহেবের নিকট তরিকতী আধ্যাত্মিক এলম সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে শুধু কেতাবী কথাই বলিতেন এবং কেতাবই দেখাইয়া দিতেন। তিনি হাকিকত অনুসন্ধানী ছিলেন। এই সমস্ত আলাপে এবং কেতাব দর্শনে তাহার তৃপ্তি হইতনা। স্বপ্ন বশারতযোগে বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় কোন প্রকার খোদাদাদ এলমে লদুনীর সন্ধান না পাইয়া তিনি বড়ই চিন্তিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে একদিন তাহার পীর সাহেবের খেদমতে পবিত্র কোরানের আয়াত শরীফ "মন কানা ফিদ্দুনিয়া আ'মা ফাহুয়া ফিল আখেরাতে আ'মা" এর সারবস্তু ও মূল রহস্য জানিতে চাহিলে তাহার পীর তাহাকে পূর্বাবৎ কেতাবের প্রতিই নির্দেশ দিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। বহুদিন হয় তিনি মুরিদ হইয়াছেন। অথচ কোন প্রকার প্রেরণা তাহার হৃদয়ে আসিতেছে না। শুধু এবাদত বন্দেগীতে রত রহিয়াছেন। পীরের ফয়েজ এল্‌কা ও এল্‌হাম ইত্যাদি খোদা প্রেরণা নেয়ামত হইতে একেবারেই বঞ্চিত রহিয়াছে। মনে মনে ভাবিলেন, উপযুক্ত পীর মনে করিয়া তাহার হাতে বায়াত গ্রহণ করিলাম। এখন উপায় কি! অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থী হইয়া কান্না মিনতি করিতে লাগিলেন। একরাতে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) তাহাকে একখানা বড় কেতাব পড়াইতেছেন এবং প্রত্যেক স্তরে স্তরে বাতেনী রহস্যাবলীর ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছেন। স্বপ্নে তাহার জজ্‌ব প্রেরণা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি পরিচয় চাহিলেন, হুজুর আপনি কে? কোথায় আপনাকে পাইব। তিনি উত্তরে মাইজভাণ্ডারী বলিয়া পরিচয় দিতেই তাহার স্বপ্ননিদ্রা ছুটিয়া গেল,

তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার তো পীর আছে। আবার মাইজভাণ্ডার কেমন করিয়া যাইবেন। ইহার পর ছয়মাস গত হইল। আর এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তিনি এমন দরবারে আসিয়াছেন, উহা তিনি চিনিতেছেন না। সকলে বলাবলি করিতেছেন, ইহা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহাকে মাইজভাণ্ডার যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহা বোধ হয় আল্লাহতা'লার প্রতি তাহার প্রার্থনার প্রতি উত্তর। ইতিপূর্বে হযরতের খাদেম মওলানা আহমদ ছফার সহিত তাহার পীরের ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে কয়েকবার তাহার তর্ক হইয়াছিল। তিনি নিজ ভুলকে ঢাকা দিয়া জানিবার উদ্দেশ্যে তর্ক করিতেন। কিছুদিন পর তিনি হযরতের উক্ত খাদেম মওলানা আহমদ ছাফার সহিত দরবার শরীফ আসেন। তিনি হযরতের হালচাল ও গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু হযরতকে দেখিয়া প্রথমে তাহার ভক্তি জন্মিল না। কারণ তাহার পীর সাহেব অতি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এবং সুন্দর ছিলেন। হযরত কিন্তু তাহার মত নহেন। তিনি ভাবনায় পড়িলেন। একদিন পর তিনি হযরতের খেদমতে গেলেন। তাহাকে দেখিয়াই হযরত "তাব্বাত্ ইয়াদা আবিলাহাবেও ওয়াতাব্" আয়াতটি পড়িতে লাগিলেন। আবু লাহাব হযরত রসুলে করিম (সঃ) এঁর উপর ঈমান আনে নাই বলিয়াই কাফের। এই কথা হযরত কেন পড়িতেছেন এবং কাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া পড়িতেছেন। তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সেই সময় হযরতের অন্যতম প্রিয় খলিফা জনাব কাজী আছাদ আলী সাহেব হযরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মওলানা নূরচ্ছফাকে বলিলেন, আপনাকেই বোধ হয় হযরত এই কালাম বলিতেছেন। আপনি বোধ হয় হযরতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস আনেন নাই আপনার কোন কাজ হইবে না আপনি চলিয়া যান। তখন তাহার চৈতন্য উদয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, হযরত অন্তঃচক্ষুধারী ক্ষমতা সম্পন্ন। না হয় তো কিরূপে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। তাহার ভয় হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া অজু করিলেন এবং তাওবা পড়িয়া অন্তরে ক্ষমা চাহিয়া পুনরায় হযরতের খেদমতে গেলেন এবং কদমবুছি করিলেন। হযরত বলিয়া উঠিলেন, আপনি কি চাহেন? তিনি উত্তর করিলেন, হুজুর আমি এলম চাহি। হযরত তাহাকে নির্দেশ দিলেন-"কোরাণ পাঠ করিয়া পরে আমপাড়া পড়িবেন।" এই কালাম রহস্য-তাহার বুঝে আসিলনা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কোরান পাঠে কি করিয়া এলেম অর্জন হইবে এবং পরে আমপাড়া পাঠের রহস্যই বা কি! তিনি কাজী সাহেবকে উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। কাজী সাহেব বলিলেন, আমপাড়া তেলাওয়াত করার অর্থ দরূদযুক্ত অজিফা পাঠ করা। ইহা সুফীদের একটি এছতেলাহী প্রচলিত ভাষা। তিনি হযরতের খেদমতে কিছুক্ষণ বসার পর তাহার কলব ও শরীর যেন প্রেরণায় কম্পিত হইতে লাগিল। হযরত তাহাকে বিদায় দিয়া বাড়ী যাইতে আদেশ দিলেন। তিনি হযরতের নির্দেশ মত বাড়ী যাইয়া রীতিমত কোরাণ ও অজিফা পাঠে লিপ্ত হইলেন। দিন দিন তাহার জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান খুলিতে লাগিল। এখন তিনি সময় মত এল্‌কা এল্‌হাম বা স্বপ্নযোগে নানা তথ্যের সন্ধান পাইতে লাগিলেন। কোরাণ পাঠে ও এবাদত বন্দেগীতে তাহার হৃদয়ে খোদাতায়ালার প্রেম-প্রেরণা বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে ও বিভোর চিত্তে খোদার বন্দেগী

করিতে পারিতেছেন। তাহার মনে যেন সান্তনার উদয় হইল। কিছুদিন পর তিনি আবার হযরতের খেদমতে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্বে দাখিল হইলেন এবং মির্জাখিল যাওয়া বন্ধ করিলেন। তিনি হযরতের ফয়েজ রহমত অর্জনে শেষ পর্যন্ত একজন অন্যতম কামেল খলিফারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি বহু তত্বপূর্ণগান গজল লিখিয়া গিয়াছেন।

বেলায়তী ক্ষমতায় রোগ মুক্তিতে হযরতের পরিচয়

চট্টগ্রাম কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল জনাব মওলানা বদরুল হক খান বি এল সাহেবের পিতা-জনাব কাজী মওলানা মনওয়ার আলী খাঁ সাহেব অতি প্রতিপত্তিশালী সুখ্যাত লোক ছিলেন। কাজী সাহেব প্রথমাবস্থায় দরবার শরীফের ঘোর বিরোধী ছিলেন। লিখাপড়ায় ও কথাবার্তায় যাহাকে যেইখানে পাইতেন, দরবার শরীফের বিরুদ্ধে বলিতেন। দরবার শরীফ আসিলে শরীয়ত অনুযায়ী গুনাহগার হইবে বলিয়া প্রকাশ করিতেন। মুশরেক এবং বেদায়াতী হইবে, তাহাদের ঈমান থাকিবে না ইত্যাদি কথা বলিয়া জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়া বেড়াইতেন।

এইভাবে তিনি আল্লাহতা'লার মাহবুবের বিরুদ্ধাচারণে রত হইলেন। আল্লাহতা'লা যাহাকে ইচ্ছা করেন, হযরত ওমরের মত যে কোন কৌশলে বা পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহাকে আল্লাহ্র প্রতি ফিরাইয়া আনেন এবং তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দেন।

আল্লাহতা'য়ালা তাহার উপর এমন এক বিমার চাপাইয়া দিলেন, যাহাতে তিনি আল্লাহতা'য়ালার অলিদের আশ্রয়ে আসিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হন। খোদাতা'লার কৌশলে ক্রমে তাহার পিঠের উপর ভয়ানক এক পিষ্টক ঘা হইল। উহা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বহু ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসা চলিল কিন্তু কোন ফল হইল না।

একদিন তিনি চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের সিভিল সার্জন সাহেবের নিকট গেলেন। তিনি তাহাকে ভালরূপে দেখিয়া বলিয়া দিলেন তাহার এই রোগ আরোগ্য হইবার নহে। বর্তমানে অপারেশন ছাড়া ইহার কোন গতি নাই। অপারেশন করিলেও জীবনের আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় ইচ্ছা করিলে নিজ দায়িত্বে অপারেশন করাইতে পারেন, এই কথা শুনিয়া তিনি জীবনের আশায় একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। অপারেশন করিলে হয়তো অতি সহসা মারা যাইবেন। এই ভয়ে অপারেশন করাইতে রাজী হইলেন না। দরবারে পাকের সুপ্রসিদ্ধ খলিফা আহল্লা মৌজার জনাব হযরত কাজী আছাদ আলী সাহেব তাহার আত্মীয় হন। রোগ শয্যায় তিনি হযরত কাজী আছাদ আলী সাহেবের দোয়া চাহিলে তিনি বলিলেন, "নিরাশ হইবেন না। আল্লাহতা'য়ালা নিতান্ত ক্ষমতাশালী ও দয়াবান। তিনি ইচ্ছা করিলে মৃতকেও জীবন দান করিতে পারেন। আল্লাহতা'লার ক্ষমতা প্রাপ্ত কতেক ডাক্তার আছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন। হয়তো আপনি এমন কোন আচরণ করিয়াছেন; যাহাতে আল্লাহতা'য়ালা নারাজ হইয়াছেন। এমতাবস্থায় আপনি কোন একজন "তবিবে হাজেক" অলি আল্লাহ্র আশ্রয়ে

আত্মসমর্পণে খোদাতা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রার্থনা জানান। ইহাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয় আপনাকে আরোগ্য দান করিবেন।"

কাজী সাহেব বলিলেন, এইরূপ কামেল অলি আল্লাহ কোথায় পাইব। সন্ধান পাইলে নিশ্চয় আশ্রিত হইব। জনাব কাজী আছাদ আলী সাহেব বলিলেন, "চলুন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হযরত সাহেব কেবলার কাছে যাই। আমার বিশ্বাস তিনি দোয়া করিলে আপনি অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করিবেন। তিনি অতি উচ্চ ক্ষমতাবান পাপীতাপীর মুক্তিদাতা "গাউছুল আজম।" কাজী সাহেব জীবনের আশায় অগত্যা রাজী হইলেন। কয়েকদিন পর তাহারা উভয়ে দরবার শরীফ আসিয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। কাজী আছাদ আলী সাহেব, হযরতের একজন অন্যতম ভক্ত। তিনি তাহাকে হযরতের সামনে হাজির করিয়া আরজ করিলেন, "হুজুর ইনি সমস্ত চিকিৎসায় বিফল হইয়া হতাশ হৃদয়ে আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছেন। এখন আপনার দোয়া ও দয়া চাহেন।" ইহাতে হযরত তাহাকে আদেশ দিলেন, "মিঞা! কিছু গোলমরিচ পিসিয়া গরম কর এবং উহাতে লাগাইয়া দাও।"

কাজী সাহেব হযরতের নির্দেশ মত কিছু গোল মরিচ পিসাইয়া গরম করিলেন এবং পিঠের ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলেন। প্রথম বারেই ক্ষত ফাটিয়া আরোগ্যের পথে আগাইয়া চলিল। ইহার পর আরো উক্ত ঔষধ লাগাইবার পর যন্ত্রণা সম্পূর্ণ লাঘব হইয়া ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেল। হযরতের এই অপূর্ব খোদাদাদ চিকিৎসা শক্তি দেখিয়া কাজী মনওয়ার আলী খাঁ সাহেব হযরতের একজন ভক্ত হইয়া গেলেন।

হযরতের পদমর্যাদা ও কশ্‌ফ শক্তির পরিচয়

পটিয়া থানার অন্তর্গত সাতবাড়ীয়া গ্রাম নিবাসী হাজী মওলানা আবদুর রশিদ সাহেব হযরতের আশেক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ছুফী হিসাবে লোক সমাজে সুপরিচিত ছিলেন।

ফরহাদাবাদ নিবাসী মওলানা নূরবক্‌স সাহেব সে সময়ে মোহছেনিয়া মাদ্রাসায় পড়াইতেন। তিনি উক্ত মওলানা আবদুর রশিদ সাহেবকে ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হযরতের ওফাতের পূর্বে একদা তিনি মাদ্রাসায় পড়াইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মিঞা তোমরা তো প্রায় সকলেই হযরত মওলানা শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ সাহেবের খেদমতে যাও। তিনি একজন জবরদস্ত অলি আল্লাহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু "মজজুব" ও নামাজের পায়বন্দনহেন বলিয়া ভয়ে তাঁহার খেদমতে গেলাম না। কারণ আমিতো কাজের লোক। তাঁহাদের দৃষ্টিতে আবার কোন অবস্থাই না হইয়া যায়, তাই খুব ভয় করিতেছি।"

আবদুর রশিদ সাহেব উত্তরে তাহাকে বলিলেন, "হুজুর! মানুষের নানা কথায় কান না দিয়া একবার নিজে যাইয়া দেখিতেন; তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন। আমার তো

মনে হয়, তিনি মজজুব নহেন। তাঁহার মত অলি আল্লাহ বর্তমান যুগে আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয় আপনি নিজে একবার গেলে ভাল হইত।"

কিছুদিন পর, ছুটি উপলক্ষে মওলানা নূর বক্স সাহেব হযরতের খেদমতে আসিলেন। হযরত সেই সময় দায়েরা শরীফে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হযরতের সামনে আসিয়া আচ্ছালামু আলাইকুম বলার সাথে সাথেই হযরত সালামের উত্তর দিয়া বলিতে লাগিলেন "মিঞা! মজজুব কে পাছ কেঁউ আয়া? মিঞা! মজজুবকে পাছ কেঁউ আয়া? মাইতো মজজুবে মাহাজ নেহি হোঁ! মজজুবে ছালেক হোঁ। বায়তুল মোকাদ্দছ মে নামাজ পড়তা হোঁ!" এই কালাম শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি সেখানে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর আদবের খাতিরে সেখান হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তিনি অত্যন্ত বিষ্মিত হইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহাতে তিনি হযরতের বেলায়ত পদমর্যাদা "মজজুবে ছালেক" বেলায়তের সর্বোচ্চ মোকাম বলিয়া অভিহিত হইলেন। তিনি হযরতের দরবার হইতে যাওয়ার পরে, তাহার খোদা প্রেরণা শক্তি এমনভাবে বাড়িয়া গেল যে, তিনি কোরান তেলাওয়াত ও নামাজ প্রেম বিভোর চিত্তে হুজুরী কলবের সহিত পড়িতে পারিতেন। তিনি নিজেই এই ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সর্বদা ইহা প্রচার করিতেন।

হযরতের ফয়েজ এর্শাদ ও পরিচয়

জনাব মওলানা আবদুর রহমান সাহেবের প্রতি রহস্যময়বাণী ও ফয়েজ এর্শাদ

রাউজান থানার অন্তর্গত সত্তাকুল নিবাসী জনাব মওলানা আবদুর রহমান সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি হযরতের ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি ও মওলানা রহিম উল্লাহ সাহেব প্রায় সময় হযরতের খেদমতে আসিতেন। হযরত সাহেব কেবলা একদিন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কি মুহাম্মদ তকীর হাট চিন"? তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ হুজুর চিনি।" হযরত নির্দেশ করিলেন, কোহতুরের কিনারায় বসিয়া সওদাগরী কর।"

তিনি বাড়ী গিয়া অনেক চেষ্টায় মাত্র বাইশটি টাকা সংগ্রহ করিয়া পরদিন ভোরে শহরে চলিয়া গেলেন। তিনি বাইশ টাকার মনোহারী মাল খরিদ করিয়া বাড়ী আসিলেন। তাহার পরদিন মুহাম্মদ তকীর হাটে ব্যবসা করিতে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার দোকান খালি হইয়া গেল। মাল আর দিতে পারিতেছেন না। বাড়ীতে আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন বাইশ টাকার মাল ছিয়াত্তর টাকা বিক্রয় হইয়াছে।

তাহার পরের দিন পুনরায় শহরে গেলেন। প্রতি কিস্তিতে-পঞ্চাশ টাকা শোধ করিবার চুক্তিতে এইবার একশত বিশ টাকার মাল লইয়া বাড়ী আসিলেন। শহর হইতে হযরতের জন্য একখানা অতি সুন্দর আয়নাও খরিদ করিয়া আনিয়াছেন। পরদিন আয়না হাতে হযরতের খেদমতে হাজির হইলেন। কমদবুচি করিয়া আয়নাখানি হযরতের

সামনে পেশ করিয়া আরজ করিলেন, "হুজুর আপনার আদেশ মত মুহাম্মদ তকীর হাটে কতেক মাল বিক্রয় করিয়া আমি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছি।" ইহা শ্রবণে হযরত অত্যন্ত জালাল হইয়া গেলেন! আয়নাখানি সজোরে দুরে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন' "কেছ্নে বোলা তোমকো মুহাম্মদ তকীরহাট মে সওদা করো! তোম হামারে বাজার মে সওদা মত করো।" তারপর হযরতের বাম পার্শ্বে রক্ষিত লাঠিটি লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। ইহাতে তাহার মনে ভয়ানক চিন্তা আসিয়া গেল। কি কারণে বিপরীত হইল, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না। তবুও অতি চিন্তিত মনে বাজার তারিখে মাল লইয়া বাজারে বসিলেন। বাজার পূর্ণ মানুষ কিন্তু এক পয়সাও বিক্রয় নাই। পরদিন অতি ছোট মনে মালগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য শহরে চলিয়া গেলেন। বাজারের অবস্থা বলিয়া মহাজনকে মালগুলি ফেরত দিলেন। পরে তিনি হযরতের খেদমতে আসিয়া দেখিলেন, হযরত আন্দর বাড়ীর প্রাঙ্গণে একখানা চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন এবং ভক্ত মন্ডলী তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি পতঙ্গের মত কাঁপিয়া হযরতের চরনযুগল জড়াইয়া ধরিয়া লুটাইয়া পড়িলেন এবং নয়ন জলে তাঁহার রাতুল চরণ সিক্ত করিয়া দিলেন। হযরত লাঠি দিয়া সজোরে কয়েকটি প্রহার করিলেন। এবং পা মোবারক তাহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ গোলাম ছোবহান প্রঃ চুন্ন মিঞা তথায় উপস্থিত ছিলেন। হযরত তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "চুন্ন মিঞা, ইহাকে উঠাইয়া লও তো!" তখন চুন্নমিঞা অতি কষ্টে তাহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। সকলে তাহাকে সান্তনা দিতে লাগিলেন। তবুও তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষস্থল ভিজাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। হযরত সরবত তৈয়ার করিয়া উপস্থিত সকলকে সরবৎ দান করিলেন, তাহাকে হযরত নিজ হস্তে কিছু সরবত পান করাইয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন, "তোম ময়মনসিংহ মে ছায়ের করো!" ইহাতে তাহার মনে পুনঃ নব আশার সঞ্চার হইল। সেইদিন সন্ধায় তিনি ময়মনসিংহ এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর রাত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি পথচলা বন্ধ করিলেন না। তাহার মনে নূতন আশা,-নূতন প্রেরণা,-তিনি দ্রুতগতিতে পথ চলিতে লাগিলেন। সারা রাত পথ চলার পর তিনি এক প্রকার কাতর হইয়া পড়িলেন। নেজামপুর এক বাড়ীতে মোছাফের হইলেন, তথায় তিনি তিন দিন রহিলেন। ইহার মধ্যে একদিন সেই বাড়ীতে এক শিশু সন্তানের মাতৃরোগ হয়। তাহারা ডাক্তারের খোঁজে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। তাহাদের বিপদে তিনিও অধির হইলেন। গৃহস্বামী তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন আল্লাহ্‌র নাম লইয়া শিশুটি একটু দেখেন। তিনি যাইয়া হযরতের নাম লইয়া সাধারণভাবে দোয়া পড়িতেই শিশু আরোগ্য লাভ করিল। তাহারা অত্যন্ত খুশী হইয়া ভক্তি সহকারে তাহাকে সতরটি টাকা দান করিলেন। অতঃপর সেখান হইতে বিদায় গ্রহণান্তে পথ চলিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি আবার ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এবং কুমিল্লা জেলার সরাইল নামক গ্রামের এক বাড়ীতে মোছাফের হইলেন।

খোদার মর্জিতে সেখানেও তাহার কাজ জুটিয়া গেল। সেখানে বাড়ীওয়ালী প্রসব বেদনায় ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া তাহার নিকট

তাবিজ চাহিলেন। তিনি তাবিজ দেওয়ার সাথে সাথে বাড়ী ওয়ালীর সন্তান প্রসব হইয়া যায়। বাড়ীর মালিক তাহাকে অতি যত্নে আরো কয়েকদিন রাখিয়া পরে ময়মনসিংহ পৌছাইয়া দেয়। তথায় তিনি মসজিদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় তাহার জজ্‌বাতী হাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার অবস্থা দর্শনে লোকজন তাহার ভক্ত হইতে আরম্ভ করিল এবং তাহার নিকট তাবিজ দোয়া চাইতে লাগিল। তাহার এমন সৌভাগ্য যে, হযরতের শুভদৃষ্টিতে তিনি যাহাকে যাহা প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহাতেই সুফল ফলিতে আরম্ভ হইল। তাহার নিকট নানা প্রকার হাজতি লোকের ভীড় দেখিয়া মসজিদের মোতওয়াল্লী সাহেব তাহাকে তাহার বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন! তাহার নিকট বহু টাকা পয়সা আসিতে লাগিল। মোতওয়াল্লী সাহেব তাহার টাকা পয়সার হেফাজত করিতেন এবং নিজ হাতেই তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যে "পাগল মওলানা সাহেব" নামে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যেকে অগাধ ভক্তি বিশ্বাস করিতে লাগিল। তিনি প্রায় সময় প্রেরণায় বিভোর থাকায় নামাজ রোজা করিতে পারিতেন না। এতদ্‌ শ্রবণে মওলানা জামাল উদ্দিন নামক এক সুপ্রসিদ্ধ স্থানীয় আলেম তাহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তথায় তাহার এক বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। একদিন বহু লোকের সঙ্গে মওলানা জামাল উদ্দিন আসিতেছেন জানিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে করিলেন, মওলানা সাহেব হয়ত সদলবলে তাহার সঙ্গে নামাজ সংক্রান্ত বিষয়ে বাহাছ করিতে আসিতেছেন।

তিনি ধ্যানে বসিয়া হযরতের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, হযরত তাহার সামনে হাজির এবং তাহাকে বলিতেছেন, "মিঞা আবদুর রহমান! তোম মৎ ঘবড়াও। জামাল উদ্দিন কেয়া করেগা। তোম হামারা লড়কা হ্যায়, হাম তোমারে সাথ হ্যায়।" ইহাতে তিনি চক্ষু খুলিলেন। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া জারি হইয়া গেল :

আহলে দুনিয়া কাফেরানে মতলা কান্দ
রোজ ও শব দর বক্‌ বক্‌ ও দর জক্‌ জকন্দ।।

"দুনিয়াদার লোক নিশ্চয় কাফের। তাহারা দিবারাত্র বকাবকি করিয়াই সময় কাটায়" ঠিক সেই সময় মওলানা জামাল উদ্দিন সাহেব তাহার বাসার দরজায় উপস্থিত। তিনি এই শেয়েরটি তাহার মুখে শুনিয়া এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে তাহার সঙ্গীদের বলিলেন। "তোমরা সব চলিয়া যাও। এতগুলি লোক আমার পিছনে কেন আসিয়াছ। মওলানার লড়াই দেখিতে নাকি। সবাই ফিরিয়া যাও। এইরূপ লোকের প্রতি শরিয়তের আইন প্রয়োজ্য নহে। এই ব্যক্তি নিশ্চয় এমন কোন বাদশার গোলাম, যাহার কোন তুলনা হইতে পারেনা। আমার মনে হয় ইনি একজন উচ্চদরের আউলিয়ার প্রতিনিধি। তোমরা সবাই আদবের সাথে ফিরিয়া যাও।" মওলানা জামাল উদ্দিন সাহেব তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। মওলানা সাহেব চৌকিতে না বসিয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্বক নতজানু হইয়া তাহার সামনে মাটিতে বসিয়া গেলেন।

তিনি কিছুক্ষণ তাহার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! আমাকে এক হাকিম মারার অপরাধে মানহানী ও অনধিকার প্রবেশ মোকদ্দমায় জড়িত করিয়া আসামী করিয়াছে। আমার জন্য একটু দোয়া করুন।

হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "তোম্‌কো খালাস দিয়া তোম্ খালাস হ্যায়।" অতঃপর তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পর মোকদ্দমার তারিখ পড়িল। দেখিলেন, মওলানা জামালুদ্দিন ছাহেবকে মোকদ্দমায় বেকুসুর খালাস দিয়াছেন। ইহাতে মওলানা সাহেবের ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি অতি আনন্দিত মনে তাহার এক শিষ্যসহ পুনরায় তাহার খেদমতে আসিয়া তাহাকে দশটি টাকা উপহার দিয়া বলিলেন "হুজুর! আপনার দোয়ায় আমি বেকসুর খালাস পাইয়াছি। তাই সংবাদ দিতে আপনার খেদমতে আসিয়াছি।" মওলানা সাহেব চলিয়া গেলেন। মওলানা আবদুর রহমান সাহেব হযরতের অপূর্ব ক্ষমতা ও দয়াদৃষ্টি প্রত্যক্ষ দর্শনে কাতরভাবে সেজদায় পড়িয়া আল্লাহতা'লার শোকরিয়া আদায় করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মওলানা কাঞ্চনপুরীর প্রতি ফয়েজ এর্শাদ ও অপূর্ব বাণী

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর নিবাসী মওলানা আবদুল আজিজ সাহেব হযরত সাহেব কেব্‌লার ভক্ত অনুরক্ত খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি হযরতের ফয়েজ ও কৃপাকণা হাছিল করিয়া একজন খ্যাতনামা বুজুর্গ হিসাবে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু সংখ্যক শিষ্য ও ভক্ত আছেন, যাহারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে উন্নত ও হৃদয়ালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জনাব মওলানা আবদুল আজিজ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম বার তিনি যখন হযরতের খেদমতে আসেন, হযরত তখন আন্দর হুজুরায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় শায়িত ছিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, যেন শুধু একখানা চাদর বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বার বার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন; হযরত বিছানায় নাই। খালি একখানা চাদরই দেখা যাইতেছে। হঠাৎ দেখিলেন, হযরত সাহেব কেবলা চেহেরা মোবারক হইতে চাদরখানা সরাইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন এবং গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "আদব করো। আদবকা মোকাম হ্যায়। তোমহারে পাওকে নীচে কোরান হ্যায়।" ইহা শ্রবণের সাথে সাথে যেন তাহার পায়ের নীচে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাবৎ অনুভূতি হইতে লাগিল। তিনি ভয়ে বসিয়া পড়িলেন কিছুক্ষণ পর হযরত পুনঃ তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন, "কবুতর হ্যায়, খোস জিয়েঙ্গে, পাকছাফ জিয়েঙ্গে।" তিনি ভয়ে বিহ্বলিত চিত্তে বলিলেন, "হুজুর ছবকুছ আল্লাহকা হাতমে হ্যায়।" হযরত প্রতি উত্তরে বলিলেন, "আপ যো কহে হক হ্যায়। মগর মাই যো কহে দিয়া আপ দেক লেঙ্গে।" অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমকো হামারে পাছ কিছনে ভেজা হ্যায়।" তিনি উত্তর করিলেন, "রূপসা নিবাসী মুহাম্মদ গাজী চৌধুরীর পুত্র আহমদ গাজী চৌধুরী সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন।" ইহা শ্রবণে হযরত বলিলেন, "হযরত ইউসুফ কো ভাইও'নে কুঁয়েমে ঢালেথে। আল্লাহতা'য়ালানে উঠালিয়া। উছকো ভি ভাইওঁমে কুঁয়েমে ঢালেগা। আল্লাহতা'য়ালা উঠালেগা।" তৎপর তাহাকে বহির্বাটিতে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি তথা হইতে যাইয়া বহির্দায়েরাতে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন, হযরত সাহেবও দায়েরা শরীফের দক্ষিণ দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছেন। হযরত দায়েরা শরীফে প্রবেশ মাত্রই বিছানার উপর উত্তর শিয়রে শয়ন করিলেন। তিনি

হযরতের পার্শ্বে পশ্চিম মুখি হইয়া বসিলেন। হযরত সাহেব কেবলা চোখে চোখে চাহিয়া "তাওয়াজ্জোহ" দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাহার প্রেরণাপূর্ণ অবস্থা দেখা দিল। হযরতের চক্ষুদ্বয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। কাঞ্চনপুরী বলেন, "কছম আল্লাহ্। আমার জীবনে হযরতের এমন রঙ্গিন চক্ষু আর কখনো দেখি নাই।" তাহার পর তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা আমিনুল হক ছাহেবের স্কন্ধে ভর দিয়া বাহিরে গেলেন এবং পুনঃ প্রবেশ করিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। তিনি কাঞ্চনপুরীকে নির্দেশ দিলেন, "তোম কোর্ত্তা উল্টাকে পহেনো।" ইহাতে তিনি পরিধানের জামা উল্টাইয়া পরিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, ইহার মধ্যে কি নিহিত আছে। পরে বুঝিলেন হযরত বাহ্যিক সৌন্দর্য হইতে আভ্যন্তরীন সৌন্দর্যকে অধিক পছন্দ করেন।

অতঃপর উপবিষ্ট শিষ্যমন্ডলীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া অতি অসন্তুষ্টির সহিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমলোক খোদাকো ভুলকর হামারে পিছে কেওঁ এতনা লাগ গিয়ে হো? কেয়া আজ জুমায়া কা দিন নেহী হ্যায়? তোমলোক অজু করকে মসজিদ মে যাকর নামাজ পড়হো। আওর আল্লাহ আল্লাহ করকে আপনে আপনে ঠিকানামে চল যাও।" হযরতের এই পবিত্র নির্দেশে সকলের চৈতন্য উদয় হইল! সকলে অতি তাড়াতাড়ি মসজিদের প্রতি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। হযরত আক্‌দাছও সকলের পিছনে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। সকলে যখন মসজিদ পুকুরের ঘাটে পৌছিল, হযরত তখন বাড়ির প্রতি রওয়ানা দিলেন।

নামাজ পড়িয়া আরো অনেক লোকজনসহ দায়েরা শরীফে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, হযরত দক্ষিণ দ্বার দিয়া দায়েরা শরীফে প্রবেশ করিতেছেন এবং যাইয়া বিছানায় পূর্ববৎ শুইয়া পড়িলেন। হযরত কাঞ্চনপুরীর প্রতি শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাওয়াজ্জোহ্ ও ফয়েজ এনায়েত করিতে লাগিলেন। এই সময় কাঞ্চনপুরীর যাহা অবস্থা হইয়াছিল, ইহা বর্ণনা অতীত। কিছুক্ষণ পর হযরত আন্দর হুজুরায় চলিয়া যান। পরদিন শান্ত অবস্থায় হযরত তামাক সেবন করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় বিদায় গ্রহণ মানসে তিনি হযরতের সামনে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, "আপকেউ রোতে হো।" তিনি আরজ করিলেন, "হুজুর, এই অধমকে হুজুরের দাস শ্রেণীতে গণ্য করা হউক।" প্রতি উত্তরে হযরত বলিলেন; আচ্ছা!" তবুও তাহার ক্রন্দন বন্ধ হইতেছে না। হযরত পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফের আপ্ কেঁউ রোতে হো!" উত্তরে কাঞ্চনপুরী মিনতি জানাইয়া বলিলেন, "হুজুর! কোন অপরাধের দায়ে যেন হুজুরের দপ্তর হইতে আমার নাম খারিজ হইয়া না যায়। ইহাই আমার একমাত্র কামনা।" হযরত তাহাকে বলিলেন, "কুচ খাওফ নেহী।" অতঃপর অতি বিনয় সহকারে হযরতকে কদমবুচি করিতে উদ্যত হইল, হযরত বলিলেন "আভী নেহী, আয়েন্দা মে আরজু পুরা হোগা।" তিনি সালাম দিবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইতেই হযরত তাহাকে ডানহস্ত উত্তোলনে আচ্ছালামু আলাইকুম বলিয়া ফেলিলেন। অতএব তিনি ওয়ালাইকুমুচ্ছালাম বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

তিনি বাড়ীতে যাইয়া আহমদ গাজী চৌধুরী সাহেবের সাথে দেখা করিলেন। তাহাকে হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করিলেন। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার

তো কোন ভাই নাই কে আমাকে কূপে নিক্ষেপ করিবে। অলি আল্লাহদের রহস্যময় কালামের মর্ম উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। না জানি ইহাতে কোন পবিত্র রহস্য নিহিত রহিয়াছে।"

কিছুদিন পর পুনরায় তিনি হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হযরত তাহাকে কোরান শরীফ তেলাওয়াতের নির্দেশ দিলেন। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া বিছমিল্লাহ পাঠান্তে কোরান তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন। পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যেন স্পষ্ট অনুভব করিলেন- "ঘড়িতে চাবি দেওয়ার সময় যেমন কর্‌কর্ শব্দ হয়। তাহার কল্‌বের মধ্যেও সেই রূপ হইতেছে। তাহার দেহ মন হালকা ও পবিত্র অনুভূত হইতে লাগিল। এইভাবে কয়েকমাস কোরান পাঠ করিয়া কয়েক পারা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল।

কিছুদিন পর পুনঃ তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আওর কেউ আয়া তোমহারা তো এতনা ছিপারা হোগিয়া।" কত ছিপারা বলিয়াছিলেন, বর্ণনাকারীর উহা স্মরণ না থাকায় এখানে উহা অনুক্ত রহিল। হযরত যত পারার কথা বলিয়াছেন ঠিক তত পারাই তাহার মুখস্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি হযরতকে উপহার দেওয়ার নিয়তে এক শিশি আতর আনিয়াছিলেন। হযরতের খেদমতে উহা পেশ করিয়া তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, 'হুজুর আমি গরীব মানুষ আপনার জন্য কিছুই আনিতে পারিনাই।' হযরত তাহার প্রতি করুণ নয়নে তাকাইয়া বলিলেন, "মাই তোমারে পাছ কুই চিজকি মোহতাজ নেহী হোঁ।"

দেশীয় একজন মওলানা সাহেব তাহার সাথে হযরতের দরবারে আসিয়াছিলেন। তিনি হযরত আক্‌দাছের বেলায়ত সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহসূচক শ্লেষউক্তি করিতেন। তিনি যখন হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, হযরত তাহাকে দেখিয়াই তাহার প্রতি পিছন ফিরিয়া বসিলেন এবং মহাকবি খসরু রচিত নিম্নলিখিত শেয়েরটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

খল্ক মি গোয়েদ কে খসরু ভূত পুরস্তি মিকুনদ।
আরে আরে মিকুনম বা খলকে আলম কারে নিস্ত।।

মহাকবি খসরু বলেন- "লোকে বলে খসরু ভূতের পূজা করে, সত্যই আমি ভুতের পূজা করি। ইহাতে বিশ্ববাসীর সাথে আমার কোন কাজ নাই ইহা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

উক্ত শেয়েরটি শুনিয়া মওলানা সাহেব তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন। তিনি আরো বুঝিলেন যে, হযরত তাহার ভক্তি বিশ্বাস ও আলাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন। তাই তাহার প্রতি পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি করজোড়ে হযরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কদমে লুটিয়া পড়িলেন এবং তাহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে কাতর নিবেদন জানাইলেন। হযরত তাহাকে ক্ষমা করিয়া ফয়েজ বর্ষণ করিলেন। কিছুদিন পর পুনরায় হযরতের দরবারে আরজি করিলে, হযরত তাহাকে নিজ শিষ্যে গণ্য করিয়া নেন।

মওলানা কাঞ্চনপুরী সাহেব বলেন, হযরত ওফাত গ্রহণের পর এক রাত্রে তিনি হযরত আক্‌দাছকে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি স্বপ্নে হযরত আক্‌দাছের সহিত হস্ত "মোছাফেহা" করমর্দন করিতে উদ্যত হইলে হযরত তাহাকে বলিলেন, "তুমি হাজার

বৎসর অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলেও আমার হাত ধরিয়া "মোছাফেহা" করিবার উপযুক্ত হইবেনা।" উহা শ্রবণে তিনি হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া বলিলেন, "হুজুর কি কাজ করিলে উপযুক্ততা অর্জন করিতে পারিব।" হযরত তাহাকে একটি দোয়া শিখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহা পড়িতে থাক। তুমি যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে।" স্বপ্নে ইহা পড়িতে পড়িতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার হৃদয়ে এক আবেগ উদয় হইল। কি ব্যাপার! হযরতের সঙ্গে "মোছাফেহা" করিতে পারিলেন না। হযরত ইহ জগতে বর্তমান থাকিতেও তাঁহার কদমবুচি করিতে দেন নাই। আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হযরত তো তাহাকে আশা দিয়াছিলেন, "আভী নেহী আয়েন্দামে আরজু পুরা হোগা।" এই পবিত্র বাণীতো পুরা হইলনা। তিনিও ইহজগতে নাই। কি হইবে!

হঠাৎ এক রাত্রে হযরতকে তিনি আবার স্বপ্নে দেখিলেন। দেখিতেছেন, তিনি হযরতের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন এবং হযরত তাহাকে যথারীতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোম কওন হো?" তিনি তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, "হুজুর! গোলাম আবদুল আজিজ।" হযরত তাহার নিকট জানিতে চাহিলেন "কেয়া! তোম অহী আবদুল আজিজ হো জিছনে, হামারা কান বাঁধহা হ্যায়?" এই বাণী শ্রবণ করিতেই তিনি হযরতের পবিত্র চরণে পড়িয়া কদমবুচি করিতে লাগিলেন এবং হযরত বলিতে লাগিলেন, "মাই হাসরমে পহেলা কহোঙ্গা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।" এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তিনি জাগ্রত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। নিরাশার শূন্য ময়দানে তাহার আশাপুষ্প প্রস্ফুটিত দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দলহরী বহিয়া চলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হযরত কেন বলিলেন যে, "কেয়া তোম অহি আবদুল আজিজ হো যিছনে হামারা কান বাঁধহা হ্যায়! কোন বেয়াদবী হইল কী!" শেষে স্থির করিলেন যে, ইহা পীর মুরিদের মধ্যে যে সুদৃঢ় নেছবত প্রেম সম্পর্ক হযরত তাহার কথা বলিয়াছেন! মুরীদের যাবতীয় অভাব অভিযোগ পীর না শুনিয়া পারেন না। পীরের কান মুরিদের সাথেই বাঁধা থাকে।

তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, রূপসা নিবাসী চৌধুরী সাহেব সম্বন্ধে হযরত কি ভবিষ্যত বাণী করিয়া গেলেন, তাহাতো এখনও তাহার বুঝে আসিল না। হযরতের পরলোক গমনের সুদীর্ঘ চারি বৎসর পর, ঢাকায় এক জনসভায় শুনিতে পাইলেন যে, জনাব চৌধুরী আবদুচ্ছালাম সাহেব তাহার বক্তৃতায় বলিতেছেন, আহমদ গাজী চৌধুরী সাহেবকে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এমনি এক কূপে নিক্ষেপ করিয়াছেন যে, পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা উদ্ধার না করিলে, তাহার আর উপায় নাই। ইহা শুনিয়া হযরতের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি তাহার খেয়াল হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, চৌধুরী সাহেব নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, তাহার কোন ভাই নাই। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যাহাকে তাহার বিমাতা সহ বহুদিন পূর্বে তাহার পিতা স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজ ঔরশ জাত সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বর্তমানে উপযুক্ত হইয়া আহমদ গাজী চৌধুরী সাহেবের কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের প্ররোচনায় ও সহায়তায় মুহাম্মদ গাজী চৌধুরী সাহেবের উত্তরাধিকারী সূত্রে মালিকানা দাবী করিয়া আদালতে এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

আহমদ গাজী চৌধুরী সাহেব বেকাদায় পড়িয়াছেন। তাহাকে উত্তরাধিকারীত্ব হইতে এড়াইয়া যাওয়ার মত উপায় পাইতেছেন না। এই সংবাদ পাইয়া মওলানা সাহেব অতি সত্বর চৌধুরী আহমদ গাজী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাকে হযরতের পূর্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইহাতে তিনি "সাহেবে কশ্‌ফ" দূরদর্শী হযরতের কৃপাদৃষ্টি এবং আশীর্বাদে এই কুপতুল্য সঙ্কটময় মোকদ্দমার কবল হইতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জয়ী হইবেন বলিয়া আশ্বস্ত হইলেন। হযরতের প্রতি তাহার ভক্তি পূর্বাপেক্ষা আরো বাড়িয়া গেল। তিনি মওলানা কাঞ্চনপুরী সাহেবকে নানা প্রকার উপঢৌকনাদি সহ হযরতের পবিত্র দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি হযরতের দরবারে আসিয়া দোয়া প্রার্থনা জানাইলেন। কিছুদিন পর চৌধুরী সাহেবের উক্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাধ্য হইয়া মোকদ্দমা আপোষ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিছুদিন পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাটি হঠাৎ ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। ফলে খোদার লীলায় চৌধুরী সাহেব পূর্ণাকারে জয়ী সাব্যস্ত হইলেন। এইভাবে হযরত আক্‌দাছ তাঁহার ভক্ত অনুরক্তদের নানা বিপদাপদে উদ্ধার ও জয়যুক্ত করেন। সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁহার নজরে একটি শষ্যকণা সাদৃশ্য।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

মহাজেরে মক্কীর সালামের উত্তরদানে অলৌকিক কেরামত প্রদর্শন ও সালাম প্রেরণ

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত নেয়াজপুর নিবাসী হাফেজ আহমদ উল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন যে, তাহার নিজ গ্রাম নিবাসী হাজী আমিরুদ্দিন সাহেব জৈনপুরী মওলানা সাহেবের মুরিদ ছিলেন। তিনি মক্কাশরীফ হজ্ব করিবার কালে মহাজেরে মক্কী "সাহেবে দলায়েল" অলিয়ে কামেল সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ জনাব মওলানা আবদুল হক সাহেবের সাহচর্য অর্জনে তাহার ফয়েজ অনুগ্রহ গ্রহণে সমর্থ হন। বিদায় কালে মক্কী সাহেব তাহাকে আদেশ দিলেন "আপনি দেশে ফিরিয়া গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাণ্ডারী সাহেবের খেদমতে যাইয়া তাঁহাকে আমার আন্তরিক ভক্তি ও সালাম পৌঁছাইবেন।" উক্ত হাজী সাহেব হযরতের বেলায়তে অবিশ্বাসী ছিলেন। হযরতের উপর মক্কী সাহেবের ভক্তি দেখিয়া তিনিও কিছু মাত্র আস্থা স্থাপন করিলেন। অতঃপর বাড়ীতে আসিয়া মক্কী সাহেবের নির্দেশ পালনে সালাম পৌঁছাইবার মানসে তিনি হযরত সাহেব কেব্‌লার খেদমতে রওয়ানা হইলেন। তিনি হযরত সাহেব কেব্‌লার দরবারে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পূর্ব হইতেই হযরত বার বার "ওয়া-লাইকুমুচ্ছালাম" উচ্চস্বরে উল্লেখ করিতেছিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, হযরত কাহার সালামের উত্তর দান করিতেছেন-না বুঝিয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর হাজী আমিরুদ্দিন সাহেব দরবারে উপস্থিত হইলেন। হযরত আক্‌দাছ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বার বার "ওয়া-লাইকুমুচ্ছালাম।" "ওয়া-লাইকুমুচ্ছালাম" বলিতে লাগিলেন। হাজী সাহেব মক্কী সাহেবের সালাম পেশ করার কোন সুযোগই পাইতেছেন না। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন কি করিয়া মক্কী সাহেবের জিম্মাদারী আদায় করা যায়। এক সময় হযরত তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি যখন আমার দোস্তের সালাম নিয়া আসিয়াছেন, তখন আমার সালামও তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। তথায় "শাহ কুলজাম" কেও এই চারি আনা পয়সা দিবেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে চারি আনা পয়সা নিয়াছিলাম;" এই বলিয়া তাহাকে একখানা চৌ-আনি হাতে দিয়া কোন প্রকার প্রতি উত্তরের সুযোগ না দিয়া বিদায় দিলেন। হাজী সাহেব কোন প্রকার প্রতি উত্তর করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাড়ীর পথ ধরিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, মক্কী সাহেব ও হযরত মাইজভাণ্ডারী উভয়েই আল্লাহ্‌র মহান অলি আল্লাহ।

তাহার ভুল সংশোধন করিবার জন্যই হয়তো মক্কী সাহেব তাহাকে মাইজভাণ্ডার পাঠাইয়াছেন।

তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, আবার কোন জিম্মাদারীতে আটকাইয়া পড়িলেন। তিনি হজ্ব করিয়া আসিয়াছেন। কি করিয়া মক্কী সাহেবের নিকট ছালাম পৌঁছাইবেন। শাহ্ কুলজাম কে, কোথায় তাহার দেখা পাইবেন। এই মহান দায়িত্ব নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা পালন করাইবেন। না হয়তো একজন "সাহেবে কশ্‌ফ" অলি আল্লাহ তাহাকে এই গুরু দায়িত্ব দিতেন না। চিন্তিত মনে তিনি কাল যাপন করিতেছেন। একদা ১৬ই রমজান শুক্রবার জুমার নামাজ সমাপনান্তে তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় তাহার নিজ গ্রাম নিবাসী একজন বৃদ্ধধনীলোক তাহাকে ছালাম দিয়া হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন-"হাজী সাহেব আমিতো আপনার খোঁজে আছি। আমি এইবার হজ্ব করিবার নিয়ত করিয়াছি। সঙ্গে আপনাকে নেওয়ার আশা করিয়াছি। আপনার যাতায়তের এবং আপনার পারিবারিক সমস্ত খরচ আমরা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমি বহন করিব।" এই বলিয়া তিনি তাহার হাতে পনরটি টাকা দিয়া আবশ্যকীয়-খরচাদি করিতে বলিলেন এবং হজ্ব যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। হযরতের এই অলৌকিকতা ও দূরদর্শীতা দেখিয়া হযরতের প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি ও অনুরাগ জন্মিয়া গেল।

অতঃপর উভয়ে প্রস্তুত হইয়া যথাসময়ে হজ্বে রওয়ানা হইলেন, মক্কাশরীফ পৌঁছিয়া প্রথমে তিনি হযরতের সালাম মক্কী সাহেবের খেদমতে পৌঁছাইয়া দিলেন। মক্কী সাহেব সালামের উত্তরে হযরতের অনেক যশোকীর্তন করিলেন। তাহারা হজ্বব্রত সমাপন করিলেন কিন্তু হাজী সাহেব শাহ্ কুলজামের কোথাও দেখা পাইলেন না। অনেক খোঁজ করিলেন। কাহারো কাছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা অবাক বিস্ময়ে বলেন যে, শাহ্ কুলজামের দেখা পাওয়া সহজ সাধ্য নহে। তিনিতো আর আমাদের আপনাদের মত নহেন। অতঃপর তাহারা বাড়ীর পথে জেদ্দাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাহার মনে শান্তি নাই। হযরতের চালানী জিম্মাদারী এখনও আদায় করিতে পারেন নাই। তাহার মনে কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এতবড় জিম্মাদারী আদায় করিতে যখন সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয় উহাও আদায় করিতে উপায় করিয়া দিবেন। তাহারা জাহাজে উঠিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পরে এক জায়গায় দেখিলেন, চতুর্দিক হইতে লোকেরা পানিতে পয়সা নিক্ষেপ করিতেছে। সন্ধানে জানিতে পারিলেন ইহা জলাধিপতি শাহ্ কুলজামের জায়গা বলিয়া খ্যাত জায়গা। হাজী সাহেব মনযোগের সহিত উহা দেখিতেছেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একজন অতি সুন্দর দীর্ঘকায় লোক, তাঁহার পা বোটের গর্ভে এবং মাথা তাহার বরাবরে জাহাজের কিছু বাহিরে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি হাত বাড়াইয়া বলিতেছেন আপনার নিকট আমার চারি আনা পয়সা আছে দিয়া দিন। হাজী সাহেব অবস্থা বুঝিয়া অতি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে হযরতের দেওয়া চৌ আনিখানা বাহির করিয়া দিয়া দিলেন। শাহ্ কুলজাম পয়সা হাতে লইয়া "মারহাবা গাউছুল আজম শাহ্ আহমদ উল্লাহ" বলিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তিনি তাহার সাথী হাজী সাহেবকেও উহা দেখাইবার সময় পাইলেন না। হজরতের কৃপায় তিনি শাহ্ কুলজামের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমানত আদায়ের আল্লাহতা'লার শোকরিয়া আদায় করিলেন। তিনি বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, জলাধিপতি শাহ্ কুলজামের সহিত হযরতের কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হযরত আক্‌দাছকে গাউছুল আজম বলিয়া চিনিতে তাহার আর বাকী রহিলনা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

(১) হযরতের ছোহ্‌বতে জৈনপুরী মওলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব

জৈনপুর নিবাসী পীরে তরীকত হযরত মওলানা কেরামত আলী সাহেবের বংশধর মওলানা পীর শাহাবুদ্দিন সাহেব হযরত আক্‌দাছকে ভক্তি করিতেন। একদিন তিনি হযরতের খেদমতে হাজির হইলেন। হযরত তখন তাঁহাদের সামনের পুকুরের পাড় দিয়া উত্তর দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। মওলানা শাহাবুদ্দিন, হযরতের এক ভক্ত খায়েজ আহমদ এবং আরো অনেক লোকজন হযরতের পিছনে পিছনে চলিয়াছিলেন। হযরত হঠাৎ পিছনে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাই খাজা সাহেব নাকি! খায়েজ আহমদ উত্তর করিলেন "হুজুর আমি আপনার গোলাম খায়েজ আহমদ।" এমতাবস্থায় মওলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তিনি এত বড় পীর খান্দানীর মওলানা হইয়া হজরতের পিছনে পিছনে হাটিলে লোকে না জানি কি বলে। ঠিক সেই সময় হজরত হঠাৎ পিছনে ফিরিয়া খায়েজ আহমদের প্রতি তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মিঞা। শাহাবুদ্দিন সাহেবের চৌগাটি আপনাকে দিলে ভাল হইবে না?" ইহা শ্রবণ মাত্র মওলানা সাহেব নিজ কল্পনার কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া গেলেন। না জানি হযরত তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে তাহার এলেম ও বুজুর্গি অন্যকে অর্পণ করিয়া দেন! এই ভয়ে অতি বিনয় সহকারে হযরতের খেদমতে আবেদন জানাইলেন, "হুজুর আমি অতি গরীব লোক। আমার থেকে দেওয়া যাইতে পারে, এমন কিছুই নাই! আমি হুজুরের দরবারে ভিক্ষার প্রত্যাশী। আপনার পবিত্র দরবারে "ছায়েল" মেহমান আসিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করুন।" হযরত আবার হাটিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। উক্ত খায়েজ আহমদ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেই সময় আমার ও মওলানা শাহাবুদ্দিন সাহেবের অবস্থা এমন 'জজ্‌ব' ও প্রেরণাপূর্ণ হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনাতীত। মওলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব হযরতের দরবারে বিভিন্ন প্রকৃতির ও ভাবধারার লোকজন দেখিয়া একদিন হযরতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হুজুর "আপনার দরবারে বহু "মসরবের" মানুষ দেখিতেছি।" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "মিঞা! যিছ্ দোকান মে হারচিজ রাহতা-হ্যায় ওয়ে আচ্ছা হ্যায়।"

(২) হযরতের দরবারে জৈনপুরী মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব

জৈনপুরী সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব একদা হযরতের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি অতি সুন্দরভাবে ওয়ায়েজ নছিহত করিতেন। দেশবাসীর অনুরোধে জনাব মওলানা শাহ্ সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেব তাহাকে ওয়ায়েজের জন্য অনুরোধ করিলেন। হযরতের দায়েরা শরীফের সামনে মাহফিলের এন্তেজাম করা হইল। মওলানা সাহেব হযরতের কাছে ওয়ায়েজ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি আরো প্রার্থনা জানাইলেন যে, হযরত আক্দাছ যেন সভাপতিরূপে তাহার পার্শ্বে থাকেন। হযরত তাহাতেও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। জৈনপুরী সাহেব হযরতের নির্দেশক্রমে ওয়ায়েজ আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে, সেই দিন মওলানা সাহেবের ওয়ায়েজ এত আকর্ষণীয় হইয়াছিল যে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। ওয়ায়েজ করা কালীন তাহার যে প্রেরণাপূর্ণ অজদী অবস্থা আসিয়াছিল, তাহা আর কোন দিন পরিদৃষ্ট হয় নাই। হযরত তাহার ওয়ায়েজে খুশী হইয়া তাহাকে দোয়া করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, "মিঞা মওলানা সাহেব, কাঁটেছে ঝাড় কো কাট করকে গোলাপ আওর রায়হানকা ঝাড় লাগা দিজিয়ে।" সেই দিন হইতে মওলানা সাহেবের ওয়ায়েজ নছিহতে অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি দেখা দেয়। মানুষ তাহার বক্তৃতায় মুগ্ধ না হইয়া পারিতনা।

(২) হযরতের দরবারে জৈনপুরী মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব

জৈনপুরী সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব একদা হযরতের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি অতি সুন্দরভাবে ওয়ায়েজ নছিহত করিতেন। দেশবাসীর অনুরোধে জনাব মওলানা শাহ্ সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেব তাহাকে ওয়ায়েজের জন্য অনুরোধ করিলেন। হযরতের দায়েরা শরীফের সামনে মাহফিলের এন্তেজাম করা হইল। মওলানা সাহেব হযরতের কাছে ওয়ায়েজ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি আরো প্রার্থনা জানাইলেন যে, হযরত আক্দাছ যেন সভাপতিরূপে তাহার পার্শ্বে থাকেন। হযরত তাহাতেও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। জৈনপুরী সাহেব হযরতের নির্দেশক্রমে ওয়ায়েজ আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে, সেই দিন মওলানা সাহেবের ওয়ায়েজ এত আকর্ষণীয় হইয়াছিল যে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। ওয়ায়েজ করা কালীন তাহার যে প্রেরণাপূর্ণ অজদী অবস্থা আসিয়াছিল, তাহা আর কোন দিন পরিদৃষ্ট হয় নাই। হযরত তাহার ওয়ায়েজে খুশী হইয়া তাহাকে দোয়া করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, "মিঞা মওলানা সাহেব, কাঁটেছে ঝাড় কো কাট করকে গোলাপ আওর রায়হানকা ঝাড় লাগা দিজিয়ে।" সেই দিন হইতে মওলানা সাহেবের ওয়ায়েজ নছিহতে অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি দেখা দেয়। মানুষ তাহার বক্তৃতায় মুগ্ধ না হইয়া পারিতনা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

(১) রেশমী পরিচ্ছদে মোহছেনীয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট

চট্টগ্রাম মোহছেনীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মওলানা আবদুল মোনায়েম সাহেব একদা হযরতের খেদমতে আসিয়া "ওহাদতে অজুদ" খোদাতত্ব মছায়েলা জানিতে হযরতের নিকট প্রশ্ন করিলেন। ইহাতে হযরত অত্যন্ত "জালাল" হইয়া উঠেন।

হযরত আক্দাছ একটি লাঠি হাতে লইয়া তাহাকে তাড়াইতে উদ্যত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "রেশমী কাপড় পরিয়া আমার কাছে আবার খোদাতত্ত্ব জানিতে আসিয়াছ।" ইহাতে মওলানা সাহেব অতি ভয়ে দ্রুত পলাইয়া গেলেন। সম্মুখস্থ্ মসজিদের কাছে যাইয়া তাহার রেশমী জামা কাপড় বদলাইয়া লইলেন। তবুও তিনি অতি ভয়ে আদবের সহিত এলমের গর্ব ত্যাগ করিয়া বিনয় সহকারে পুনরায় হযরতের খেদমতে হাজির হইলেন। এইবার হযরত তাহাকে তাড়াইলেন না এবং অতি সাদরে খেদমতে বসিতে আদেশ দিলেন। তারপর তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রকার তৌহিদ তত্ত্ব-আলাপ আলোচনার বিনিময়ে প্রশ্ন ও জওয়াব আরম্ভ হইল। হযরতের আধ্যাত্মিক আলোকে তাহার দেহ ও আত্মা আলোকিত হইয়া গেল। এমন কি তাহার কলব ও সমস্ত রগরেশা পর্যন্ত আলোড়িত ও জারী হইয়া গেল। হযরতের এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দর্শনে মওলানা সাহেব হযরতের অন্যতম ভক্তে গণ্য হইলেন।

(২) তবাররোক প্রদানে সন্তান দান

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ছিবাতলী নিবাসী মওলানা হাশমত আলী সাহেব হুগলী গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে হেড মওলানার কাজ করিতেন। তাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। অনেক আউলিয়া বুজুর্গের দরবারে যাইয়া তিনি খোদার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার তকদির ফলে নাই। তিনি হযরত আক্দাছের অনেক অলৌকিক ঘটনা জন সমাজে শুনিয়া একদিন বৃদ্ধ বয়সে শেষ তদবিরে, তকদীর পরীক্ষা করিতে হযরতের দরবারে আসিলেন। তিনি হযরতের সামনে হাজির হইয়া তাঁহাকে কিছু বলার পূর্বেই হযরত তাহার হাতে দুইখানা বাতাসা দিয়া বলিলেন,

"তোম্‌কো দো ফুল দিয়া, এক ছা'দী দোছরে নেজামী।" অতঃপর বিদায় লইয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। হযরত প্রদত্ত বাতাসা দুইখানা তাহার স্ত্রীকে খাওয়াইয়া দিলেন।

ইহার চারি বৎসরের মধ্যে তাহার দুইজন ছেলের জন্ম হইল। একজনের নাম রাখা হয় আবুল হায়াত এবং অপর জনের নাম আবু তাহের। একদিন মওলানা হাসমত আলী সাহেব বর্ণনা করেন-"আমি তাঁহার এই অপূর্ব অলৌকিক কেরামত ও খোদাদাদ শক্তি দেখিয়া অপরিসীম আনন্দিত হইলাম এবং খোদার দরবারে প্রত্যহ শোকরিয়া আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহার এই উছিলায় পরম দয়াময় খোদাতায়ালা আমার আশা পূর্ণ করেন। হযরতের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি ও প্রেরণা আসে। আমি ক্রমে তাহার ভক্ত-শিষ্যে পরিণত হইয়া গেলাম।"

বর্তমান ছেলে দুইজন, একজন ইসলামী মাদ্রাসায় ও অন্যজন ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার দোয়ায় একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও অন্যজন কলেজে প্রফেসারী করেন।

(৩) কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার মওলানা জনাব ছফি উল্লাহ সাহেব মারফত হযরতের পরিচয়

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার মওলানা কুতুবে জামান শাহ্ ছুফী জনাব ছফি উল্লাহ সাহেবের সঙ্গে হযরতের আধ্যাত্মিক পরিচয় ছিল। তিনি হযরত সাহেব হইতে বাতেনী ফয়েজ অর্জন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন। একদিন চট্টগ্রামের নদীমপুর নিবাসী এক্সাইজ ইন্সপেক্টর মওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ সাহেব ও নানুপুর নিবাসী সৈয়দ মুহাম্মদ আবু তাহের মিঞা উক্ত মওলানা ছফি উল্লাহ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি তাহাদের বাড়ী ও বাসস্থানের পরিচয় চাহিলেন। তাহারা উত্তর করিলেন, "হুজুর আমাদের বাড়ী চট্টগ্রাম।" তখন মওলানা সাহেব চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহকে চিনেন?" উত্তরে তাহারা বলিলেন, "হুজুর চিনি!" তখন মওলানা সাহেব অতি জালালী অবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "মিঞা কি চিন! কিরূপ চিন? ছয়শত বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত এইরূপ অলি আল্লাহ পৃথিবীতে আসেন নাই।" হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, হযরত পীরানে পীর দস্তগীর (রঃ) কে লক্ষ্য করিয়াই তিনি ছয়শত বৎসর বলিয়াছিলেন। তাহার নিকট হযরত আক্‌দাছ গাউছুল আজম রূপে পরিচিত ছিলেন।

(৪) মেয়েলোকের প্রতি হযরতের ফয়েজ রহমত এবং বেহেস্ত ও মনকির নকীর সম্পর্কে তাঁহার তছর্‌রোপাত

(ক) হযরত আক্‌দাছের ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব সৈয়দ গোলাম ছোবহান সাহেবের স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া খাতুন হযরত সাহেবের মুরিদ ছিলেন। তিনি জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আক্‌দাছ তাহাকে একটি জিকির শিখাইয়া দিয়াছিলেন। নামাজের পর তিনি উহা পড়িতেন। উক্ত জিকির পড়ার সময় তাহার কল্‌বে জজ্‌ব হইত। তাহার স্বামী উহা দর্শনে একদিন "মেয়ে লোকের আবার ফকিরী কি" বলিয়া তাহাকে প্রহার করেন। সেই রাতে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে উক্ত রাবেয়া খাতুন হযরত কেব্‌লার খেদমতে আসিয়া ভাবাবেগে কাঁদিয়া ফেলেন। হযরত তাহাকে খুব বেশী স্নেহ করিতেন। তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং মাথায় রক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসায় সমস্ত জ্ঞাত হইলেন। তখন তাঁহার জালালী অবস্থা উপস্থিত হয়। জনাব সৈয়দ গোলাম ছোবহান তখন নিদ্রিত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিতেছিলেন যেন হযরত আক্‌দাছ লাঠি হাতে তাহাকে মারিতে চাহিতেছেন। তিনি জাগরিত হইয়া তাড়াতাড়ি হযরতের খেদমতে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানান যে, তিনি ভবিষ্যতে আর কোন দিন রাবেয়া খাতুনের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবেন না।

(খ) অপর একদিন সৈয়দা রাবেয়া খাতুন হযরত আক্‌দাছের নিকট প্রশ্ন করিলেন, "বাবা! মনকির নকীর কবরে ছওয়াল জওয়াব করিবার সময় আমি কি বলিব" হযরত বলিলেন, "তুমি তোমাকে দেওয়া জিকিরটি খেয়াল রাখিও।" রাবেয়া খাতুন বলিলেন, "বাবা! তাহা আমি পারিবনা।" হযরত বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমাকে স্মরণ করিও।" রাবেয়া বলিলেন "না বাবা আমি অত সব পারিবনা, আমার খেয়াল থাকিবেনা।" হযরত হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন "আচ্ছা মা তোমাকে কিছুই করিতে হইবেনা আমিই সব বলিব।"

(গ) হযরতের ওফাতের প্রায় ছয় মাসের মধ্যে একটি ঘটনা। উক্ত সৈয়দা রাবেয়া খাতুনের দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ সুলতান আহমদ মারা যায়। কয়েকদিন পর সৈয়দা রাবেয়া খাতুন হযরত আক্‌দাছের রওজা পাকে গিয়া খুব বেশী কান্নাকাটি করেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বিভোরচিত্তে তথায় বসিয়া থাকেন। হযরত আক্‌দাছকে তিনি বিভোর অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। হযরত তাহাকে বলিতেছেন, "রাবেয়া! তোমার সুলতানকে দেখাইলে আর কাঁদিবেনা তো!" রাবেয়া খাতুন বলিলেন যে, তিনি আর কাঁদিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার সামনে একখানা মনোরম প্রশস্ত এবং উন্মুক্ত বাগান দেখিতে পাইলেন। তথায় সু-গন্ধি নহরাদি প্রবাহিত এবং নানা রকম ফল ফুলের বৃক্ষরাজি পরিশোভিত দেখিতে পান। সেই মনোরম বাগানের মধ্যে তিনি তাহার ছেলে সুলতান আহমদকে আরো অনেক ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করিতে দেখিতে পাইলেন।

তিনি আরো বর্ণনা করেন, হযরত তাহাকে বলিয়াছিলেন, "রাবেয়া তুমি আমার দেলাময়নাকে যত্ন করিও। আমি তোমাকে দেখিব।" তিনি শেষ পর্যন্ত জনাব সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের তখন সন্তান সন্ততি হইয়াছে, তখনও তাঁহাকে কোলে বসিতে বাধ্য করিতেন। বলিতেন, "হযরতের নির্দেশ আমাকে পালন করিতে হইবে।" জনাব সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বাধ্য হইয়া মাটিতে হাতের ভার রাখিয়া তাহার কোলে বসিতেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হযরত আকদাছের বেলায়ত প্রাপ্ত প্রধান খলিফাদের নাম

দিকদিগন্তর হইতে তৃষ্ণাতুর পথিকের মত অগণিত ধর্মীয় মোজাহেদ আলেমগণ খোদা অন্বেষণ পথে খোদায়ী প্রেম প্রেরণাসুধা অর্জনে ভুবনব্যাপী মহাসাগর রূপ বিশ্বগাউছ হযরত সকাশে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ধাইয়া আসিতে লাগিলেন। এবং হযরত তাঁহার প্রেম জোয়ারে ভক্ত অনুরক্ত মোজাহেদ আলেম বাহিনীকে প্লাবিত ও দেশ দেশান্তরে প্রসারিত করিয়া বিশ্বসৃষ্টির তৃষ্ণানিবারণে বিশ্বকে প্রেম উম্মাদনায় সজীব করিয়া তুলিতে লাগিলেন। কত নির্জন অরণ্যে তিনি বাজার বসাইলেন, কত নির্ধনকে ধনী করিলেন, কত মানহীনে সম্মানিত করিলেন তাহার ইয়ত্বা নাই

তাঁহার পবিত্র করুণা ধারা অর্জনে যাহারা ধনী হইয়া খোদা অন্বেষণে অলি-আল্লাহ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) অর্জন করিয়া সুপরিচিত হাদিয়ে কামেল হইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান করা কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। সংগৃহীত তথ্যগুলিও এই সাধারণ ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই নমুনা স্বরূপ কয়েকজন সুপরিচিত স্মৃতিধারী অলি আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) জনাব মওলানা শাহ্‌ ছুফী অছিয়র রহমান সাহেব (রঃ), চরণ দ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(২) জনাব মওলানা শাহ্‌ ছুফী কাজী আছাদ আলী সাহেব (রঃ), আহল্লামৌজা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(৩) জনাব মওলানা শাহ্‌ ছুফী আবদুল আজিজ সাহেব (রঃ), খিতাবচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(৪) জনাব মওলানা শাহ্‌ ছুফী আমিরুজ্জমান সাহেব (রঃ), পটিয়া, চট্টগ্রাম।

(৫) জনাব মওলানা শাহ্‌ ছুফী আবদুর রাজ্জাক সাহেব প্রঃ হাকিম শাহ্‌ (রঃ), সাতবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

(৬) জনাব মওলানা শাহ্‌ ছুফী আমিনুল হক হারবাঙ্গিরী (রঃ), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(৭) জনাব মওলানা শাহ্‌ ছুফী মুজিবুল্লাহ সাহেব (রঃ), সুলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।

(৮) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী খলিলুর রহমান সাহেব (রঃ), রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
(৯) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী রাহাতুল্লাহ সাহেব (রঃ), রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
(১০) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী মোহছেন আলী (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
(১১) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আমানুল্লাহ আলী (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
(১২) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী ফরিদুজ্জমান আলী (রঃ), সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
(১৩) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আফাজুদ্দিন আলী (রঃ), কালারমার ছড়া, মহেশখালী।
(১৪) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ), (মন্ডল) আরকান, বার্মা।
(১৫) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী মিঞা হোছাইন (রঃ), খেনুদি, আরকান, বার্মা।
(১৬) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল হামিদ (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
(১৭) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ), সোনাপুর, নোয়াখালী।
(১৮) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুর রহমান (রঃ), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।
(১৯) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী রেজওয়ান উদ্দিন (রঃ), শাহ্নগর, চট্টগ্রাম।
(২০) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী মহব্বত আলী (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
(২১) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী রহিম উল্লাহ (রঃ), রাউজান, চট্টগ্রাম।
(২২) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী হাফেজ, কারী মোহাদ্দেছ সৈয়দ তাফাজ্জুল হোছাইন সাহেব (রঃ), মির্জাপুর, চট্টগ্রাম।
(২৩) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী মুফতী সৈয়দ আমিনুল হক (রঃ), ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।
(২৪) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী করিম বক্স প্রঃ বজলুল করিম (রঃ), মন্দাকিনী, চট্টগ্রাম।
(২৫) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ইউসুফ আলী সাহেব (রঃ), হাওলা, বোয়ালখালী।
(২৬) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল কুদ্দুছ সাহেব (রঃ), হাওলা, বোয়ালখালী।
(২৭) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী এয়াকুব গাজী (রঃ), শ্রীপুর, নোয়াখালী।
(২৮) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী নজির আহমদ প্রঃ নজির শাহ্ (রঃ), (সীতাকুণ্ড) মাজার-ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।
(২৯) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী হাছি মিঞা (রঃ), চারিয়া, চট্টগ্রাম।
(৩০) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী এবাদুল্লাহ শাহ (রঃ), হারবাঙ্গ, চকরিয়া, চট্টগ্রাম।
(৩১) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী জাফর আহমদ (রঃ), প্রঃ মামু ফকীর রেঙ্গুন, বার্মা।
(৩২) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী বাচা মিঞা ফকীর (রঃ), কাউখালী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
(৩৩) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী বাচা শাহ্ (রঃ), ফতেহপুর, হাটহাজারী।
(৩৪) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী শাহ্ ওয়ালী মস্তান (রঃ), পার্বত্য চট্টগ্রাম।
(৩৫) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল মজিদ (রঃ), আজিমনগর, চট্টগ্রাম।
(৩৬) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুর রহমান সাহেব (রঃ), ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।
(৩৭) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল জলীল প্রঃ বালু শাহ্ (রঃ), ছাদেক নগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
(৩৮) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আমিনুল হক পানী শাহ্ (রঃ), ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

(৩৯) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী মতিয়র রহমান শাহ্ (রঃ), পূর্ব ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।
(৪০) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী এয়াকুব নুরী (রঃ), নোয়াখালী।
(৪১) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ), কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।
(৪২) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আসরাফ আলী (রঃ), দুগাইয়া, চান্দপুর, কুমিল্লা।
(৪৩) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ), ফেনী, নোয়াখালী।
(৪৪) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আলী আজম (রঃ), মন্ডল নোয়াখালী।
(৪৫) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল গফুর (রঃ), প্রঃ কম্বলী শাহ্ মোহনপুর, ফরিদপুর।
(৪৬) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী গোলাম রহমান (রঃ), বরিশাল।
(৪৭) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল হাদী (রঃ), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।
(৪৮) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল গণি (রঃ), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।
(৪৯) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুচ্ছালাম (রঃ), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।
(৫০) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল গফুর শাহ্ (রঃ), সরোয়াতলী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
(৫১) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক (কঃ), ফানীবিল্লাহ, নিজপুত্র, মাইজভাণ্ডার।
(৫২) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আমিনুল হক (কঃ), ওয়াছেল, নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র, মাইজভাণ্ডার।
(৫৩) সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ), নিজ পৌত্র, মাইজভাণ্ডার।
(৫৪) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী কুতুবে রাব্বানী মাহবুবে ছোবহানী গাউছুল আজম বিল বেরাছত সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ), নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র।

যাহারা হযরত আক্‌দাছ হইতে ফয়েজ এর্শাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার খলিফায়ে আজম জনাব "বাবাজান" কেবলা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী গাউছুল আজম বিল বেরাছত সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এঁর সাহচর্যতায় পূর্ণ কামালিয়ত অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী রজব আলী (রঃ), সাকরাপুর, কুমিল্লা।
(২) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী জমিরুদ্দিন (রঃ), তিশনা, সাকরাপুর, কুমিল্লা।
(৩) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সিরাজুল হক (রঃ), নোয়াপাড়া, চট্টগ্রাম।
(৪) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী অলি উল্লাহ সাহেব (রঃ), রাজাপুর, কুমিল্লা।
(৫) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী নুর বক্স সাহেব (রঃ), গোয়ালিয়া, নোয়াখালী।
(৬) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী মুহাম্মদ হোসাইন (রঃ), ঢাকা।
(৭) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আমিনুল্লাহ সাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
(৮) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল্লাহ সাহেব (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের জন সমাজে পরিচয় কেরামত

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত ভক্তমন্ডলীর আত্মসমর্পনের দ্বারা স্বাধীন বেলায়তের মূর্তছবি হযরতের আধ্যাত্মিক তরিকত প্রভাবে সকল বাধা বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া দ্রুত প্রসার লাভ করিল। বাস্তব পক্ষে পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁহার প্রিয় মনোনীত তরিকত প্রণালীর মোড় তাঁহার বদৌলতে যেন অগ্রগতির পথে ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহাদের অনুসরণে ক্ষুদ্রজ্ঞানী মানবকুল অতিসহজে সত্যালোকের সন্ধান নিতে সক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারাই হইলেন সত্য ও অসত্যের, অন্ধকার ও আলোকের, সুপথ ও কুপথের সংগ্রামে হযরতের প্রথম সেনাবাহিনী। তাই পরম বন্ধু, আল্লাহ তায়ালার প্রেম দপ্তরে বদর যুদ্ধের বীর সাহসী মোজাহেদ শহীদ ও গাজী সেনানীর মত তাঁহাদের নাম নুরানী অক্ষরে সজ্জিত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেম অভিযানের ফলে লক্ষ লক্ষ পথ হারা মানুষের পথের সন্ধান হইয়াছে। বিপথবাহী শত্রু আক্রান্ত মানবকুল মহা ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাইতো তাঁহারা মহান সম্রাটের গাজীতুল্য অলিশ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন।

হযরত শুধু এলেমধারী আলেমবৃন্দকে প্রেম সম্পদ বিলাইতে আসেন নাই। অহঙ্কারী আলেমদের এলেমগর্ব খর্ব করিয়া প্রেরণার জলে কেবলমাত্র তাহাদের স্নান করাইতেও আল্লাহ এই ভবে পাঠান নাই। তিনি বিশ্বসৃষ্টির রহমতধারী সকলের করুণা নিয়াই ত এই ধরনীতে পদার্পণ করিয়াছেন; ভববাসীর যাবতীয় প্রাপ্য তাঁহারই প্রেমাগারে সঞ্চিত জমায়েত রহিয়াছে। যাহারা খোদা তত্ত্বে সর্বাঙ্গীন অন্ধ, যাহারা সংসার চক্রের মায়াজালে বন্দী রহিয়াছে, ধনজনের মায়ামোহে বিভোর হইয়া আত্মভোলা হইয়া পড়িয়াছে; অথচ মহান স্রষ্টার কথা, পরকালীন মুক্তির কথা তাহাদের হৃদয়ে মোটেই স্থান পায় নাই তাহাদের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা নিতান্তই কর্তব্য। তাই তিনি প্রেম সূত্রের আকর্ষণে অগণিত ধনী গণী সুধীমন্ডলীকে টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দমনীয় মহাশক্তির টানে তিষ্টিতে না পারিয়া-দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞান পিপাসু লোকেরা হযরতের পানে পতঙ্গের মত আসিয়া প্রেমপ্রজ্জ্বলিত প্রেরণার আগুনে দহিতে লাগিল।

একদা কুমিল্লা নিবাসী চিওড়া কাজীবাড়ীর নওয়াব মীর মোশাররফ হোসাইন সাহেব হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) দরবারে পাকে আসিয়া তাঁহার রূহানী প্রেরণা ফয়েজ লাভ করেন। এক সময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ প্রাঙ্গণে

বাবাজান কেবলার রওজা মোবারকের ভিত্তি প্রস্তর দেওয়ার কালে বিরাট জলসায় নওয়াব সাহেব তাহার বক্তৃতায় বর্ণনা করেন যে, নায়েব আজিজ মিঞার মারফত প্রাপ্ত-হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) একখানা জুতা মোবারকের বদৌলতে তিনি অনেক সময় বড় বড় বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। উক্ত জুতা মোবারক তিনি প্রতি সপ্তাহে আতর মাখাইয়া রাখিতেন এবং সঙ্কটকালে হযরতের উছিলায় আল্লাহতা'লা সমীপে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া সফলকাম হইতেন।

শেরে বাংলা মরহুম জনাব এ, কে, ফজলুল হক সাহেব প্রথম ওকালতি পাশ করিয়া হযরত আক্‌দাছের খেদমতে উপস্থিত হন। এবং উন্নতির জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। তিনি একদিন প্রকাশ্য জনসভায় বলেন যে, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ও বাবা বোস্তামীর সুনজর যতদিন তাঁহার উপর বর্তমান থাকিবে ততদিন কোন শক্তিই তাঁহার মাথা নত করাইতে পারিবেনা এবং তাঁহার জয় সুনিশ্চিত। তিনি তাঁহাদের সুনজর কামনা করেন।

(১) খান বাহাদুর ফজলুল কাদেরের প্রতি পরীক্ষার হলে রহমত বর্ষণ

চট্টগ্রামস্থিত চন্দনপুরা নিবাসী খান বাহাদুর ফজলুল কাদের সাহেব--সাবরেজিষ্ট্রারী পরীক্ষার প্রার্থী ছিলেন। তাঁহার সমপরীক্ষার্থীরা সকলেই তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানে ও মানে অত্যধিক উপযুক্ত ছিলেন। ইহাতে তিনি নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর একদিন তিনি হযরত আক্‌দাছের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি সফলকাম হইতে পারেন। প্রায় সময় হযরত হাজতি লোকদিগকে তাঁহাদের নাম পিতার নাম ও আসিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন। খান বাহাদুর সাহেবকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "হুজুর অধীনের নাম ফজলুল কাদের, পিতার নাম এমদাদ আলী দারোগা সাহেব, বাড়ী চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম। হযরত তিনবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও তিনবার উত্তর দিলেন। অতঃপর হযরত নিম্নলিখিত ফারছি বয়াতটি আবৃতি করিতে লাগিলেন ঃ-

কাদেরা কুদরত তু দারী
হারছে খাহী আঁকুনী।
মুর্দারা জিন্দা তো সাজি
জিন্দারা বেজাঁ কুনী।।

তৎপর বলিলেন, "যাও মিঞা! দোয়া করিলাম।" খান বাহাদুর সাহেব বলেন, "কিছুদিন গত হইল। পরীক্ষার তারিখে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হইলাম। অনেক লোকেই পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি নূতন হইলেও আমার নিকট পুরাতন মনে হইল। কে যেন আমার অন্তরে বসিয়া উহার উত্তর যোগাইতেছিলেন। আমি পুলকিত মনে লিখিতে লাগিলাম। হল হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয় হযরত

আমাকে খাস করিয়া দোয়া করিয়াছেন। নয়তো আমার পক্ষে এই প্রশ্নের জওয়াব লিখা সম্ভব হইতনা। তবুও মনে কেমন এক প্রকার ভয় হইতে লাগিল কারণ যাহারা পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহারা সবাই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহারা নিশ্চয় আমার চেয়ে ভাল লিখিয়াছেন। মনে উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। সময় আসিল পরীক্ষার ফল বাহির হইল। শুনিতে পাইলাম আমিই প্রথম হইয়া পাশ করিয়াছি। আমার চাকুরী হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, হুজুরই আমার একমাত্র উছিলা। আমি আনন্দের সহিত শুকরিয়া আদায় করিলাম! আমি প্রায় সময় তাঁহার খেদমতে হাজির হইতাম। তাঁহারই দোয়ার বরকতে খোদার রহমতে কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি ইনস্‌পেক্টর পদে বরিত হই।

(২) সাব রেজিষ্ট্রারী পরীক্ষায় হযরতের রহমত বর্ষণ

ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর নিবাসী মওলানা মফজলুর রহমান সাহেব একদা বর্ণনা করেন, তিনি সাব-রেজিস্ট্রার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য হযরত আক্‌দাছের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দোয়া প্রার্থনা করেন। হযরত যথারীতি নাম পিতার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন। অতঃপর হযরত তাঁহার প্রতি একটু করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপে বলিলেন, "দোয়া করিলাম চলিয়া যাও।" তিনি সুনামের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাব-রেজিষ্ট্রার হইলেন। সেই অবধি তিনি হযরতের খেদমতে আসিতেন। অতি সম্মানের সহিত সুদীর্ঘকাল চাকুরী করিয়া ডিষ্ট্রিক রেজিষ্ট্রার পরে ইনস্‌পেক্টর পদে উন্নীত হইয়া অবসরপ্রাপ্ত হন। এইভাবে বহু লোক হযরতের দোয়ার জন্য দৈনিক তাঁহার দরবার পাকে আসিতেন এবং খোদার রহমতে সফলকাম হইতেন।

হযরতের অনুগ্রহে আক্রম আলী চৌধুরীর সন্তান লাভ

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত মিরশ্বরাই থানার হাইদকান্দি নিবাসী জনাব আকরম আলী চৌধুরী সাহেবের সন্তানাদি ভূমিষ্ট হইয়া শিশুকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইত। তিনি নানাবিদ চেষ্টায় বিফল হইয়া একদা হযরতের দরবারে প্রার্থনা জানাইলেন। সেই সময় একজন লোক হযরতের খেদমতে একখানা ইক্ষু হাদিয়া লইয়া হাজির হইলেন। তিনি ইক্ষুখানা লইয়া নিজ পায়ের নীচে দিয়া তিন টুকরা করিয়া লইলেন। আগা ও গোড়ার দুই টুকরা দুইজনকে দিয়া মধ্যের টুকরা আকরম আলী চৌধুরী সাহেবকে দিলেন এবং বলিলেন "যাও, মিঞা মধ্যেরটি দিলাম। খাইয়া ফেল। আমি দোয়া করিলাম।" মধ্যেরটি টুকরা অর্পণ করার রহস্য তিনি বুঝিলেন না। চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। বিবিকে ইক্ষুখানা দিয়া হযরতের অর্পিত তবারোক খাইতে বলিলেন। কিছুদিন গত হইলে তাহার এক সন্তান হইল। দেশীয় প্রথা অনুযায়ী মেয়েলোকেরা তাহার কপালে সোনাচান্দির দাগ বসাইল। গ্রাম্য মেয়ে লোকেরা ইহাকে তৎকালীন মৃত্যুবরণ পদ্ধতি বলিয়া মনে করিত। চৌধুরী সাহেবের মনতো ভাঙ্গা। ছেলে বাঁচিবার আশাতো নাই। তবুও হযরতের দোয়ায়

আশ্বস্ত হইয়া সাধারণ খরচে ছেলের নাম রাখিলেন, মোহাম্মদ ইছমাইল। ইছমাইল নিরাপদে বড় হইতে লাগিল। ইহার পর পর আরো দুইটি ছেলে জন্ম হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, কেন হযরত তাহাকে ইক্ষুর মধ্যের টুকরা দিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি পূর্ণ আশ্বস্ত হইলেন যে, খোদার রহমতে ইছমাইল দীর্ঘায়ু হইবে। হযরতই তাহাকে উক্ত সন্তান দান করিয়াছেন। তাহার বিবি সাহেবাও হযরতের উক্ত ঘটনা শুনিয়া খোদার নিকট শুকরিয়া আদায় করিলেন। তাহারা উভয়ে হযরতের খেদমতে আসিতেন। ইছমাইল যখন কুড়ি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন তাহার মাতাপিতা তাহাকে হযরতের এই ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, "তুমি আমাদের হযরতের অর্পিত একমাত্র সন্তান; তোমার উপরই খোদার কৃপায় আমাদের সুখশান্তির আশা। তুমি হযরতের পবিত্র খেদমতে হাজির হইয়া দোয়া হাছিল কর।" চৌধুরী ইছমাইল সাহেব বলেন যে, মাতাপিতার এই আদেশ পালনে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহিত ও আনন্দিত মনে হযরতের ওফাতের ছয় বৎসর পূর্বে তাঁহার খেদমতে হাজির হন। এ'যাবত প্রায় সময় প্রতি ওরশ শরীফেই তিনি উপস্থিত হন। মির্জাপুরী হাফেজ সাহেবও উহার কিছুদিন পরে তাহাদের উপস্থিতিতে হযরতের খেদমতে হাজির হন। সেই সময় পটিয়ার কাঞ্চননগরী মওলানা আহমদ ছফা হুজুরের খাদেম ছিলেন এবং হযরত বাবাজান কেবলা মওলানা সৈয়দ গোলাম রহমান সাহেব (কঃ) ছায়েরে রত ছিলেন। মওলানা মিঞা হোসেন ও সৈয়দ মিঞা তাহার পরে দরবারে হাজির হন। তিনি হযরতের হাতে "দস্তবায়েত" গ্রহণের অনেক মিনতি ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। হযরত তাহাকে "দস্তবায়েত" করেন নাই। তিনি যেন মনঃক্ষুন্ন হইয়া পড়িলেন। মওলানা আহমদ ছফা সাহেব তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, হযরত আক্দাছের নিকট যাহারা আসেন তাহারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন, তাহাদের "দস্তবায়েতের" এমন কোন বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বিনা বায়াতে হযরত ফয়েজ দানে কলব জারীতে সক্ষম এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব সর্বত্র বিরাজমান। কলব জারী করাই ইছমাইল চৌধুরীর একান্ত আশা ছিল। হযরতের সামনে আসিলেই সরবত বা চা পান করাইয়া দিতেন। হযরত চা ও সরবতে অত্যধিক অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা বাড়িতে থাকে কিন্তু কল্‌ব জারী হইত না। তিনি বলিয়াছেন হযরতের খেদমতে শরীক হওয়ার তিন বৎসর পরে একদা শ্রাবণ মাসে কাজকর্ম সারিয়া শয়ন করিয়াছেন এমন সময় তাহার কলবে যেন এক অপূর্ব আলোড়ন আরম্ভ হইল। তিনি ভয়ানক অস্থির ও ভীত হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তাহার হৃদয়ে ভয়ানক কম্পন আসিয়া সমস্ত শরীর আলোড়িত হইতে লাগিল। মওলানা আহমদ ছফার উপদেশ ক্রমে তিনি হযরত আক্দাছের চেহারা মোবারক স্মরণে রাখিয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ কম্পন কমিয়া আসে। সেইদিন হইতে তাহার কল্‌ব জারি হয়।

তবারোক মারফত সন্তান দান

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ধলই নিবাসী জনাব ফয়েজ আহমদ চৌধুরী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেনঃ- চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পাঁচলাইশ থানার মোহরা গ্রাম নিবাসী সাবরেজিষ্ট্রার

জনাব আবদুল লতিফ খান সাহেব অপুত্রক ছিলেন। তিনি একদিন হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) পবিত্র খেদমতে হাজির হইয়া সন্তান লাভে মিনতি সহকারে দোয়া প্রার্থনা করিলেন। হযরত তাহাকে তিনটি তবারোক দিয়া বলিলেন, তোমাকে তিনটি ফুল অর্পণ করিলাম। তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পর ক্রমান্বয়ে তাহার তিন জন ছেলে ভূমিষ্ট হয়। খোদার কৃপায় তিন ছেলেই বাঁচিয়া রহিল। তাহার বড় ছেলের নাম জনাব এ, কে, খান, মধ্যম ছেলের নাম জনাব এম, আর খান ও কনিষ্টের নাম জনাব এস এইচ খান। তাহারা প্রত্যেকেই মানব সমাজে সুপরিচিত। এবং জনাব এ, কে, খান সাহেব বিদ্যাবুদ্ধিতে ও ধনজনে পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত ও খ্যাত।

মুর্দাদের প্রতি হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও দয়া

কোন কোন সময় দেখা যাইত হযরত কেবলা তাঁহার বাড়ীর উত্তর দিকস্থ দমদমা নামক কবরস্থানে উপবিষ্ট থাকিতেন। এমন কি রাত্র নিশিযোগেও তিনি নিঝুম নির্জন কবরস্থানে বসিয়া থাকিতেন। অত্র এলাকায় বিষধর সর্প ও অত্যাচারি জ্বিনদের বিশেষ প্রকোপ ছিল। প্রদীপ ও লাঠি ছাড়া লোকজন সন্ধ্যাকালে বাহিরও হইত না। আর হযরত সাহেব রাত্রের ঘোর অন্ধকারে বর্ষার ঝড় তুফানে, সাপ, জ্বিনে কোন প্রকার ভয় না করিয়া, যে কোন কবরস্থানে চলিয়া যাইতেন। একদিন গভীর অন্ধকার রাত্রে হযরতের মধ্যম ভ্রাতা জনাব মরহুম আবদুল হামিদ সাহেব যিনি ছোট মওলানা আমিনুল হক সাহেবের পিতা হন দাওয়াত উপলক্ষে কোন বাড়ীতে গিয়াছিলেন। কারণ বশতঃ তথায় তাহার রাত গভীর হইয়া যায়। তিনি দুইজন সঙ্গীসহ দমদমার নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া আসিতেছিলেন। দমদমা কবরস্থানে হযরতকে একা বসা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি হযরতকে বলিলেন, "আপনি এমন গভীর রাত্রে একা এই নির্জন কবরস্থানে কেন বসিয়া রহিয়াছেন। আপনি তো জানেন এখানে জ্বিনে কত লোকজন নষ্ট করিয়াছে। তদুপরি বিষধর সর্প ইত্যাদি চলাচলও এখানে অনেক বেশী। মানুষ প্রদীপ লইয়া চলাফেরা করিতে পারিতেছেনা, অথচ আপনি অন্ধকার এই নিশি রাত্রে এখানে বসিয়া আছেন। চলুন বাড়ী যাই।" হযরত উত্তর করিলেন, "ভাই সাহেব! আপনি কোন ভয় করিবেন না। আপনি যাহাদের ভয় করিতেছেন, তাহারা আমার অনুগত। তাহারা আমার আদেশ মানিতে বাধ্য। এই কবরস্থানের মুর্দাদের চিৎকারে আমি ঘরে থাকিতে পারিতেছিনা তাই আমি তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি। আপনি চলিয়া যান ভয় পাইবেন না।"

হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবের পরিচয়

(১) আলমে বরজখ বা রূহানী জগতে হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব এত বেশী ছিল যে, হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক নজরে ছিলেন।

হযরতের পার্শ্ববর্তী বাড়ীর মরহুম মওলানা আবদুল হাকিম সাহেবের কবরের উপর একটি গর্জন গাছ ছিল। উহা রওজা শরীফের পূর্বপার্শ্বস্থ পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উঠিয়া ছিল। হযরত! হারিচাঁন্দ নামক তাঁহার এক প্রতিবেশী ভক্তকে গাছটি কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। গাছটি যখন কাটা হইল তখন মওলানা আবদুল হাকিমের পুত্র ছিদ্দিক আহমদ গাছ পড়ার শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আসে। সে হারিচাঁন্দকে রুক্ষ ভাষায় বলিতে লাগিল, "কি হে! আমার অনুমতি ছাড়া গাছটি অনর্থক কাটিলে কেন?" হারিচাঁন্দ উত্তরে বলিলেন, "ভাই আমার কোন অপরাধ নাই। আমি ফকির মওলানা সাহেবের নির্দেশ পালন করিতেছি মাত্র।" তখন ছিদ্দিক আহমদ রাগান্বিতভাবে বলিয়া উঠিল মওলানা সাহেবের ফকিরি আমার গাছের উপর আসিল কেন? ইহা শ্রবণে হযরতের জজ্‌বাতী হাল অত্যন্ত গালেব হইয়া উঠিল। তিনি রহস্য না বলিয়া পারিলেন না। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন। "আরে কমবখত। তোর বাবার দুই কানে দুইটি বিছা ঝুলিয়া রহিয়াছে তাইতো আমি ইহা কাটিয়াছি। আমি তো ভালই করিয়াছি। তাহাতে উহা দমন হইয়া গিয়াছে। আর তুমি বলিতেছ আমি তোমার খারাপ করিয়াছি। দূরহ হারামজাদা এখান হইতে দূরহ।" ছেলেটি বাড়ীতে চলিয়া গেল। বাড়ী যাওয়ার পর উক্ত ছিদ্দিক আহমদের প্রবল জ্বর আসে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার জবান বন্ধ হইয়া যায়। দিন দিন অবস্থার অবনতি দেখিয়া তাহার মাতা তাহাকে হযরতের বিবি সাহেবানীর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং হযরতের নিকট ভুল ও বেয়াদবির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া ক্ষমা লইয়া দিতে অনুরোধ জানায়। হযরতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দোয়া প্রার্থনা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "তীর কামটা হইতে ছাড়িয়া গেলে আর ধরা যায় না।" ফলে কিছুদিন পরে উক্ত ছিদ্দিক আহমদের মৃত্যু ঘটে।

(ক) একদা সকাল বেলায় সম্মুখস্থ পুকুরের পশ্চিম পাড়ে হযরত আক্‌দাছ বসিয়াছিলেন। হযরতের চারিদিকে হাজতী মক্‌ছুদী ও ভক্তবৃন্দের ভীড় ছিল। এমন সময় আজিম নগর নিবাসী ছুফী আবদুর রহমান সাহেব হযরতের খেদমতে এক "হাউত্তা" (দুধের ভান্ড) দুধ লইয়া উপস্থিত হয়। আবদুর রহমান ছুফী বলিয়াছেনঃ- আমি যখন দুধের পাত্রটি হযরতের সামনে রাখিয়া কদমবুচি করিলাম, তখন হযরত আমাকে আদেশ দিলেন "মিয়া আবদুর রহমান! দুধগুলি আমার "আবতাবায়" (লোটায়) ঢালিয়া দাও" আমি আদেশ মত তাহাই করিলাম। তখন দক্ষিণ পশ্চিম দিকে জোড়াজুড়ি দুইটি আমগাছ ছিল। গাছ দুইটির প্রতি হযরত তাকাইয়া বলিলেন, "এই দুধগুলি" নিয়া কিছু উহাদের গোড়ায় ঢালিয়া দাও, বাকী সব নিয়া আস।" আমি কিছু দুধ আম গাছের গোড়ায় ঢালিয়া দিয়া বাকী দুধ লোটা সহ হযরতের সামনে রাখিয়া দিলাম। তখন হযরতের চেহেরা মোবারক অত্যন্ত লালবর্ণ জ্বালালিতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, "দুধগুলি তোমার হাউত্তায় (ভান্ডে) ঢালিয়া লও।" আমি তাহাই করিলাম। তৎপর একজন খাদেমকে আদেশ দিলেন "এইগুলি সৈয়দ সাহেবের বেটিকে দিয়া আস।" হযরতের পুত্রবধু জনাব শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের মাতাজানকে হযরত সৈয়দের বেটি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি মির্জাপুরের মওলানা সৈয়দ মছিহুল্লাহ সাহেবের কন্যা ছিলেন। একজন খাদেম দুধগুলি ঘরে দিয়া

আসিলেন। হযরত গাছ দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঞা আবদুর রহমান! তোমকো মালুম হ্যায়? ইয়ে দোন কওন হেঁ!" তোমার কি জানা আছে, এই দুইজন কে? আমি অতি ভীত মনে উত্তর করিলাম হুজুর, আমগাছ। তখন হযরত জজ্‌বাতী অবস্থায় বলিয়া উঠিলেন "নেহী মিঞা বাবা আদম হ্যায়। বহুত দিন তক মোন্তাজের খাড়া হ্যায়। ইছ ওয়াস্তে উছ্‌কা চুতড় পর দো কাত্‌রে পানি দিয়া।" না মিঞা! বাবা আদম (আঃ) অনেক দিন তক অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাই তাঁহার নিতম্বে দুই ফোটা পানি দিলাম। তিনি আবার আমাকে বলিলেন, "মিয়া আবদুর রহমান। মওলানা মখলছুর রহমান সাহেব কো পয়ছানতা হ্যায়? আমি বলিলাম, হুজুর নাম শুনিয়াছি কিন্তু কখনও যাই নাই। হযরত বলিতে লাগিলেন, "মিঞা একদিন আমি তাহার নিকট পড়িতে যাইতেছিলাম। গোলেস্তা ও বোস্তা কেতাব দুইটি আমার বগলে ছিল। যখন নৌকায় উঠি নৌকায় দুইজন জোয়ান মাথায় কাল চুল তাহারা নৌকাকে হেলাইতে লাগিল। যাহাতে নৌকাখানা পানিতে ডুবিয়া যায়। আমি তখন দুইজনকে দুই থাপ্পড় লাগাইয়া দিলাম। দেখি তাহারা পানিতে ডুবিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আবদুর রহমান তুমি কি জান তাহারা কোথায় গেল? আমি নীরব রহিলাম। হযরত বলিলেন, পরে দেখি ঐ দুইজনই মওলানা সাহেবের দরজাতে দুইটি কুত্তা হইয়া খাড়া রহিয়াছে। যাহাতে কোন লোকজন তথায় যাইতে না পারে। আমি উভয়কে লাঠি দিয়া তাড়াইয়া দিলাম।"

"আবদুর রহমান! তুমি টিপু সুলতানের মসজিদ চিন?" আমি বলিলাম, হুজুর। কলিকাতায় মাটিয়া বুরুজে বলিয়া শুনিয়াছি। হযরত বলিলেন, "মিঞা! দেখিতেছি, এই দুই হারামজাদা সেই মসজিদের দরজাতে দুইটি ব্যাঘ্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! লোকের কি সাধ্য মসজিদে ঢুকে। আমি উভয়কে আমার লাঠি দিয়া জোরে প্রহার করিলাম। তাহারা চিৎকার করিয়া ভয়ে পালাইয়া গেল। "তিনি তাঁহার দক্ষিণ হাত দিয়া দক্ষিণ পাশে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "তুমি এই রাস্তা দিয়া বাড়ী চলিয়া যাও।" বাম পাশে নির্দেশে বলিলেন, "এই রাস্তায় যাইওনা। নিজ ঘরে গিয়া কোরান শরীফ তেলাওয়াত কর, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর। কোথাও যাইওনা। এইখানে একটি বাজার হওয়ার আছে। তুমি এইখানে আসিওনা।" এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিয়া খাড়া হইলেন। আবার আমাকে ডাকিলেন। আমি নিকটে গেলাম। তিনি তাঁহার বাম হাত দিয়া আমার ঘাড় শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার কপাল মোবারকের সাথে আমার কপালকে লাগাইতে চেষ্টা করিলেন। ভয়ে আমার সমস্ত শরীরের কম্পন আরম্ভ হইল। হযরত যেন তাহা অনুভব করিয়া আর কপালে লাগাইলেন না। তাঁহার দক্ষিণ হাতের শাহাদত আঙ্গুলী দিয়া আমার কপালে কি যেন লিখিয়া দিলেন।

আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আদেশ দিলেন, "যাও মিঞা! আপনা ঘরে বসিয়া থাক।" সেইদিন হইতে ঘরেই বসিয়া থাকি। জায়নাজা, জুম্মার নামাজ বা নিতান্ত দরকারী কাজ ছাড়া ঘর হইতে বাহির হই না।

পূর্বে আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বর্তমানে খোদার ফজলে তাঁহার অপার অনুগ্রহে আমার জায়গা জমি হালচাষ ও গৃহস্থিতে ভরপুর। গোলাভরা ধান, যথেষ্ট

আসিলেন। হযরত গাছ দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঞা আবদুর রহমান! তোমকো মালুম হ্যায়? ইয়ে দোন কওন হেঁ!" তোমার কি জানা আছে, এই দুইজন কে? আমি অতি ভীত মনে উত্তর করিলাম হুজুর, আমগাছ। তখন হযরত জজ্‌বাতী অবস্থায় বলিয়া উঠিলেন "নেহী মিঞা বাবা আদম হ্যায়। বহুত দিন তক মোন্তাজের খাড়া হ্যায়। ইছ ওয়াস্তে উছ্‌কা চুতড় পর দো কাত্‌রে পানি দিয়া।" না মিঞা! বাবা আদম (আঃ) অনেক দিন তক অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাই তাঁহার নিতম্বে দুই ফোটা পানি দিলাম। তিনি আবার আমাকে বলিলেন, "মিয়া আবদুর রহমান। মওলানা মখলছুর রহমান সাহেব কো পয়ছানতা হ্যায়? আমি বলিলাম, হুজুর নাম শুনিয়াছি কিন্তু কখনও যাই নাই। হযরত বলিতে লাগিলেন, "মিঞা একদিন আমি তাহার নিকট পড়িতে যাইতেছিলাম। গোলেস্তা ও বোস্তা কেতাব দুইটি আমার বগলে ছিল। যখন নৌকায় উঠি নৌকায় দুইজন জোয়ান মাথায় কাল চুল তাহারা নৌকাকে হেলাইতে লাগিল। যাহাতে নৌকাখানা পানিতে ডুবিয়া যায়। আমি তখন দুইজনকে দুই থাপ্পড় লাগাইয়া দিলাম। দেখি তাহারা পানিতে ডুবিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আবদুর রহমান তুমি কি জান তাহারা কোথায় গেল? আমি নীরব রহিলাম। হযরত বলিলেন, পরে দেখি ঐ দুইজনই মওলানা সাহেবের দরজাতে দুইটি কুত্তা হইয়া খাড়া রহিয়াছে। যাহাতে কোন লোকজন তথায় যাইতে না পারে। আমি উভয়কে লাঠি দিয়া তাড়াইয়া দিলাম।"

"আবদুর রহমান! তুমি টিপু সুলতানের মসজিদ চিন?" আমি বলিলাম, হুজুর। কলিকাতায় মাটিয়া বুরুজে বলিয়া শুনিয়াছি। হযরত বলিলেন, "মিঞা! দেখিতেছি, এই দুই হারামজাদা সেই মসজিদের দরজাতে দুইটি ব্যাঘ্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! লোকের কি সাধ্য মসজিদে ঢুকে। আমি উভয়কে আমার লাঠি দিয়া জোরে প্রহার করিলাম। তাহারা চিৎকার করিয়া ভয়ে পালাইয়া গেল। "তিনি তাঁহার দক্ষিণ হাত দিয়া দক্ষিণ পাশে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "তুমি এই রাস্তা দিয়া বাড়ী চলিয়া যাও।" বাম পাশে নির্দেশে বলিলেন, "এই রাস্তায় যাইওনা। নিজ ঘরে গিয়া কোরান শরীফ তেলাওয়াত কর, আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর। কোথাও যাইওনা। এইখানে একটি বাজার হওয়ার আছে। তুমি এইখানে আসিওনা।" এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিয়া খাড়া হইলেন। আবার আমাকে ডাকিলেন। আমি নিকটে গেলাম। তিনি তাঁহার বাম হাত দিয়া আমার ঘাড় শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার কপাল মোবারকের সাথে আমার কপালকে লাগাইতে চেষ্টা করিলেন। ভয়ে আমার সমস্ত শরীরের কম্পন আরম্ভ হইল। হযরত যেন তাহা অনুভব করিয়া আর কপালে লাগাইলেন না। তাঁহার দক্ষিণ হাতের শাহাদত আঙ্গুলী দিয়া আমার কপালে কি যেন লিখিয়া দিলেন।

আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আদেশ দিলেন, "যাও মিঞা! আপনা ঘরে বসিয়া থাক।" সেইদিন হইতে ঘরেই বসিয়া থাকি। জায়নাজা, জুম্মার নামাজ বা নিতান্ত দরকারী কাজ ছাড়া ঘর হইতে বাহির হই না।

পূর্বে আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বর্তমানে খোদার ফজলে তাঁহার অপার অনুগ্রহে আমার জায়গা জমি হালচাষ ও গৃহস্থিতে ভরপুর। গোলাভরা ধান, যথেষ্ট

ক্ষেত। আখ ক্ষেতেই বৎসরে আমার হাজার দুই হাজার টাকা রোজগার হয়। আমার ছেলেরা এই সমস্তের তত্ত্বাবধান করিয়া অনেক রুজি করে। ছেলেমেয়েদের লইয়া পরম সুখে আল্লাহ্‌র মেহেরে দিন কাটাইতেছি। আমি এখন বৃদ্ধাবস্থায় পড়িয়াছি। মৃত্যু হয়তো সন্নিকটে। নাজানি হযরতের কোন আদেশ লংঘন হইয়া যায়। আমি এখনও পাড়ার ছেলে মেয়েদের কোরান শরীফ শিক্ষা দিই এবং নিজে কোরান পাঠ করি।

আপনি আমার পীরের আওলাদ এবং সকলের চেয়ে প্রিয়তম। দয়া করিয়া আপনি আমার হযরত আক্‌দাছের খেদমতে আমার জন্য সুপারিশ করিবেন। যাহাতে পরকালে আমার মুক্তি হয়। উক্ত ঘটনা বর্ণনাকারী ছুফী আবদুর রহমান সাহেব, মওলানা শাহ্‌ ছূফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মিঞা সাহেবের নিকট উহা বর্ণনা দেন।

হযরতের এই সমস্ত জজ্‌বাতি কালামের রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, হযরত এক একটি উদাহরণ দিয়া উহার মূল রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন! "মোখলেছুর রহমান" দয়াময়ের খালেছ মহব্বতের স্থান। যাহাতে আল্লাহতালাকে বিনা স্বার্থে মহব্বত করা যায়।, "গোলস্তান" ও "বোস্তান" প্রেমধারা তরীকত পদ্ধতী। যাহা উক্ত স্থানে পৌছিবার সম্বল। নৌকা! নিজদেহ বা মানব তরণীকে নির্দেশ করিতেছেন। কালচুল ধারী জোয়ান বলিষ্ঠ নফ্‌ছ শয়তানকে বুঝাইতেছে। যাহা মানবকে বিপথগামী করিয়া নিম্নস্তরে পৌছাইয়া দেয়। টিপু সুলতানের মসজিদ যেখানে আল্লাহকে একাগ্রচিত্তে সেজদা করা যায় বা আল্লাহকে পাওয়ার স্থান, অর্থাৎ অলিউল্লাহগণকে বুঝাইতেছেন, ব্যাঘ্র শয়তানের প্রবল বাধাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। দক্ষিণরাস্তা ছেরাতুল মোস্তাকীম মুক্ত বাধাহীন রাস্তাকে নির্দেশ করিতেছেন বলিয়া বুঝা যায়। তাঁহার কালামে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি উক্ত পথের প্রবল বাধা ও কন্টককে দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার পার্থিব তছর্‌রোপ ও প্রভাবের ইঙ্গিত।

হযরতের বেলায়তি প্রভাবে অযোগ্যকে যোগ্যতা দান

রাউজান নয়াপাড়া নিবাসী ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেব বলেন ঃ- "আমার পিতা হেকিম নূরুজ্জমান সাহেব হযরত কেবলা কাবার কামালিয়ত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খেদমতে আসিয়া তাঁহার নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। আমার পিতা সাহেব নিতান্তই সোজা ও অল্পজ্ঞানী লোক ছিলেন। কয়েক বৎসর পর হযরত তাহাকে হেকিম সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন এবং হেকিমী চিকিৎসা করিতে আদেশ দিলেন। তিনি হযরত সাহেবকে বলিলেন, হুজুর! আমিতো কিছুই জানিনা। ঔষধ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা আমি জীবনে কাহাকেও কোন দিন পানি পড়া পর্যন্ত দিই নাই। কি করিয়া হেকিমী চিকিৎসা করিব। হযরত বলিলেন "যাও মিঞা তুমি সব জান। তোমার খোদাও সব জানেন। তিনি উম্মিকে জ্ঞান দান করেন।" অতঃপর আমার পিতা সাহেব বাড়ীতে গেলেন। তাহার বাড়ী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের জন্য লোকজন আসিতে আরম্ভ করিল। তিনিও অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত ঔষধ দিতে লাগিলেন। যেই সময় যাহা দরকার চিন্তা করার আগেই যেন তাহা তাহার বিবেকে আসিয়া যাইত। কোন

অভিজ্ঞ হেকিম যেন তাহার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে অভিজ্ঞতা যোগাইতেছেন। তাহার কোন রোগী ঔষধ নিয়া বিফল মনোরথ হইতে শুনি নাই। ক্রমে অল্পদিনের মধ্যে তাহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অনেক ডাক্তার কবিরাজ পর্যন্ত পরামর্শের জন্য তাহার নিকট আসিতেন। তাহার আরও একটি বুজুর্গী চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। কাহারো কোন কিছু হারাইয়া গেলে বা চুরি হইলে খবর দিয়া দিতেন। ইহা যেন তিনি কশ্‌ফ দ্বারাই করিতেন। আমার পিতা ছাহেবের অন্য কোন উপার্জন ছিল না। একমাত্র হেকিমী চিকিৎসাতেই তিনি পারিবারিক সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াও বাইশ কানি জমি খরিদ করিয়া ছিলেন। তাহার ওফাতের পূর্বে চারিকানি জমি রাখিয়া বাকী জমি তাহার ভাইদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। ইহাতে আমি আপত্তি করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, "খোদা-ই-রজ্জাক" রিজিক তাঁহার নিকটেই চাও। তিনি সবকিছুই দিবেন।" তারপর আমার পিতা ওফাতের পর হইতে আমি হেকিমী চিকিৎসা করিয়া খোদার কৃপায় অতিসুখে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছি।

"কলা-মারফত জাফর আলী শাহ্‌কে 'কশ্‌ফ' শক্তিদান"

শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বর্ণনা করেন:- নিম্নোক্ত ঘটনাবলী-জিয়াউল হোসাইন মিঞাজি ও তাঁহার দাদী আম্মা হযরত সাহেবানীর মুখে শুনিয়াছেন যে, সাতকানিয়া নিবাসী জাফর আলী নামক হযরতের এক ভক্ত তাঁহার খেদমতে আসিতেন। হযরত কেবলার বেলায়ত প্রচারের প্রথমাবস্থায় এক রাত্রে প্রতিবেশী মোয়াজ্জেন ছায়াদ উল্লাহকে হযরত একটি পাকা কলা খাইতে বলিলেন। তিনি নিজ কাশি রোগের শেকায়েত করিয়া ঠাণ্ডা রাত্রে কলা খাইতে অস্বীকার করিলেন। হযরত বাহিরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "এখানে কে আছে?" উক্ত জাফর আলী করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হুজুর আমি বান্দা জাফর আলী আছি।" হযরত আবার ছায়াদ উল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন এই কলাটি আপনার জন্য রাখিয়াছিলাম, এখন জাফর আলী চাহিতেছে; তাঁহাকে দিব কি?" মোয়াজ্জেন সাহেব বলিলেন, "হুজুর দিয়া দেন। আমি ঠাণ্ডার সময় কলা খাইতে পারিব না।" হযরত কলাটি জাফর আলীকে দিয়া দিলেন। জাফর আলী উক্ত কলাটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাল ও জজ্‌ব গালেব হয়। অতঃপর হযরত আন্দর হুজুরায় চলিয়া যান। জাফর আলী সারারাত অত্যন্ত মস্তি ও জজ্‌বা হালতে বকাবকী করেন এবং সকাল হইতেই আগত হাজতী মকছুদীগণের হাজত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে থাকেন। একজন লোক হযরতের খেদমতে নিজ সন্তানের রোগ মুক্তির প্রার্থনা লইয়া আসে।

জাফর আলী তাহাকে দেখিয়াই তাহার সন্তানের মৃত্যু সংবাদ দেন। ইহাতে লোকটি হযরতের সমীপে কাঁদিয়া পড়ে। হযরত দেখিলেন ঠিকই সন্তান মারা গিয়াছে। হযরত জাফর আলীকে হিজরত করিতে আদেশ দেন এবং বলেন, "জাফর আলী এইরূপ বলিওনা; এমন কথা বলা নিষেধ।"

জাফর আলী হিজরত করিবার সময় পার্শ্ববর্তী বাড়ীর জিয়াউল হোসাইনকে বলিলেন, "দেখ জিয়াউল হোসাইন, তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি আমাকে খানাপানি ও জরুরী দ্রব্যাদি দিয়া প্রায় সময় সাহায্য করিয়া থাক। তদুপরি বাবাও তোমাকে ভালবাসেন। আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। তুমি বল, হে জাফর আলী শাহ্! বাবা তোমাকে যেইরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তুমি আমাকেও ঐরূপ করিয়া দাও। কারণ উহা না চাহিলে হয়না। চাহিতে হয়!" জিয়াউল হোসাইন তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল, "আপনার কাছে একটি থলিয়া, একটি লাঠি ও একটি লোটা এইতো।" জাফর আলী বলিলেন, "যাহা আছে সাত বাদশাহর কাছেও তাহা নাই। আমি বাবার রঙ্গিন দরিয়ায় ডুব দিতে শিখিয়াছি। এবং নিজেকে রঙ্গিন করিবার কৌশল জানি। তোমাকে দিয়া দিলে উহা কমিবেনা বরং আমি ডুব মারিয়া উহা পূরণ করিয়া নিব। তোমার কপালে যে দুইটি চক্ষু আছে, অন্তরেও সেইরূপ দুইটি চক্ষু আছে। তুমি যদি আমাকে বল, বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমার মুদ্রিত আন্তরিক চক্ষু দুইটি উন্মেলিত করিয়া দিব। তখন তুমি আমার মত দেখিতে পাইবে।" জিয়াউল হোসাইন বলিল "আপনার পথে আপনি চলিয়া যান। পাগলামী করিবেন না।" তবুও তিনি আফসোস করিয়া বলিলেন; "তুমি এখনও ছোট মানুষ, বুঝ হয় নাই।" এই বলিয়া তাহার থলিয়া হইতে দুইখানা খড়ম বাহির করিয়া জিয়াউল হোসাইনকে দিয়া বলিলেন, "দেখ তোমার যখন বুঝ হইবে এবং উহার কদর বুঝিতে পারিবে; তখন এই খড়ম দুইটির উপর দাঁড়াইয়া বলিও, হে আল্লাহ! তুমি এই খড়মের বরকতে জাফর আলী শাহ্ আমাকে যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দাও। তখন তুমি আমার মত হইয়া যাইবে। তোমার মাতাকে বলিও জাফর আলী প্রদত্ত এই খড়ম জোড়া যেন আতর মাখাইয়া-সাদা কাপড় বাঁধিয়া বাক্সে রাখিয়া দেয়।" জিয়াউল হোসাইন খড়ম দুইখানা ঘরে নিয়া তাহার মাতাকে না পাইয়া গোলার নীচে রাখিয়া দিল। জাফর আলী শাহ্ পুনঃ ফেরত আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খড়ম কি করিয়াছ!" সে বলিল, "গোলার নীচে রাখিয়া আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন, 'আরে কমবক্ত! তোমার কপালে নাই। আমি দিতে চাহিয়াছিলাম।' পরে তাহার মাতা শুনিয়া খড়ম দুইখানা তালাস করিয়া লইতে আদেশ দিলেন, তালাস করিয়া দেখে যে খড়ম দুইখানা যথাস্থানে নাই।

(১) "সাগর জলে হযরতের অসাধারণ প্রভাব ও খালের গতি পরিবর্তন

একদা হযরত বহু লোকজনসহ নাজিরহাট যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জিয়াউল হোসাইন মিঞাজি নামক তাঁহার প্রতিবেশী ও এক ভক্ত সাথী ছিলেন। নাজিরহাট যাইতে ধুরঙ্গখাল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ইহা একটি খরস্রোতা বারমাসি খাল ছিল। হযরত পথ চলিয়া খালের নিকটবর্তী হইতেই দেখিতে পাইলেন খালে প্রবল স্রোত। এই প্রবল স্রোতে তিনি খাল অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন। সঙ্গী জিয়াউল হোসাইন

তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "হুজুর! খালে স্রোত প্রবল। এইখানে পার না হইলে বোধ হয় ভাল হইত।" হযরত ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি জলস্রোতে নামিয়া পড়িলেন। জিয়াউল হোসাইনও অগত্যা তাঁহার পিছনে নামিয়া পড়িলেন। কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁহার পা মোবারক পিছলাইয়া গেল! ইহাতে হযরতের পরিধেয় কাপড় কিছু অংশ ভিজিয়া যায়। হযরত অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চেহারা মোবারক যেন রক্তের আভা দেখা দিল। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। তিনি স্বজোরে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেয়াদপ! হারামজাদী! বেয়াদপ! হারামজাদী!" বলিতে বলিতে তাঁহার হস্তস্থিত লাঠি দিয়া স্রোতের উপর স্বজোরে প্রহার করিতে লাগিলেন। জিয়াউল হোসাইন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। হযরত পিছন দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হারামজাদী বেয়াদপী করে, হারামজাদীকে পিটাইয়া দিয়াছি।" তৎপর পশ্চিম পার্শ্বে যাইয়া তাঁহার পাদুকা দিয়া আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "হারামজাদী দুর হও।"

ইহা সর্বত্র প্রচারিত যে, হযরতের এই ঘটনার পর হইতে ধুরঙ্গ খালের স্রোত অন্যদিকে বহিয়া গতি পরিবর্তন করতঃ হালদা নদীতে পতিত হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী খাল হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মৃতখালে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যায়। একদা আজিম নগর নিবাসী আবদুল মজিদ মিঞা নামক হযরতের এক আত্মীয়, বহুলোক সহ দেশবাসীর অনুরোধে হযরতের খেদমতে আসিয়া উক্ত খালের স্রোতগতি পূর্ববৎ দক্ষিণ মুখে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য কাতর নিবেদন জানাইতেই, হযরত তাহাকে উত্তর করিলেন, "হারামজাদী রছুল করিম (সঃ) এঁর সহিত বেয়াদপী করিয়াছে। কেন আবার ফিরিয়া আসিবে?" তিনি নবী করিম (সঃ) এঁর সর্বক্ষমতা ও গুণের প্রতীক ছিলেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই তিনি তাঁহার পবিত্র কালামে পরিচয় দিতেছেন। সে নবীর সঙ্গে বেয়াদবী করিয়াছে। এই পর্যন্ত দেখা যায় সে অনেক চেষ্টা, এমনকি বর্তমান গতিপথে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পাকা বাঁধ দিয়াও ধুরঙ্গ খালের গতি পূর্বের পথে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই।

(২) সাগর গর্ভে হযরতের প্রভাব ও শাহ্ কুলজামের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের নিদর্শন

নেজামপুরী মওলানা জনাব ফজলুল রহমান সাহেব দোয়া প্রার্থী হইয়া একবার হযরত আক্দাছের নিকট উপস্থিত হন। হযরত তাহাকে দুই আনা পয়সা হাতে দিয়া বলিলেন, মওলানা সাহেব, আমি যখন সাগর ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন তথায় আমার একবন্ধু, "শাহ্কুলজাম" হইতে দুই আনা পয়সা ধার নিয়াছিলাম আপনি তাহাকে এই পয়সাগুলি দিয়া দিবেন।"

মওলানা সাহেব হযরতের এই মোবারক কালামের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। "শাহ্কুলজাম" যে হযরতকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাদের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক

রহিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন না। সাগরবাসী প্রত্যেকেই যে হযরতকে ভক্তি করে অবনতশিরে মানে, সাগরও যে হযরতের বেলায়তী প্রভাবে পরিচালিত, তিনি যে তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মওলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই। হযরত পয়সার মারফত তাহাকে সাগর গর্ভে ক্ষমতার ইঙ্গিত দিলেন। পক্ষান্তরে তাহাকে হজ্ব করিবার ইঙ্গিত ও ক্ষমতা দান করিলেন। মওলানা সাহেব তো তাহা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মওলানা সাহেব হযরতকে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হুজুর! শাহ্কেুলজাম কোথায়। তাঁহাকে আমি কোথায় পাইব! আমি কি করিয়া এই আমানত আদায় করিব! হযরত উত্তর করিলেন "আপনি তাহাকে কুলজাম সাগরে পাইবেন!" শুধুমাত্র এই উত্তরটি করিয়া হযরত চুপ করিলেন। তিনি বিদায়ান্তে বাড়ী গমন করিলেন। কিন্তু বিষম চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া তিনি হযরতের এই মহান দায়িত্ব আদায় করিবেন। কোন উপায়ে তিনি শাহ্কেুলজামকে পাইতে পারেন। এমন অসম্ভব দায়িত্ব হযরত তাহার উপর চাপিয়া দিলেন, যাহা পরিশোধ করার কোন উপায়ই তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দিনরাত এই চিন্তায় রহিলেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হইল। পয়সা-দুই আনা তাঁহার সঙ্গে রইল, কোন উপায়ে এবং কোথায় সৌভাগ্যক্রমে শাহ্কেুলজামের সাক্ষাৎ পান। কিছুদিন পর তাহার মনে হজ্ব করিবার বাসনা জাগে।

তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কুলজাম সাগর পার হইয়া জিদ্দা যাইতে হয়। তিনি মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। "এইবার যদি আল্লাহ হজ্বে নেন তো, নিশ্চয় হযরতের আদেশ মত কুলজাম সাগরে শাহে্ কুলজামের দেখা পাইতে পারি। বোধ হয় হযরতের এই আমানতের উছিলায় শাহ্ কুলজামের সাক্ষাৎ আমার ভাগ্যে জুটিবে। এই জন্যই বোধ হয় হযরত পয়সা দুই আনা-দিয়াছেন। আমাকে নিশ্চয় তিনি হজ্বে যাইতেও সাহায্য করিতেছেন। এইবার নিশ্চয় আমানত শোধ করিতে পারিব।" তিনি দ্বিগুন উৎসাহে হজ্বের আয়োজন শুরু করিলেন।

হজ্বের সময় তিনি হজ্বে গেলেন। পয়সা-দুই আনা তাহার সঙ্গে আছে। কুলজাম সাগর অতিক্রম করিতে তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন অনেককে জিজ্ঞাসা করিলেন। কোথাও শাহ্ কুলজামের দেখা পাইলেন না। হজ্ব কার্য সমাধা করিয়া আসিবার পথেও অনেক চেষ্টা করিয়া শাহ্ কুলজামের দেখা পাইলেন না। এইবার তিনি হতাশ হইয়া নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। কি উপায় করেন। আল্লাহ্ পাক দর্শনের যাহা একটি উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তো ভাগ্য ফলিলনা। আমানত আদায় হইলনা। অন্য উপায়ে আদায় করিলে শাহ্ কুলজাম যদি গ্রহণ না করেন এবং হযরতও যদি নারাজ হন কি করিবেন। আশায় রহিলেন হাতে হাতে দিতে যখন নির্দেশ করিয়াছেন উপায়ও একটি করিয়া দিবেন। কয়েক বৎসর গত হইল। খোদার কৃপায় আবার তাহার হজ্বে যাওয়ার সুযোগ হইল। এবারও তিনি পুলকিত মনে পয়সা দুই আনা সঙ্গে লইয়া হজ্ব করিতে গেলেন। কুলজাম সাগর পার হইতে অনেক সন্ধান করিলেন। কিন্তু কুলজাম শাহের সন্ধান পাইলেন না। তিনি ভাবিয়া অস্থির হইলেন। দুইবার সুযোগ পাইয়াও শাহ্

কুলজামের দর্শন মিলিল না। তিনি চিন্তিত মনে হজ্ব করিতে চলিয়া গেলেন। যথারীতি হজ্বকার্য সমাপন করিয়া আসিবার পথে আবার চেষ্টা করিলেন। কোথাও কোন নিশান পাইলেন না। অবশেষে জাহাজে উঠিয়া গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, এক অতীব সুন্দর দীর্ঘকায় তাহার প্রতি হাত পাতিয়া বলিতেছেন-"হাজী সাহেব! আপনার নিকট আমার অনেক দিনের দুই আনা পয়সা রহিয়াছে, দিয়া দেন তো!" ইহা দর্শনে ও শ্রবণে অবাক চিত্তে পকেটে হাত দিয়া পয়সা দুই আনা বাহির করিয়া দিলেন এবং আগাগোড়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া লইলেন। পয়সাগুলি হাতে লইয়া তিনি বলিলেন, "হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীকে আমার সালাম দিবেন।" উহা বলিয়া তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বহুদিন পরে তিনি হযরতের আদেশ পালনে সক্ষম হইয়া খোদার দরবারে শুকরিয়া আদায় করিতে লাগিলেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন হযরতের পয়সা দুই আনার বদৌলতে তাহার দুইবার হজ্ব করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

(১) হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে এক রাতে মক্কা শরীফ হইতে চট্টগ্রাম শহরে হাজীর প্রত্যাগমন

চট্টগ্রাম, নানুপুর নিবাসী সৈয়দ খায়ের উদ্দিন ডাক্তার সাহেবের একজন বন্ধু, কা'বা শরীফ হজ্ব করিতে গিয়াছিলেন। হজ্ব সমাপন করিয়া হাজীগণ বাড়ীতে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি টাকা পয়সা খরচ হইয়া যাওয়ায় বাড়ীতে ফিরিতে অসমর্থ হইয়া চিন্তিতভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সঙ্গী হাজীগণ হইতে সাহায্যের চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরত হন। অবশেষে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি আরবী ভাষা না জানায় মনের ভাব কাহারো নিকট ব্যক্ত করিতেও অপারগ। অবশেষে তিনি বোবার মত ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অসীম কষ্টে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল। তিনি বিপদতারণ মহাপ্রভুর স্মরণ লইলেন। তিনি বিশেষ মিনতির সহিত খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, "হে করুণাময়! বিশ্বে যদি তোমার কোন মহান মাহবুব থাকেন, জামানার দুঃখ নিবারক ক্ষমতাবান তোমার কোন প্রিয় বন্ধু যদি জগতে থাকেন তবে তাঁহারই উছিলায় তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমাকে দেশে ফিরিবার উপায় করিয়া দাও। তুমি ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই। প্রভু হে! তোমার প্রিয় হাবিব নবীর রওজা মোবারকে জেয়ারত করিতে আসিয়া এবং তোমারই পবিত্র কা'বাগৃহ তাওয়াফ করিতে আসিয়া যদি কোন ভুলত্রুটি করিয়া থাকি, প্রভু তাহা ক্ষমা কর।" আল্লাহতা'লা তাহার প্রার্থনা কবুল করিলেন! পরদিন সন্ধ্যায় তিনি নির্জনে ঘুরিতেছিলেন, এমন সময় মাইজভাণ্ডারী মওলানা জনাব হযরত আহমদ উল্লাহ (কঃ) সাহেবকে তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত এবং আহলাদিত হইলেন। পুলকে যেন তাহার শক্তি শতগুণ বাড়িয়া গেল। তছলিমাত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ- "হুজুর আপনি কখন মক্কা শরীফ আসিয়াছেন।" উত্তরে তিনি বলিলেন যে তিনি হজ্বের পূর্বে আসিয়াছেন। আমার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি মর্মাহত হইলেন! এবং সঙ্গী হাজীগণের সহিত চলিয়া না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অকপটে আমার দুরাবস্থার কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তিনি আমার প্রতি দয়াদ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "ভাই সাহেব! আর কোন চিন্তা নাই আমার সঙ্গে আসুন। আল্লাহতা'লা

নিরাপদে আপনাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবেন।" এই কথা বলিয়া তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। আমিও আনন্দিত মনে তাঁহার পিছনে চলিতে আরম্ভ করিলাম। মাগরিবের নামাজের সময় হযরতসহ দুইজনে এক নির্জন স্থানে নামাজ সমাধা করিয়া লইলাম। তিনি একটি থলিয়া হইতে আমাকে কিছু মেওয়া ও পানীয় দিলেন। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিভূত হইয়া আসিয়াছে। তিনি থলিয়া হইতে একটি মোমবাতী বাহির করিয়া জ্বালাইলেন এবং বাতিটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনার সম্মুখ দিকে দৃষ্টি করুন।" আমি সম্মুখ পানে তাকাইয়া দেখিলাম অদূরে একটি প্রদীপ অত্যুজ্জ্বল আলো দানে জ্বলিতেছে। উহার আলোকরশ্মি যেন আমার মুখের পানে ধাইয়া আসিতেছে। আমি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ দেখিতেছি বলিয়া জানাইলাম। তিনি আমাকে একটি "ইছম" শিখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভাই সাহেব আপনি এই "ইছম" খানা পড়িতে পড়িতে একধ্যানে দ্রুত ঐ প্রদীপটির দিকে অগ্রসর হউন। এ'দিক ও'দিক তাকাইবেন না। কথামত কাজ করিলে আল্লাহ অতিসত্তর আপনাকে দেশে পৌছাইবেন। দেশে পৌছিয়া এই সমস্ত কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না।" আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া "ইছম" খানা জপিতে জপিতে প্রদীপটির দিকে একাগ্রচিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতে লাগিলাম। কতক্ষণ চলিয়া হঠাৎ আমি মন্ত্রখানা ভুলিয়া গেলাম এবং সামনের উজ্জ্বল প্রদীপটিও অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিপদ মনে করিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলাম। এ'দিকে ও'দিকে তাকাইতে দেখিতে পাইলাম, আমি চট্টগ্রাম শহরের সদরঘাটে। বাউটা লাকড়ী নামক স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি। তখন সময় ছোবেহ সাদেক। চারিদিকে লোকজন চলাফেরা করিতেছে। আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এইমাত্র যেন পথচলা আরম্ভ করিলাম, কখন রাত শেষ হইল এবং কেমন করিয়াই আমি চট্টগ্রাম পৌছিলাম। কি অদ্ভুদ কাণ্ড! একি কেরামত।

হযরত সাহেবের এই অপূর্ব অলৌকিক শক্তি, অদ্ভুত ও অবর্ণনীয় কেরামত এবং স্বদেশীয় লোকের প্রতি অযাচিত, অপ্রত্যাশিত ও অসীম অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ দর্শনে আমি যেন আনন্দাকুল হইয়া খোদার শোকরিয়া ও তাঁহার স্মরণে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে লাগিলাম। এবং কেমন করিয়া তাঁহার দরবারে পাকে পৌছিয়া তাঁহাকে কদমবুচি দিব এবং তাঁহার অবস্থা অবলোকন করিব ইহাতেই আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমার বিশ্বাস মওলানা সাহেব হজ্বে যান নাই।, গেলে আমি দেশে থাকিতে নিশ্চয় শুনিতাম। তিনি আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয় বাড়ীতে আছেন। এই সমস্ত কল্পনা করিতে করিতে আমি বাড়ীর প্রতি নহে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ পানে রওয়ানা হইলাম। তখন আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। দিবা দুইটার সময় আমি দরবার শরীফ উপবিষ্ট। খবর নিয়া জানিলাম, তিনি ইতিমধ্যে কোথাও যান নাই। আমার অনুমান সত্য। সমস্তই তাঁহার কেরামত। আমি আত্মহারা পতঙ্গের মত তাঁহার পবিত্র চরণে লুটাইয়া পড়িয়া আনন্দাশ্রুতে তাঁহার পদযুগল ভাসাইয়া দিলাম।

হযরত আমার মাথায় করুণামাখা হাত ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হাজী সাহেব আপনার ওয়াদা ঠিক রাখিবেন। কোন কষ্ট হয় নাই তো।" আমি আরজ করিলাম

"হুজুর! আমাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। দয়া করিয়া পুনরায় আমাকে উহা শিখাইয়া দেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আর দরকার নাই। আপনার কাজ তো সারিয়া গিয়াছে। আবার কেন?" এই বলিয়া খাদেমগণকে বলিলেন, "এই লোকটি বহুদূর হইতে আসিয়াছেন, তিনি পথশ্রমে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, পানাহারে পরিতৃপ্ত কর। খাদেম সাহেব আদেশ পাইয়া আমাকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইতে ও বসিতে দিলেন এবং নানাভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া অতি সতর্কতার সহিত তাহাদের প্রশ্নের জওয়াব দিলাম এবং মক্কা শরীফ হইতে অদ্যই কোন দয়ালু পরোপকারী বাদশাহর অনুগ্রহে আসিয়াছি বলিয়া জানাইলাম।

তাহাদের সহিত বেশী আলাপ না করিয়া পুনঃ হযরতের খেদমতে গেলাম। তিনি আমাকে অতি স্নেহভরে বলিলেন "আপনি নিজ বাড়ীতে চলিয়া যান। আপনার জন্য আপনার আত্মীয় স্বজনেরা ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে।" আমি তাঁহার পাকচরণে ভক্তিপূর্ণ কদমবুচি করিয়া তাঁহার আদেশ মত বাড়ীর প্রতি রওয়ানা হইলাম। বাড়ীতে পৌছিলে সকলেই আমাকে দেখিয়া যেন অপ্রত্যাশিত ধন লাভ করিল। তাহাদের হৃদয়ে যেন নিরাশার অন্ধকারে আলোকরশ্মি দেখা দিল। আমি যে দেশে ফিরিয়া আসিব তাহার আশা তাহারা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। এখন তাহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সকলেই প্রশ্ন করিতে লাগিল আমি কেমন করিয়া বাড়ী আসিলাম। আমি হযরতের কথা গোপন রাখিয়া এক কথাতেই উত্তর করিতে লাগিলাম যে একজন মহৎ ধর্মপ্রাণ বাদশাহতুল্য ব্যক্তিই আমাকে বাড়ী আসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। আজ পর্যন্ত হযরত কেবলা কাবার এই অপূর্ব কেরামত আমি কাহারো নিকট প্রকাশ করি নাই। এই মাত্র প্রথমেই আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম।"

নানুপুর নিবাসী ডাক্তার খায়ের উদ্দিন সাহেব বলেন :-

বক্তপুর নিবাসী আবদুল জলিল গোমস্তার সহিত একদিন হযরত সম্বন্ধে আমার আলাপ হয়। তিনি আমাকে বলেন-

আমার এক অন্তরঙ্গবন্ধু হাজী সাহেব সদা সর্বদা আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, "ভাই আপনার সঙ্গে আমার নেহায়েত এক গুরুত্ব আলাপ আছে যাহা এখন বলিতে অক্ষম! আমার মৃত্যুকালীন অবস্থায় আপনাকে বলিতে পারিব। আপনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন যাহাতে না বলিয়া মৃত্যুবরণ না করি। নচেৎ ইসলাম ধর্মের এক বড় রহস্য গোপন থাকিয়া যাইবে।" বহুদিন পরে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তাহার মৃত্যুলক্ষণ দেখিয়া তাহার নিকট গোমস্তা সাহেব গেলেন। বন্ধুর মৃত্যু কালীন গোপন ধর্মীয় রহস্য জানিতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন। বন্ধু হাজী সাহেব বলিলেন, "ভাই সাহেব আমি তো আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। সময় বোধ হয় আর বেশী বাকী নাই। অদ্যই আমি আপনাকে-আমার গোপন কথাটি জানাইব।" তিনি কোন অংশ গোপন না করিয়া সবিস্তারে হযরত আক্‌দাছের উপরোক্ত কেরামতটি আমার নিকট বর্ণনা করিলেন। এবং বলিলেন, ভাই সাহেব! এই কথাটি গোপন রাখিতে হযরত আমাকে অঙ্গিকার করাইয়াছিলেন। এতদিন আমি গোপন রাখিয়াছিলাম। আমার মৃত্যুকালেও এই রহস্যটি

গোপন থাকিলে লোকে তাঁহার পরিচয় পাইতে কষ্ট হইবে বিধায়, অদ্য আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। আপনি এই খানা কাহারো নিকট প্রকাশ করিলে আমার নামটি গোপন রাখিবেন।

(২) "আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বাড়ীতে থাকিয়া মক্কা-মদীনা ছায়ের।"

ইছাপুর নিবাসী হাজী রমিজ উদ্দিন সাহেব বলেন, তিনি হজ্ব করিবার মানসে মক্কা শরীফ যান। কা'বা শরীফ "তওয়াফ" কালে হযরত সাহেব কেবলাকে দেখিতে পান। তিনিও কা'বা শরীফ "তওয়াফ" করিতেছেন। লোকের খুব ভীড় থাকায় আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। তৎপর কা'বা শরীফের যাবতীয় কার্যাদি সমাপন করিয়া মদিনা শরীফ হাজির হন। যখন নবী করিম (সঃ) এঁর পবিত্র "রওজা মোবারক" জেয়ারতে দন্ডয়মান হইয়াছেন, তখন হঠাৎ দেখিতে পাইলেন-হযরত সাহেব কেবলাও তাহার কিছু দূরে পবিত্র "রওজা শরীফ" জেয়ারত করিতেছেন। তিনি জেয়ারত কার্য সম্পন্ন করিয়া হযরত মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর সহিত আলাপ করিবেন খেয়াল করিলেন, জেয়ারত শেষ করিয়া অনেক তালাস করিয়াও তিনি হযরতের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, হযরত সাহেব বাড়ী হইতে এযাবৎ কোথাও যান নাই। হযরতের খেদমতে কদমবুচি পূর্বক আরজ করিলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "চুপ থাকাই উত্তম।"

এইভাবে হযরত অসংখ্য মানব হৃদয়ে যে অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্রীড়া সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা মানব হৃদয়েই অধিকাংশ গোপন রহিয়াছে। কারণ হযরত তাঁহার বাতেনী রহস্যমূলক ক্ষমতাকে গোপনই রাখিতে চাহিতেন। তবুও তাহা প্রচারিত হইয়াছে।

১। হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় বাহুতে হাত রাখিয়া জনৈক হাজীর অলৌকিক ভাবে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন।

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত, সুধারাম থানার জগদানন্দগ্রাম নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিচ ভূঁইয়া সাহেব বলেন, তিনি পাঠ্যাবস্থায় সীতাকুন্ড মাদ্রাসায় পড়াকালীন জনাব হাজী আবদুল আজীজ সাহেবের বাড়ীতে জায়গীর থাকিতেন। তাহারা বেশ ভদ্র ওপ্রতিপত্তিশালী লোক হন। সেই গ্রামের প্রায় লোকজন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ যাইত, ইহা দেখিয়া তিনি একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "মাইজভাণ্ডার দরবারের বুজুর্গির প্রমাণ কি?" ইহাতে তিনি হাজী সাহেবের ছেলে ও গ্রামবাসীর নিকট নিম্নের ঘটনাটা শুনিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলেন। হাজী সাহেবের ছেলে বর্ণনা করেন যে-

"আমার বাবাজান দুই তিন বৎসর হয় এন্তেকাল করেন। তিনি যখন হজ্ব করিতে যান; তাহার টাকা পয়সা তথায় হরণ হইয়া যায়। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাড়ীতে আসার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তিনি নিরূপায় হইয়া হেরেম শরীফের বারান্দায় বসিয়া পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার দরবারে অতি দুঃখের কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রে এক অপরিচিত মানব হঠাৎ তাহার সামনে আসিয়া তাহার কান্নাকাটির কারণ জানিতে চাওয়ায় তিনি সবিস্তারে নিজের দুঃখের কারণ জানাইলেন। লোকটি অত্যন্ত সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন যে তিনি তাহার তেমন উপকার করিতে পারিবেন না, তবে আগামীকল্য মাগরিবের নামাজের পর তাহার সহিত দেখা করিলে তিনি এমন একজন কামেল লোকের সন্ধান দিতে পারিবেন যিনি দয়া করিলে তাহার যাবতীয় দুঃখ কষ্ট লাঘব ও উদ্দেশ্য সফল হইবে।

পরদিন তিনি ঐ লোকটির সঙ্গে যথাস্থানে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন হযরত সাহেব কেবলা নামাজ পড়িয়া বাহিরে আসিতেছেন। লোকটি সামান্য কিছুদূরে থাকিয়া তাহাকে হাতের ইসারায় দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, "যিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন; তিনি মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ জনাব আহমদ উল্লাহ সাহেব। তাঁহার খেদমতে গিয়া সত্তর নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন কর। দেরী করিলে তাহাকে পাইবে না।" আমার বাবা ইতিপূর্বে তাঁহাকে চিনিতেন না। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার পাক চরণে পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিজ বিপদের কথা ব্যক্ত করিলেন।

হযরত তাহাকে বলিলেন, "কোন ভয় নাই আল্লাহ সাহায্যকারী বিদ্যমান আছেন।" অতঃপর হযরত তাহার মস্তক মুখমন্ডল সহ একখানা বস্ত্রদ্বারা আবৃত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালন করিলে হযরত তাহার ডান বাহু ধরিয়া তাহাকে হাটিতে বলিলেন। হযরতের নির্দেশমত কিছুক্ষণ পথ চলার পর তিনি অনুভব করিলেন যেন তাহার দক্ষিণ বাহু হালকা হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল যেন হযরতের বাহু মোবারক তাহার বাহুর উপর নাই। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন অবশ মনে হইল। তিনি আর চলিতে পারিতেছেন না। ঠাণ্ডার পরিবর্তে তাহার ভীষণ গরম অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন। মুখ হইতে কাপড় উঠাইয়া হযরত আছেন কিনা তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন, হযরত নাই এবং নিজেকে তাহার বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার উপর দন্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বিমূঢ়ের মত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে তাহার হুঁশ হইলে বাড়ীতে গেলেন। সকলে তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। তিনি অকপটে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। পরদিন তিনি স্বপরিবারে প্রথম দরবার শরীফে হযরতের খেদমতে হাজির হইয়া ভক্তিপূর্ণ কদমবুচি জানাইলেন। এই ঘটনার পর হইতে উক্তগ্রামের লোকেরা মাইজভাণ্ডার যাওয়া আসা আরম্ভ করেন।

উক্ত ঘটনা শ্রবণের পর মওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিচ সাহেবের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল এবং তিনিও দরবার শরীফ আসিয়া হযরতের অফুরন্ত আধ্যাত্মিক নেয়ামতের ভাগী হইতে লাগিলেন।

(২) হযরতের নাজিরহাট হইতে বেলায়তী ক্ষমতায় বাজার প্রেরণ

মাইজভাণ্ডার গ্রাম নিবাসী ঠাণ্ডা মিয়া সওদাগর সাহেব বলেন, একদা তাহার পিতা মরহুম ওয়াশীল মিঞা সাহেব, নাজিরহাটে বাজার করিবার সময় হঠাৎ হযরত সাহেব কেবলাকে হাটের মধ্যে দেখিতে পান। তিনি তাঁহাকে ভক্তিভাবে কদমবুচি করিয়া সরিয়া যাইতেই, হযরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওয়াশীল মিঞা! তুমি বাড়ী যাওয়ার সময় আমার এই বাজারের দ্রব্যগুলি নিয়া আমার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিও।" তিনি অত্যন্ত আদবের সহিত তাঁহার হাত হইতে বাজার থলিয়াটি নিলেন এবং মনে করিলেন, হযরতের যাইতে বোধ হয় দেরী হইবে। অন্য কাহাকেও বোধ হয় পান নাই। তাই তাহাকে বাজার দিতে দিয়াছেন।

অতঃপর ওয়াশীল মিঞা নিজ বাজার শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় হযরতের বাজার থলিয়াটি তাঁহার বাড়ীতে নিয়া পৌছাইয়া দেন। সেখানে সকলে প্রশ্ন করিতে লাগিল, বাজার গুলি কাহার? তিনি উত্তরে বলিলেন যে "বাজার আপনাদের। হযরত কেবলা আমাকে নাজিরহাট হইতে আনিতে দিয়াছেন।" তাহারা তাহাকে জানাইলেন যে, হযরত কেবলা আজ সারাদিন হুজুরা শরীফ হইতে বাহিরও হন নাই। শেষ পর্যন্ত ওয়াশীল মিঞা হযরতের হুজুরা শরীফ যাইয়া তাঁহার নিকট বলিলেন, "হুজুর! আপনি কি এই বাজারগুলি আনিবার জন্য আমাকে নাজির হাটে দেন নাই?" হযরত ঈষৎহাস্যে মৃদু্য উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ দিয়াছি। তুমি দিয়া চলিয়া যাও।" ইহাতে উপস্থিত সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। হযরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় বাজার প্রেরণ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

এই ভাবে হযরত একই স্থানে থাকিয়া-বহুলোকের সাথে একই সময়ে দর্শনদান- বিপদ বারণ, সঙ্কটহরণ এবং স্মরণের সঙ্গে স্মরণকারীকে যে কোন প্রকার সাহায্য করিয়া বেড়াইতেন। ইহা তাঁহার বেলায়তী তছররোফের উচ্চতম ক্ষমতা। যাহা সর্বোচ্চ গাউছিয়াত ও কুত্‌বিয়াতের স্পষ্ট প্রমাণ ও পরিচায়ক। তাঁহার নিকট কোন প্রকার জাতিভেদ নাই। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও ধনী-নির্ধনের কোন প্রশ্নই নাই। যে তাহার দরবারে ভক্তি নিয়া আসে বা যে কোন স্থানে থাকিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে একবার স্মরণ করে, তাহাকে তিনি অকাতরে, অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য ও সহায়তা করিয়া থাকেন, হযরত পীরানে পীর দস্তগীর (রাঃ) এঁর সামনে সারা পৃথিবী যেমন একটি সরিষার দানা সদৃশ্য, তেমনি গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর নিকটও সমগ্র পৃথিবী যেন একটি সরিষার তুল্য।

পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি-জ্বীনপরী জীবজন্তু, গাছপালা তরুলতা সকলই তাঁহার অনুগত। পৃথিবীর যাবতীয় বলামুছিবতও যেন তাঁহার ইঙ্গিতবাহী আজ্ঞাবহ দাস। সকলেরই রীতিনীতি কার্যক্রম যেন তাঁহারই প্রভাবে সংঘটিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব

নানুপুর নিবাসী মুন্সি খায়ের উদ্দিন ডাক্তার সাহেব একদা বর্ণনা করিয়াছে, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রির শ্বাশুড়ি হযরতের একজন নিষ্ঠাবতী ভক্ত রমণী ছিলেন। তিনি সময় সময় হযরতের খেদমতে হাজির হইতেন। এক সময় দোয়া প্রার্থিনী হইয়া তিনি সন্ধ্যাকালে তাঁহার খেদমতে হাজির হন। পানাহারে রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় তিনি বাড়ী যাইতে অপারগ হন। তবুও তিনি বাড়ী যাইবার জন্য হযরতের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। হযরত তাহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি খুব ভোরে চলিয়া যাইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।

সকালে ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি যখন চলিয়া যাইবার জন্য তৈয়ার হইলেন তখন দেখিলেন সূর্য প্রায় উঠিবার সময় হইয়াছে। পূর্বদিকে প্রায় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাড়াতাড়ি হযরতের নিকট আসিয়া বলিলেন, হুজুর! গত রাত্রে আপনি যাইতে বারণ করায় আমি যাই নাই। মনে করিয়াছিলাম সকালে সূর্য উঠার আগে চলিয়া যাইব। এখন তো সূর্য উঠিয়া যাইতেছে। চারিদিকে লোকজন চলাফেরা করিতেছে। বাড়ীতে না গেলে আমার স্বামী বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন। এখন কি করি।

তাহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া হযরত বলিলেন, "তোমার কোন প্রকার আশংকা নাই তোমাকে কেহ দেখিবে না, সূর্য উদয়ের পূর্বেই তুমি বাড়ী পৌছিয়া যাইবে। আল্লাহ আল্লাহ করিয়া নিরুদ্বেগে বাড়ী চলিয়া যাও। তোমার না পৌছা পর্যন্ত সূর্যোদয় হইবে না।" কালবিলম্ব না করিয়া হযরতের আদেশ মত তিনি বাড়ী রওয়ানা হইলেন। পথে কোন জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পাইলেন না। দরবার শরীফ হইতে তাহার বাড়ী প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পরও দেখিলেন সূর্যোদয় হয় নাই। ইহাতে তিনি হযরতের পবিত্র বাণীর প্রভাব উপলব্ধি করিয়া হযরতের অত্যধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং আল্লাহতা'লার দরবারে শোকরিয়া আদায় করিতে লাগিলেন।

হযরতের প্রতি ব্যাঘ্রের আনুগত্যতা

একদিন হযরতের প্রিয়তমা কন্যা মোছাম্মাৎ সৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা বিবি হযরতের নিকট ছোট কালে আবদার করিয়া জানাইয়াছিলেন, "বাবা আমি তো কোন

দিন বাঘ দেখি নাই। বাঘ দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা। আমাকে বাঘ দেখাইতে হইবে।" হযরত তাঁহাকে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা মা।"

একদিন অনেক রাত্রে হযরত ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাঘ দেখিতে কে কে ইচ্ছা করিয়াছ! বাহিরে তাকাইয়া দেখ। বাঘ আসিয়া তোমাদের সামনে উঠানে দাঁড়াইয়াছে।"

তখন সবাই ঘরে থাকিয়া উকি মারিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল। দেখিল, প্রকাণ্ড বলিষ্ঠকায় একটি বাঘ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কে যেন উহাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। যেন কাহারো পোষা শিক্ষিত বাঘ। এইরূপ প্রায় সময়ে নিঝুম রাত্রে সর্প, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীদিগকেও হযরত আক্‌দাছের খেদমতে আসিতে দেখা যাইত।

হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে সাধারণ দ্রব্যে অদ্ভুতভাবে কলেরা রোগ নিরাময়

হযরতের এক ভক্ত জিয়াউল হোসাইনের স্ত্রীর এক সময় কলেরা রোগ হয়। ডাক্তার চিকিৎসায় হতাশ হইয়া এবং রোগীর অবস্থা ভয়ানক দেখিয়া তিনি উম্মাদের মত যাইয়া হযরতের পায়ে স্ত্রীর প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। হযরত তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভাই সাহেব অতি শীঘ্র আপনার বিবিকে নারিশ পাতার ঝোল পাকাইয়া খাওয়াইয়া দিন। আল্লাহ্‌র হুকুমে আপনার বিবি আরোগ্য লাভ করিবে।" তিনি অতি সত্বর বাড়ী গিয়া হযরতের নির্দেশমত নারিশ পাতার ঝোল পাকাইলেন এবং রোগীকে খাওয়াইতে উদ্যত হইলে ডাক্তার কবিরাজগণ যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহারা বলিলেন যে, উহা খাওয়াইলে রোগী এখনই মারা যাইবে। তিনি কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ণ একপাত্র নারিশ পাতার ঝোল রোগীকে খাওয়াইয়া দিলেন। খোদার কি অপার মহিমা! হযরতের বাক্যে কি অপূর্ব ক্ষমতা! সাধারণ নারিশ পাতার ঝোলেই রোগীর কলেরার উপসর্গ সমূহ বন্ধ হইয়া রোগী ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িলেন। রোগী ঘুম হইতে জাগিলে খুব দুর্বলতা অনুভব করেন এবং হযরতের নির্দেশিত নারিশ পাতার ঝোল পুনরায় খাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। জিয়াউল হোসাইন সাহেব রোগীকে পুনরায় নারিশ পাতার ঝোল ও কিছু শাকভাত খাওয়াইয়া দিলেন। কি ভয়ানক ব্যাপার। ইহাতে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতে থাকে। কলেরার উপসর্গ সমূহ দ্বিগুণবেগে আরম্ভ হইল। তিনি দৌড়িয়া হযরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা হুজুরের খেদমতে প্রকাশ করিলেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, "আমি তো আপনাকে দুইবার খাওয়াইতে বলি নাই এবং শাকভাতও দিতে বলি নাই। যান পুনরায় শুধু ঝোল খাওয়াইয়া দেন।" তিনি বাড়ীতে গিয়া পুনরায় নারিশের ঝোল খাওয়াইয়া দেন। ইহাতে রোগী পুনরায় শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়েন, রোগের উপসর্গ সমূহ তিরোহিত হইয়া যায়। খোদার ফজলে রোগীকে অন্য ঔষধ খাওয়াইতে হয় নাই। রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া যায়।

(ক) যষ্ঠির প্রহারে কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে হযরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রকাশ

চট্টগ্রাম টাউন নিবাসী একজন ধনী লোক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া বহুদিন যাবত কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি হযরতের বেলায়তী প্রভাবের কথা লোকমুখে শুনিয়া, রোগমুক্তির আশাবাদ কামনায় একদিন হযরতের দরবারে উপস্থিত হন।

তিনি হযরতকে অভিবাদন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! আমি যত জায়গায় যত বড় কবিরাজ ডাক্তারের নাম শুনিয়াছি তাহাদের দ্বারা সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, আমার জটিল রোগ কিছুতেই আরোগ্য হয় নাই। আমি রোগ যন্ত্রণায় জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি। অতঃপর আপনার কথা শুনিয়া অতি আশায় শেষ বারের মত চেষ্টা করিতে হুজুরের দরবারে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া হযরত বলিয়া উঠিলেন, "আরে কমবখ্ত নাফরমান! তুমি খোদাকে ভয় কর নাই কেন? তোমার মত পাপীকে দোররা মারা দরকার।" ইহা বলিয়াই তিনি তাঁহার হস্তস্থিত যষ্ঠি দ্বারা তাহাকে স্বজোরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত লোকেরা হায় হায় করিতে লাগিল। একেতো কুষ্ঠরোগে শরীর ক্ষতবিক্ষত, তদুপরি হযরতের লাঠির আঘাত; লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, হয়তঃ লোকটির জীবনায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। হযরতের লাঠির আঘাতে লোকটি বিচলিত হইল না বা যন্ত্রণা সূচক কোন শব্দ করিল না। কিছুক্ষণ প্রহার করার পর হযরত আন্দর হুজুরায় চলিয়া গেলেন। লোকটি ধীরে ধীরে উঠিয়া গোসল করিয়া আসিলেন। অতঃপর হযরত বহির্বাটিতে আগমন করিলে লোকটি হযরতকে কদমবুচি করিয়া চলিয়া যান। প্রায় তিন মাস পর লোকটি পুনরায় হযরতের খেদমতে আসেন। এখন তাহার শরীরে আর কুষ্ঠরোগ নাই। ক্ষতের কোন চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলিলেন যে, তিনি এখান থেকে যাওয়ার পর আর কোন ঔষধ ব্যবহার করে নাই। হযরতের লাঠি মোবারকের আঘাতই তাহার জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বরিষণ করিয়াছে। হযরতের ফয়েজ রহমত ও দোয়ার বরকতে আশা করি আমি চিরতরে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এইরূপ হযরত বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁহার ফয়েজ রহমত দান ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে মানবের উপকার করিতেন।

(খ) যষ্ঠির প্রহারে আধ্যাত্মিক ফয়েজ ও অনুগ্রহ বর্ষণ

রাউজান থানার অধিবাসী জনৈক বৌদ্ধ দারোগা, দারোগার চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিতে যখন শহরে আসেন তখন তাহার মাতা নিয়ত করেন যে, "আমার ছেলে চাকুরী পাইলে প্রথম বেতন হইতে এক টাকার মিশ্রি লইয়া ছেলেকে মাইজভাণ্ডারে ফকীর

মওলানা সাহেবের খেদমতে পাঠাইব।" ছেলে পরীক্ষা দিয়া খোদার ফজলে চাকুরী পাইল। প্রথম মাসের বেতন লইয়া বাড়ীতে গেলে তাহার মাতা বলিলেন, - "বাবা তোমার প্রথম মাসের বেতন হইতে এক টাকার মিশ্রি লইয়া তোমাকে মাইজভাণ্ডার পাঠাইবার আমার নিয়ত ছিল। সুতরাং এক টাকার মিশ্রি লইয়া তুমি মাইজভাণ্ডার ফকির মওলানা সাহেবের কাছে যাও।" ছেলে বলিলেন, "মা এক টাকায় তো প্রায় পাঁচ সের মিশ্রি পাওয়া যাইবে। এত মিশ্রি' কি ফকীর সাহেবে খাইবেন। দুই এক সের মিশ্রি লইয়া বাদবাকী পয়সাগুলি ফকীর সাহেবকে দিলে বোধ হয় ভাল হইবে।" ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মা বলিয়া উঠিলেন, "সর্বনাশ! তুমি কি বলিতেছ। আমার যাহা নিয়ত তাহা করিবে। সাবধান! আর কিছু বলিও না। তুমি মাটিতে মাথা রাখিয়া খত কর। ক্ষমা চাও। তিনি সব গোপন কথা জানেন।" ছেলে বলিলেন "মা! আমি ভূল করিয়াছি ক্ষমা চাহিতেছি।" অতঃপর এক টাকার মিশ্রি নিয়া মায়ের কথামত দরবার শরীফে আসিলেন। তখন দুপুর বেলা লোকজন খুব কম। সবাই যেন ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে রহিয়াছে। হযরত ভীষণ জালালী অবস্থায় আছেন। লোকজন সামনে গেলে লাঠি প্রহার করেন। রাউজানের বৌদ্ধ লোকটি একজন খাদেমকে ডাকিয়া তাহাকে হযরতের সামনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। কারণ তাহার মায়ের আদেশ আছে, যে কোন প্রকারেই হউক ফকীর সাহেবের সাথে দেখা করিতে হইবে। অগত্যা খাদেম সাহেব লোকটিকে হযরতের সামনে নিয়া দিলেন। তাহাকে দেখিয়া হযরত বলিয়া উঠিলেন, "অত মিশ্রি কেন আনিয়াছ, ফকীর সাহেব কি অত মিশ্রি খাইবে? দুই একসের হইলেতো হয়।" ইহা শুনিয়া বৌদ্ধ দারোগা সাহেবের মায়ের কথা মনে পড়িল। তিনি অবনত মস্তকে হযরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হযরত সজোরে দারোগা সাহেবকে লাঠি দ্বারা তিনটি আঘাত করিলেন। তারপর তাহাকে এক টুকরা মিশ্রি হাতে দিয়া বলিলেন, "চলিয়া যা, এই মিশ্রি টুকরা তোর মাকে দিস। অসৎ, অসৎ কাজে গিয়াছিলি! সৎভাবে থাকিস্। ভাল হইবে।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব যিনি হযরত কেবলা কাবার একমাত্র সাজ্জাদানশীন্ আওলাদ ও ওয়ারেছ, তিনি বলেন, "যখন আমি হযরতের নামে প্রতিষ্ঠিত জুনিয়ার মাদ্রাসা ঘরের বিলের টাকা উঠাইয়া আনিতে চট্টগ্রাম শহরে যাই; সেখানে ট্রেজারীতে আসাকালীন উক্ত অবসর প্রাপ্ত বৌদ্ধ দারোগা বাবুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার পরিচয় পাইয়া হঠাৎ তিনি শিহরিয়া উঠেন এবং শরীর হইতে জামা ও কোট খুলিয়া আমাকে বলেন, "দেখুন, তাঁহার নাম শুনিয়া আমার গায়ের লোম কি ভাবে খাড়া হইয়া গিয়াছে। তিনি কি সহজ আউলিয়া ছিলেন। অল্প সময়ে দারোগা বাবু আমাকে তাহার সাধ্যমত সমাদর ও ভক্তি দেখাইলেন এবং উপরে লিখিত ঘটনাটি বলিলেন। তিনি আরো বলিলেন, "আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি তিনি আমাকে যখন আঘাত করিয়াছিলেন তখন আমি শুধু আঘাতের শব্দ শুনিয়া ছিলাম কিন্তু আঘাতজনিত কোন কষ্ট পাই নাই। আচ্ছা বাঘের মুখে নিক্ষিপ্ত লোটাটি কি এখনও আছে? যাহাকে তিনি সেই লোটা নিক্ষেপ পূর্বক বাঘের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের এলাকার লোক।" আমি জানাইলাম যে, হাঁ লোটাটি এখনও আছে।

(ক) পানি তবারোক দানে গলক্ষত রোগ আরোগ্য

রাউজান থানার রায়বাহাদুর রাজকুমার বাবুর ছোটকালে গলার ভিতর এক বিষাক্ত গল ক্ষত রোগ হয়। বহু চিকিৎসার পরও কোন সুফল না পাওয়ায় তাহার পিতা মহাশয়, "ওয়ালীমস্তান" নামে হযরতের এক ভক্তের সঙ্গে একপাত্র দুধ নিয়া তাহাকে হযরত সাহেবের খেদমতে পাঠাইয়া দেন। দুধের পাত্র হযরতের সামনে রাখিয়া "ওয়ালীমস্তান সাহেব" হযরত সমীপে রাজকুমার বাবুর রোগ আরোগ্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

হযরত দুধগুলি একটি বড় পাত্রে ঢালিয়া রাখিতে আদেশ দেন। দুধ ঢালিয়া রাখা হইলে "ওয়ালীমস্তান" উক্ত ভাণ্ডে করিয়া পুকুর হইতে কিছু পানি আনিয়া হযরত সমীপে রাখেন এবং দম দিয়া দিতে অনুরোধ করেন। হযরত পানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া দূরে থাকিয়া একটি মাত্র দম করিলেন। মোস্তান সাহেব পানির পাত্রটি বাহিরে আনিয়া রাজকুমার বাবুকে সমস্ত পানি পান করাইলেন। পানের সময় দেখিলেন, উহা এত গরম যে, যেন ফুটন্ত পানি; অথচ পানে কোন কষ্ট হয় নাই। তাহারা বিদায় লইয়া বাড়ী রওয়ানা হইলেন। পথে সত্তাখালে নামিয়া রাজকুমার বাবু ভাবিলেন, "পানি পান করিতে খুব কষ্ট হইত! অথচ হযরতের "দমকরা" পানিতে তো কোন কষ্ট হয় নাই। এখন খালের কিছু পানি পান করিয়া দেখি কষ্ট হয় কি না।" তিনি কিছু পানি পান করিয়া দেখিলেন। কই না তো! কোন কষ্ট নাই, ইহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

বাড়ীতে গিয়া তাহার বাবাকে তাহারা আরোগ্য সংবাদ দিলেন। তাহার মাতা তাহার রোগ আরোগ্য বিষয় পরীক্ষা করার জন্য তাহাকে চিড়া দধি খাইতে দিলেন। রাজকুমার স্বচ্ছন্দে খাইয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাহার পিতা মাতা অত্যন্ত খুশি হইয়া রাজকুমারকে সামনে সপ্তাহে পুনরায় ফকীর সাহেবের জন্য পেরা মিঠাই লইয়া পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

পর সপ্তাহে ওয়ালীমস্তানের সহিত রাজকুমারকে পেরা মিঠাই দিয়া পুনরায় পাঠাইলেন এবং যাহাতে রাজকুমার ভবিষ্যতে ধনেজনে বিদ্যা বুদ্ধিতে ঐশ্বর্যশালী ও দীর্ঘায়ু হয়, তাহার জন্য দোয়া চাহিতে বলা হয়।

এইবার হযরত তাহাকে যথারীতি নামধাম পিতার নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার উত্তর করিলেন, "হুজুর নাম রাজকুমার। বাবা আমাকে এই পেরাগুলি লইয়া আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন। আমি আপনার আশীর্বাদে গলক্ষত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার দীর্ঘায়ু, বিদ্যাবুদ্ধি, ঐশ্বর্য ও যশঃমানের জন্য বাবা আশীর্বাদ করিতে বলিয়াছেন!" হযরত সাহেব আমার মাথা ও পিঠের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা-আশীর্বাদ করিলাম। তুই বড় লোক হবি।"

ইহার পর হইতে কোন দিন কোন পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন নাই। বি.এ পাশ করিয়া এম.এল.সি হইয়াছেন। রায়বাহাদুর খেতাব পাইয়াছেন। মওলানা শাহ্ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, "যখন মরহুম শাহজাদা খায়রুল.বশর মিঞা, হাইদকান্দি নিবাসী মওলানা ছিদ্দিক আহমদ বি.এল ও সৈয়দ ছায়াদুল্লাহ সহ তখনকার 'বি' ডিভিসনের

এস.ডি.ও. মওলানা সৈয়দ আহম্মদ হামিদ হাছান নোমানী সাহেবের বাসায় দরবার শরীফস্থ মোছাফেরদের সুবিধার্থে কতেক গঠনমূলক কার্যের পরামর্শ ও সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাই তখন উক্ত এস.ডি.ও. সাহেব, রায়বাহাদুর রাজকুমার বাবুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। রায়বাহাদুর হযরতের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার সাথে সাথে বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিলেন! আমার তো সমস্ত শরীর আলোড়ন করিয়া উঠিয়াছে। ইনি কি সেই ফকীর হযরত সাহেবের পৌত্র! যিনি আমার জীবন দাতা, বিদ্যাদাতা, ঐশ্বর্য দাতা ও স্বর্বস্ব দাতা! যাঁহার আশীর্বাদে আজ আমি রায়বাহাদুর বলিয়া আপনাদের সাথে পরিচিত। ইহা বলিয়া তিনি একশত টাকার একখানা চেক কাটিয়া দিয়া বলিলেন, যখন দরকার মনে করেন আমাকে জানাইলে আমি যথাসাধ্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিব।

সেই দিন তিনি তাহার বাল্যকালের উপরোক্ত ঘটনাটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন।

(খ) তবারোক মাধ্যমে জটিল রোগমুক্তি

নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ছিলনীয়ার নেয়াজপুর গ্রাম নিবাসী মরহুম মাইজুদ্দিন ভূঁইয়ার পুত্র হাজী হাফেজ আহমদ উল্লাহ ভূঁইয়া সাহেব বলেন,-

আমি কোন এক সময় এমন এক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, যাহার কোন প্রকার চিকিৎসা না পাইয়া আমি জীবনের আশায় একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। শেষে লোকমুখে হযরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার খেদমতে দোয়া প্রার্থী হইয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

আমি এক সের খোরমা লইয়া হযরতের দরবারে আসিয়া বহির্দায়েরা শরীফে প্রবেশ করিতেই ভিতর বাড়ী হইতে ছয় সাত বছরের একজন ছেলে আসিয়া বলিলেন, "নোয়াখালী হইতে আগত মোছাফেরকে হুজুর তলব করিয়াছেন।" সেখানকার কেহ ইহাতে সাড়া না দেওয়ায় আমি বলিলাম আমি তো নোয়াখালীর লোক। তখন বালকটি আমাকে বলিলেন,-আপনাকে হুজুর ডাকিয়াছেন। পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলাম, বালকটি হযরতের নাতি "দেলাময়না।" যিনি বর্তমান গদীনশীন, হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব যাঁহাকে হযরত অতি স্নেহ ভরে 'দেলাময়না' নামে অভিহিত করিতেন। অতঃপর আমি তাঁহার সহিত আন্দর বাড়ীতে হযরতের 'হুজুরায়' হাজির হইলাম। হযরত তখন চক্ষু মুদিতাবস্থায় বসিয়া আছেন। আমি প্রবেশ করিয়া সালাম দিতেই আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তিনবার তাঁহার প্রশ্নোত্তরে নাম বলিলাম। তিনি চক্ষু বন্ধাবস্থায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন আসিয়াছেন।" আমি বিনীত ভাবে তাঁহার কাছে আরজ করিলাম, হুজুর! অনেক দিন যাবত রোগে কষ্ট পাইতেছি। কোন ঔষধেই ফল পাইতেছিনা। নিরূপায় হইয়া হুজুরের খেদমতে দোয়ার জন্য আসিয়াছি। এই বলিয়া খোরমাগুলি তাঁহার সামনে রাখিলাম। তিনি খোরমাগুলির উপর হাত রাখিয়া একটি খোরমা আমাকে দিয়া বলিলেন; "দোয়া করিতেছি।" উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক একটি খোরমা বন্টন করিয়া দিয়া একটি খোরমার অর্ধেকাংশ তিনি

নিজ মুখে দিলেন এবং অপরাংশ তাঁহার পৌত্র দেলাময়নার হাতে দিয়া বলিলেন, "খোরমাগুলি সৈয়দের বেটিকে দিয়া আসেন।"

আমি বিমারের কথা বলিলাম বটে; কিন্তু তিনি আমার কি বিমার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমিও বলিলাম না। মনে করিয়াছিলাম পরে বলিব কিন্তু ইহার পূর্বেই তিনি আমাকে বিদায় দিয়া দিলেন।

কি করিব! হযরতের খেদমত হইতে বিদায় পাইয়া অগত্যা বাড়ীর প্রতি রওয়ানা হইলাম। পথে চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি ব্যাপার; আমি আসিয়া দায়েরায় প্রবেশ করা মাত্রই আমার ডাক পড়িল। আমি যে নোয়াখালী হইতে আসিয়াছি তাহা তিনি কি করিয়া জানিলেন। নিশ্চয় তাঁহার কশ্‌ফ আছে।

অসুখের কথা কিছু খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। মনকে প্রবোধ দিলাম, আমি না বলিলেও নিশ্চয় তিনি জানেন। বলার হয়তো দরকার ছিল না। তাই জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

আমি বাড়ী যাওয়ার পর হইতে খোদার ফজলে ও হযরতের দোয়ার বরকতে দিন দিন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্নভাবে সুস্থ হইয়া গেলাম। একটি মাত্র খোরমার দ্বারা হযরত আমাকে কি মহৌষধ যে খাওয়াইয়া দিয়াছেন তাহা তিনি জানেন! সেই হইতে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁহার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়িয়া গেল! বুঝিতে পারিলাম তিনি একজন সর্বশ্রেষ্ঠ অলিউল্লাহ। সেই হইতে আমি প্রায়ই দরবার শরীফ যাওয়া আসা করিতেছি।

(ক) সরবত দানে হযরতের ফয়েজ বর্ষণ ও আত্মশুদ্ধি করণ

একদা হযরত স্বীয় খাদেম হেদায়ত আলীকে রমজানের দিনে সরবত পান করাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত সাহেবানী বলিলেন, সে তো রোজা রাখিয়াছে। আপনি রোজার মধ্যে তাহাকে সরবত পান করাইতেছেন কেন? তাহাকে তাড়াইয়া দেন। সে কোন কাজ কর্ম করে না, শুধু বসিয়া খাইতেছে। হযরত সাহেব উত্তর করিলেন, "তাহাকে ছাপ করিয়া দিলাম। দেখিলাম সংসারে তাহার বাড়ীঘর নাই। সুতরাং তাহাকে তাড়াইয়া দিলে সে কোথায় যাইবে। সে আপনার বাড়ীর আস্তানায় ঝাড়ু দিবে। আপনি তাহাকে একমুটা ভাত দিলে সে তাহা খাইয়া কবুতরের মত আপনার আঙ্গিনায় পড়িয়া থাকিবে। আর না দিলে পানি খাইয়া থাকিবে।" হযরতের কথায় হযরত সাহেবানী চুপ হইয়া গেলেন। মাগরেবের নামাজান্তে তিনি মোরাকাবায় বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, হযরত হেদায়ত আলীর কি ছাপ করিতেছেন! তিনি দেখিলেন হেদায়ত আলীর বক্ষের উপরিভাগ সাদা, তদ্‌ নিম্নভাগ লাল ও তদ্‌ নিম্নভাগ লাল ও কাল! লাল ও কাল ভাগ ক্রমশঃ সাদা হইয়া সর্বোপরি সাদা ভাগের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। তখন হযরত সাহেবানী বুঝিতে পারিলেন হযরত সরবত দানে হেদায়ত আলীর আত্মশুদ্ধিই করিতেছেন। সেই দিন হইতে তিনি আর হযরতের কোন কাজে আপত্তি করিতেন না।

(খ) হযরতের আদেশের প্রভাবে দুধ ও কলা খাইয়া কামড়ি রোগ মুক্তি

বরমা হাইস্কুলের ভূতপূর্ব হেড মওলানা মীর আহমদ ফারুকী সাহেব বলেন, তিনি মোহছেনীয়া মাদ্রাসায় পড়াকালীন তাহার মামা মওলানা লুৎফর রহমান সাহেবের সহিত মাইজভাণ্ডার হযরত সাহেব কেব্‌লার খেদমতে আসেন। তিনি তাহার আম্মাজানের পেটকামড়ি রোগের আরোগ্যের জন্য হযরতের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, "তোমারী আম্মীকো কেলা আওর দুধ খানে কো বলো আচ্ছা হো যায়েগী।"

বাড়ী যাইয়া তিনি তাহার মাতাকে বলিলেন। তাহার মাতা তিন দিন উহা খাওয়ার পর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন। ইহাতে তাহার মাতা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এতদিন এত দুধ ও কলা খাইয়াছেন, কত ঔষধ খাইয়াছেন; কোন ফল হইল না অথচ হযরতের আদেশে তিনদিন দুধ ও কলা খাইয়া তাহার এমন রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। যাহা আরোগ্য হইবে বলিয়া আশা করিতে পারে নাই! তিনি স্থির করিলেন, ইহা নিশ্চয় হযরতের আদেশের ফয়েজ বরকত মাত্র।

(গ) রুটি প্রদানে ফয়েজ এনায়েত

উপরের বর্ণনাকারী মওলানা মীর আহমদ ফারুকী সাহেব আরো বলেন, তাহার মামা মৌং লুৎফর রহমান সাহেব, হযরতের নিকট বায়াত গ্রহণের নিমিত্ত তিনবার আসিয়া চেষ্টা করেন। পুনঃ একদিন বায়াত গ্রহণের জন্য হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, "আলগ্ হো যাও কুনজশ্‌ক্‌কে তর্‌হা হো যাও।" অতএব তিনি আদেশ মত দূরে সরিয়া গেলেন। হযরত তাহাকে বায়াত করিলেন না।

আমরা সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে চাহিলাম। উত্তর আসিল পাওয়া যাইবেনা। অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল, পাঁচখানা বড় রেকাবীতে অল্প অল্প জল ভাত, লটিয়া শুটকি ও মিঠাকোমড়ার তরকারী সহ আমাদের জন্য আনা হইয়াছে আমরা উহা খাইতে আরম্ভ করিলাম। পরে দেখি আবার গরমভাত গোস্ত আসিয়াছে তাহা হইতে আমরা পেট ভরিয়া খানা খাইলাম।

আন্দর বাড়ী হইতে একজন খাদেম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লুৎফর রহমান কে?" তখন আমার মামু সাহেব উত্তর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খাদেম সাহেব তাহার হাতে একখানা রুটি দিয়া বলিলেন, "হযরত সাহেব কেবলা তোমাকেই খাইতে দিয়াছেন।" আমার মামু সাহেব অত্যন্ত আনন্দের সহিত উহা খাইয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে দেখা গেল তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এবাদত বন্দেগীতে তাহার আগ্রহ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হ্যরতের অপূর্ব কেরামত-ব্যাঘ্রের কবল হইতে প্রাণ রক্ষা

বরিশাল নিবাসী একজন লোক হযরতের কামালিয়ত সম্বন্ধে শুনিয়া অত্যাগ্রহে তাঁহার দরবারে আসিয়া তাঁহার হাতে বায়াত গ্রহণ করিতে নিয়ত করিলেন। নিজামপুর আসিয়া তিনি বারৈয়াঢালা পার হইয়া মাইজভাণ্ডার আসিবার মানসে পার্বত্য পথ ধরিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর তাহার অত্যন্ত পায়খানার হাজত হয়। তিনি রাস্তার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পায়খানার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। আবশ্যকীয় কার্য সমাধা করিয়া তিনি দন্ডায়মান হইলে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন এক ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্র বজ্রের মত গর্জন করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি ব্যাঘ্রের বিকট মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন হায়! আর বুঝি রক্ষা নাই। জীবন বোধ হয় ব্যাঘ্রের কবলে হারাইতে হইবে। আমার মত হতভাগা আর কে আছে! একজন অলি আল্লাহ্‌র দরবারে যাইয়া পাপময় জীবনকে সার্থক করিব মনে করিয়াছিলাম। তাহা আর হইল কই? বোধহয় তাঁহার খেদমতে যাওয়া আমার ভাগ্যে নাই। হায়! আল্লাহ! তোমার দোস্তের দরবারে যাইতে বুঝি আমাকে দিলে না? এই সমস্ত চিন্তা করিতেই হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, এক সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া "দূর হও হারামজাদা" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া তাঁহার হস্তস্থিত লাঠি দিয়া ব্যাঘ্রেটির মাথায় সজোরে আঘাত করিলেন। যষ্টির ভীষণ আঘাতে ব্যাঘ্রটি চিৎকার করিয়া পালাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটিও কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তিনি এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই মহাসঙ্কট হইতে কে এই মহাপুরুষ আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন! তিনি যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন তখন পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মাইজভাণ্ডারীর দরবারে যাইতেছি, সেই জন্য বোধহয় আল্লাহ গায়েবী সাহায্য দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। দরবারের প্রতি তাহার ভক্তি পূর্ব অপেক্ষা আরো বাড়িয়া গেল।

দরবার শরীফে হাজির হইয়া তিনি হযরতকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করিয়া হঠাৎ এক চিৎকার দিয়া উঠিলেন; এবং হযরতের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত তাহার পিঠের উপর হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মিঞা! আল্লাহ্‌র কুদরত দেখিয়া-এতই আশ্চর্যান্বিত হইতেছ কেন?

আল্লাহতালা ইহা অপেক্ষা আরো দয়ালু, আরো ক্ষমতাবান। তিনি সব কিছু করিতে পারেন।" হযরতের মধুর কালাম শুনিয়া লোকটি চুপ হইলেন; হযরত আন্দর হুজুরায় তশরিফ নিয়া গেলেন। উপস্থিত লোকগণ তাহার চিৎকার করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি পথের সমস্ত ঘটনা তাদের নিকট বর্ণনা করেন।

লোকটি বলিলেন পথের মধ্যে আমাকে উদ্ধারকারী লোকটিকে আমি কোন ফেরেস্তা অথবা খিজির (আঃ) বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছি যে, হযরত সাহেবই তাঁহার এই লাঠি দিয়া বাঘের মাথায় আঘাত করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার প্রাণ রক্ষাকারীকে দেখিয়াই আমি নিজকে সংবরণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। সকলে ঘটনাটি শুনিয়া অবাক হইল।

হযরতের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রভাবে ব্যাঘ্রের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার

একদিন হযরত কেবলা জালালী হালতে পুকুর পাড়ে বসিয়া অজু করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হারামজাদা তুই এখান হইতে দূর হস্ নাই।" এই বলিয়া তাঁহার হস্তের লোটাটি জোরে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করিলেন। তখনও তাঁহার অজু সমাপন হয় নাই। তাড়াতাড়ি খাদেমগণ অন্য লোটা আনিয়া দিলেন। তিনি অজু সমাপন করিয়া দায়েরা শরীফে চলিয়া যান। এদিকে হযরত পুকুরে লোটা ফেলিয়া দিয়াছেন দেখিয়া খাদেমগণ পুকুরে নামিয়া লোটা তালাস করিতে লাগিলেন। অনেক তালাসের পরও যখন পাওয়া গেলনা তখন তাহারা হতাশ চিত্তে উঠিয়া গেলেন। অলি উল্লাহদের কার্য বুঝা মুস্কিল। তিনি গালি দিলেন কাকে এবং লোটাই বা পুকুরে কেন নিক্ষেপ করিলেন সকলে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এত তালাসের পর লোটা পাওয়া না যাওয়ার কারণই বা কি!

ইহার দুই দিন পর রাঙ্গুনিয়া নিবাসী আছমত আলী নামক হযরতের জনৈক ভক্তশিষ্য কিছু নাস্তা ও হযরতের পুকুরে নিক্ষেপ করা লোটাটি লইয়া দরবার শরীফ হাজির হইলেন। তিনি হযরতের খেদমতে যাইয়া লোটা ও নাস্তাগুলি সামনে রাখিলেন এবং কদমবুচি করিয়া অনেকক্ষণ যাবত হযরতের কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বাহিরে আসিলে সকলে তাহাকে লোটা কোথায় পাইলেন জানিতে চাহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন সেই এক অপূর্ব ঘটনা। এই লোটার মারফত হযরত আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। ভাই, আমি গরীব মানুষ। মনে করিয়াছিলাম পাহাড় হইতে কিছু লাকড়ী আনিব এবং বিক্রয় করিয়া যাহা পাইব তাহা দিয়া নাস্তা তৈয়ার করিয়া হযরতের জন্য আনিব। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হইতে প্রায় ৪২ মাইল দূরে রাঙ্গুনীয়া কোদালা পাহাড়ে গিয়া কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া এক গাছ তলায় আঁটি বাঁধিতেছিলাম। এমন সময় এক বিরাট বাঘ কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া আমার সামনে হাজির হইল। বাঘের

আকস্মিক আক্রমণ প্রচেষ্টায় অনন্যোপায় হইয়া আমি "এয়া গাউছুল আজম" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। ইহা বলিতে না বলিতেই অকস্মাৎ শূন্য হইতে একটি লোটা আসিয়া বাঘের মুখের উপর পতিত হইল। বাঘটি ভয়ে চিৎকার করিয়া পলাইয়া গেল। আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাইলাম। এবং লোটাটি হাতে লইয়া দেখিলাম, ইহা হযরতের লোটা। লোটাটি হযরতকে ব্যবহার করিতে আমি দেখিয়াছি। তাই লোটাটি ও লাকড়ীগুলি লইয়া বাড়ী আসিলাম এবং বিক্রয় করিয়া হযরতের খেদমতে আনিতে সামান্য নাস্তা তৈয়ার করিলাম। অদ্য এই লোটা ও নাস্তা লইয়া হযরতের খেদমতে হাজির হইয়াছি। আমাকে হযরত অসীম দয়া করিয়া তাঁহার বেলায়তী ক্ষমতায় নরখাদকের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন! না হয়তো আমার উপায় ছিল না। "আয়নায়ে বারী"

হযরতের যষ্ঠির প্রহারে ফয়েজ-রহমত দান ও মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার

ভূজপুর নিবাসী কবি সৈয়দ আবদুল ওয়ারেছ সাহেব হযরতের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় হযরতের খেদমতে থাকিতেন। সর্বদা রোজা রাখিতেন। ইহাতে তাহার শরীর অতিশয় দুর্বল ও কৃশ ছিল। তিনি সময় সময় হযরতের পদযুগল এমনভাবে জড়াইয়া ধরিতেন যে, বাহিরের লোকজন আসিয়া তাহাকে-হযরতের পা হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইত।

একদিন হযরত বাড়ীর সামনে পুকুর পাড়ে "জজ্‌ব" হালতে বসিয়া রহিয়াছেন। তখন সৈয়দ আবদুল ওয়ারেছ দৌড়িয়া আসিয়া হযরতের পা মোবারক দুই হাতে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, কেহই তাহাকে ছিনাইয়া নিতে পারিতেছেন না। হযরত তাহাকে হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা ভীষণভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। একে তো দুর্বল শরীর, তদুপরি হযরতের যষ্ঠির প্রহার। তিনি বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না। ধরাশায়ী হইয়া পড়িলেন। নাকে মুখে ফেনা আসিল মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিল। উপস্থিত লোকজন তাহার এই ভয়ানক অবস্থা দর্শনে ভীত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। খবর রটিল কবি আবদুল ওয়ারেছ সাহেব মারা গিয়াছেন, লোকজন ভয়ে পালাইতে লাগিল!

অনেকক্ষণ পর হযরতের শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিল। তিনি দৃষ্টি করিতেই আবদুল ওয়ারেছের অবস্থা গুরুতর বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, কি যেন তিনি ভাবিলেন। ক্ষণকাল চক্ষু বুঝিয়া রহিলেন। হঠাৎ এ'দিক ও'দিক তাকাইয়া দেখিলেন। সেখানে কেহ নাই। সকলেই পালাইয়া গিয়াছে! হযরত ডাকিয়া বলিলেন; 'ওখানে কে আছে।' হারিচান্দ নামক হুজুরের এক ভক্ত তখনও পুকুরের পাড়ে বাঁশ আড়ালের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। সে উত্তর করিল, "হুজুর আপনার এক নরাধম গোলাম আছি।" হযরত তাহাকে সজোরে এক বান্ডিল বাঁশ পুকুরে নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। হারিচান্দ এক বান্ডিল বাঁশ তাড়াতাড়ি জলে নিক্ষেপ করিতে "ঝুপ" করিয়া এক ভীষণ শব্দ হইল। খোদার রহস্য

বুঝা ভার, বাঁশের শব্দ শুনিতেই মৃতপ্রায় সৈয়দ আবদুল ওয়ারেছ আস্তে আস্তে চক্ষু খুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার অবস্থাদৃষ্টে মনে হইল তিনি যেন বহুক্ষণ নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। হযরত প্রস্থান করিলেন। সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, তাহার কেমন বোধ হইতেছে। কোন প্রকার অসুবিধা অনুভব করিতেছেন কিনা। কিন্তু তিনি যে কিছুই জানেন না। বলিলেন যে, তিনি এইমাত্র ঘুম হইতে জাগিয়াছেন। তখন সকলের ধারণা হইল, ইহা হযরতের আধ্যাত্মিক লীলা ছাড়া আর কিছুই নহে। আউলিয়াদের কেরামত বুঝা বড়ই মুস্কিল। চারিদিকে খবর ছড়াইয়া পড়িল। মৃত আবার জীবিত হইয়াছে।

হযরতের বেলায়তী প্রভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত

হযরতের প্রিয়তম পৌত্র, তাঁহার নয়নমনি, হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব শিশুকালে একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর। রোগের চিকিৎসা চলিল। কিন্তু দিন দিন রোগ বৃদ্ধি ছাড়া আরোগ্য দেখা গেলনা। অকস্মাৎ একদিন ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। শিরা বসিয়া গেল। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তিনি আর ইহ জগতে নাই। কান্নাকাটির রোল পড়িল কেহ কেহ দৌড়িয়া হযরতের হুজুরা শরীফে যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। হযরত তশরীফ নিয়া দেখিলেন, তিনি মৃত। তখন হযরত কি আর নিরব থাকিতে পারেন। তিনি তো হযরতের ভাবী খলিফা! তাঁহারই একমাত্র উত্তরাধিকারী। এক্ষেত্রে কি তিনি তাঁহার গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত না করিয়া পারেন! তবুও তিনি খোলাখুলি ক্ষমতা জাহির করিতে নারাজ। তাঁহার নিরাবরণীয় বেলায়তী শক্তির উপর আবরণ দিতে চেষ্টা করিতেছেন। একটি উছিলা ঠিক করিলেন। লোকের চক্ষে উহাই দেখাইবেন। বলিয়া উঠিলেন "কে আছ, একটি জলপূর্ণ কলসী উঠানে নিক্ষেপ কর।" তাহাই করা হইল। কলসী ভাঙ্গার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক নয়ন দৃষ্টিতে তদীয় নয়ন পুত্তলী পৌত্রের পানে রহমত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কলসী ভাঙ্গার শব্দ ও হযরতের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। এখন আর তাঁহার মুমূর্ষ অবস্থা নাই। রোগ যেন সারিয়া গেল। তিনি নব জীবন লাভ করিলেন ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার দাদী আম্মা হযরত সাহেবানী প্রায় বলিতেন, তুমি তো জয়নাল আবেদীন। তোমাকে তো হযরত কারবালা প্রান্তরের মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে গরুর দুগ্ধ তিক্তস্বাদে রূপায়িত

হযরতের প্রতিবেশী মুহাম্মদ ওয়াশীল নামক এক ব্যক্তি একটি বাঁজা অর্থাৎ বন্ধ্যা গরু খরিদ করে। লোকটি খোদার দরবারে প্রার্থনা জানায় যে, যদি তাহার গরুটি প্রসব করে, প্রথম দিনের সমস্ত দুধ হযরতের জন্য নিয়া যাইবে। কিছুদিন পরে আল্লাহ্র

রহমতে গরুটি গর্ভবতী হইল এবং সময়ে একটি বাচ্চা প্রসব করে। দুগ্ধ দোহন করিয়া সে খাইবার জন্য ঘরে রাখিয়া দেয়। অনেক দিনের কথা হওয়ায় নিয়তের কথা তাহার স্মরণ ছিলনা।

রাত্রে সে মেহমান লইয়া খাইতে বসিল। খাওয়ার পর দুধ আনা হইল। দুধ মুখে দিয়া দেখিল, এত তিক্ত যে খাওয়া অসম্ভব, কেহই দুধ খাইতে পারিলনা। মনে করিল দুধে কিছু পড়িয়াছে। দুধ তিক্ত হওয়ার কোন কারণ দেখিতে পাইল না। অনুসন্ধানে জানিল দুধে কিছু পড়েও নাই। গরুর দুধ তিক্ত হইতে জীবনে শুনেও নাই। কি অস্বাভাবিক ব্যাপার। হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল যে, প্রথম দিনের দুগ্ধ হযরতের জন্য আনিবার নিয়ত করিয়াছিল। অতএব পরদিনের দুগ্ধ লইয়া সে হযরতের দরবারে আসিল। দুধ হযরতের সামনে রাখিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "প্রথম দিনের দুগ্ধই আমাকে দেওয়ার কথা, ইহা তুমি লইয়া যাও। ছেলেমেয়ে লইয়া খাইও।" তখন মুহাম্মদ ওয়াশীল মিঞা হযরতের খেদমতে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। বলিল, "হুজুর আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। দুগ্ধ ভাল হওয়ার জন্য দোয়া চাই।" তখন হযরত দুগ্ধ গ্রহণ করিলেন। পরদিন হইতে দেখা গেল গাভীর দুগ্ধ স্বাভাবিক হইয়াছে। তার কোন দোষ বা তিক্ততা নাই। সকলে ব্যাপার বুঝিতে পারিল। অলি আল্লাহদের কোন কাজে অবহেলা বা গাফেলতি করা অন্যায়।

হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে বন্য-জন্তুর কবল হইতে ইক্ষুখেত রক্ষা

এক ব্যক্তি সাদা আখের ক্ষেত করিত। প্রতি বৎসর বন্য শৃগাল তাহার ক্ষেত নষ্ট করিত। কয়েক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সে নিয়ত করিল যে, এবার আল্লাহ যদি তাহার ক্ষেত নিরাপদে রাখেন তবে সে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত সাহেব কেবলার জন্য এক গাইট ইক্ষু ও এক কলসী ইক্ষুগুড় হাদিয়া নিবে।

আল্লাহতা'লার অসীম কৃপা। এই বৎসর তাহার ক্ষেত অক্ষত অবস্থায় রহিল। বৎসরান্তে ইক্ষু চিবাইয়া সে মনে করিল, "এতগুলি নিব কেন! অল্প করিয়া নিয়া যাই।" অতএব তাহার খেয়াল মতো দুইখানা ইক্ষু ও দুইসের মিঠা লইয়া হযরতের দরবারে আসিল।

ইহা দেখিয়া হযরত অতিশয় রাগান্বিত হইয়া উঠিল, আমি সারা বৎসর তোমার ক্ষেত পাহারা দিয়া শৃগাল তাড়াইয়া হয়রান হইতেছি; আর তুমি এক গাইট ইক্ষু ও এক কলসী মিঠা দিতে কুণ্ঠিত? যাও আমি কৃপন লোকের দ্রব্য খাইনা। নিয়া যাও এই বলিয়া দ্রব্যগুলিসহ তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

লোকটি পুনরায় নিয়তমত দ্রব্য লইয়া হযরতের খেদমতে আসিল। অনেক ক্ষমা চাওয়া ও কাতর মিনতির পরও হযরত আর উহা গ্রহণ করিলেন না। ইহার পর বৎসরও লোকটি আবার নিয়ত করিল। কিন্তু আর তাহার নিয়ত ফলে নাই।

ধান্য ক্ষেত হেফাজতে হযরতের প্রভাব

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত এনায়েতপুর নিবাসী সৈয়দ ওহাব উল্লাহ সাহেব বলেন, তাহাদের গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ ধুপি এক বৎসর তাহাদের পাহাড়ী জমিতে ধান্য বপন করিয়াছিল। সেই এলাকায় প্রতি বৎসর বন্যবরাহ ও বানর দ্বারা ফসল নষ্ট হইত। কেহ ধান্য আনিতে পারিত না।

প্রাণকৃষ্ণ নিয়ত করিল, আল্লাহ যদি তাহার ধান্য নিরাপদে বাড়ীতে আনিয়া দেয় তবে সে প্রতি বৎসর ফকীর মওলানা সাহেবের জন্য কিছু কিছু চাউল দিবে। খোদার ফজলে সেই বৎসর তাহার ধান্য সম্পূর্ণ নিরাপদে রহিল। কোন জানোয়ারই তাহার ধান্যের কাছে আসিল না। নিরাপদে ধান্য বাড়ীতে আনিল। এবং এক মণ চাউল তৈয়ার করিয়া হযরতের দরবারে আনিল। এইরূপ প্রতি বৎসর ধান্য নিরাপদে আনিয়া হযরতের দরবারে চাউল দিত। ইহা দেখিয়া অন্যান্য কৃষকগণও নিয়ত করিতে লাগিল। ইহাতে তাহারা বুঝিতে পারিল, বনের হিংস্র পশু পক্ষী পর্যন্ত হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং হযরতের চরণে অনুগত।

হযরতের পবিত্র জুতা মোবারকের ধুলায় দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়

হযরত মওলানা কাঞ্চনপুরী সাহেবের মামু সাহেব কঠিন কলিজা কামড়ী রোগে ভূগিতেছিলেন। অনেক চিকিৎসার পরও কোন ফল না হওয়ায় হযরতের দরবারে দোয়ার জন্য আসিবেন মনস্থ করিয়াছেন। এমন সময় ডাক্তার সামসুজ্জামান তাহাকে একটি ঔষধ লিখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া মির্জাপুরী মওলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ সাহেবের পুত্র মওলানা ফজলুল বারী সাহেব তাহাকে বলিলেন যে এক নিয়তে হযরতের জুতা মোবারকের ধুলা মালিশ করিলে তাহার কামড়ী রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে। তাহার অত্যন্ত বিশ্বাস হইল। তিনি দরবার শরীফ আসিয়া হযরত কেবলা কাবার জুতা মোবারক হইতে কিছু মাটি নিয়া দরদের জায়গায় মালিশ করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্র রহমতে এবং হযরতের অলৌকিক প্রভাবে তাহার কামড়ী রোগ চিরতরে নির্মূল হইয়া যায়। তিনি বলেন, তাহার শেষ জীবন পর্যন্ত এই কামড়ী রোগ আর আক্রমণ করে নাই।

এইরূপ হযরতের জুতা মোবারকের মাধ্যমে ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া শতশত লোক রোগারোগ্য হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ আছে।

"আয়নায়ে বারী"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কাঁঠালের অর্দ্ধাংশ রাখিয়া বাকী অংশ ফেরত দানে কশ্‌ফ শক্তির পরিচয়

ইছাপুরী জনাব মওলানা আবদুচ্ছালাম সাহেব বলেন, একদিন তাহার জেঠা মুন্সী আবদুল আজিজ সাহেব নিয়ত করিলেন, "এয়া আল্লাহ! আমার কাঁঠাল গাছে যদি কাঁঠাল ফলে, সবচেয়ে বড় ফলটি মাইজভাণ্ডারী ফকীর মওলানা সাহেবকে হাদিয়া দিব।" কয়েক বৎসর যাবত তাহার এই কাঁঠাল গাছে কোন ফলই ফলিতে ছিল না। খোদার মহিমায় সেই বৎসর গাছে যথেষ্ট পরিমাণ ফল ফলিল।

তিনি যখন বড় কাঁঠালটি কাটিয়া হযরতের জন্য নিতে প্রস্তুত হইলেন তখন তাহার স্ত্রী বলিলেন, ফকীর মওলানা সাহেব কি এতবড় কাঁঠাল সবটা খাইতে পারিবেন। অর্দ্ধেক কাঁঠাল নিলেও তো চলে। ইহাতে তাহার জেঠা আবদুল আজিজ সাহেব তাহার জেঠাই সাহেবার উপর অতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে তিরস্কার করিলেন।

অতঃপর তিনি কাঁঠালটা লইয়া হযরতের দরবারে পৌছিলেন। হযরতের সামনে কাঁঠালটি রাখা হইল। হযরত তাহাকে বলিলেন-"মুন্সী সাহেব! ফকীর সাহেব কি এতবড় কাঁঠাল খাইতে পারেন। আপনি অর্দ্ধেক কাঁঠাল রাখিয়া বাকী অর্দ্ধেক আপনার বিবি সাহেবানীর জন্য বাড়ীতে নিয়া যান।" ইহা বলিয়া হযরত নিজ হাতে ছুরি দিয়া কাঁঠালটিকে দুই ভাগ করিলেন এবং অর্দ্ধেক রাখিয়া বাকী অর্দ্ধেক তাহাকে ফেরত দিলেন। হযরত মানুষের অন্তরের কথার পর্যন্ত খবর রাখিতেন। কোন প্রকারের নিয়ত বেশ কম কিছু হইলে তাহা গ্রহণ করিতেন না। এবং কেহ মনে কষ্ট আনিয়া কিছু তাঁহাকে দিলে তাহা তিনি ফেরত দিয়া দিতেন। তাঁহার নিকট কিছু হাদিয়া আনিতে হইলে অতি পবিত্র ও খালেছ নিয়তে আনিতে হইত।

হযরতের প্রভাবে দোয়াতের মাধ্যমে জীবিকার্জন

নানুপুর নিবাসী জনাব মওলানা আবদুল লতিফ সাহেব অনেক বৎসর দরবার শরীফ-হযরত সাহেবের পুত্র জনাব মওলানা শাহ্ সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবকে পড়াইতেন। বিদায়কালে তিনি হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন, "হুজুর আমি গরীব

ও মাজুর মানুষ! এতদিন হুজুরের দরবারে শাহজাদাকে পড়াইয়াছি। বর্তমানে আমি বাড়ী যাইতেছি! আমি কোন কাজকর্ম করিতে পারিনা। হুজুর দয়া করিয়া সম্মানের সহিত জীবিকার্জন করিতে পারি মত কোন উপায় আমাকে করিয়া দেন।" হযরত সাহেব তাহার প্রার্থনা কবুল করিলেন। তাহাকে একটি দোয়াত দান করিয়া বলিলেন, "আপনি এই দোয়াতটি নিয়া ঘরে বসিয়া থাকুন। দোয়াতের কালি শুকাইতে দিবেন না, আল্লাহতা'লা আপনার রিজিক ঘরেই মিলাইয়া দিবেন।" মওলানা সাহেব হযরত প্রদত্ত দোয়াতটি লইয়া বাড়ীতে গেলেন এবং উহা লইয়া হযরতের আদেশ মত বসিয়া রহিলেন। এরপর দেখা গেল প্রত্যহ তাহার বাড়ীতে তাবিজের জন্য লোকজন আসিতে লাগিল। তিনি উক্ত দোয়াতের কালি দিয়া তাবিজ লিখিয়া দিতেন। হযরতের কালামে ও প্রদত্ত দোয়াতে এমনই খোদাদাদ রহস্য নিহিত ছিল যে, এই দোয়াতের দ্বারা তিনি যাহাই লিখিতেন, অবশ্যই সুফল ফলিত। প্রতিদিন তাহার যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা আয় হইতে লাগিল। এই দোয়াতের উছিলায় তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল অতি সুখে, সম্মান ও সুনামের সহিত স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া পরলোক গমন করেন।

তাহার পর এই দোয়াতটি এখনও তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট বিদ্যমান আছে।

টাকার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার ও কর্জ হইতে মুক্তি দান

চট্টগ্রাম হাজীরখিল গ্রামের আবদুল হালিম চৌধুরীর পুত্র আহমদ মিঞা চৌধুরী বলেন, আমার বয়স যখন ৯/১০ বৎসর তখন একদিন আমার পিতার সহিত আমি দরবার শরীফ হযরতের খেদমতে আসি। আমরা আসিতে হযরতের জন্য এক সের গরুর দুধ সঙ্গে আনি। আমি ও আমার বাবা হযরতের কদমবুচি করিয়া দুধগুলি তাঁহার সামনে পেশ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করিলেন, "এই ছেলেটি কার?" বাবা নিজের ছেলে বলিয়া পরিচয় দিলেন। হযরত সাহেব আমাকে বলিলেন, "তোমার পেট খুব বড়। তুমি সাত গ্লাস সরবত পিও।" এই বলিয়া আমাদের আনিত দুধ দ্বারা সরবত তৈয়ার করিয়া একগ্লাস নিজে পান করিলেন এবং আমাকে সাত গ্লাস সরবত পান করাইলেন। উপস্থিত আরো দশ বারোজন লোক ছিল। তাহাদের প্রত্যেককে একগ্লাস করিয়া সরবত পান করাইলেন। ইহার পরও দেখি যে আমাদের আনিত দুধ দ্বারা প্রায় বিশ গ্লাস সরবত তৈয়ার করার পর দুধ যেন পূর্ব পরিমাণ মত জমা রহিয়াছে।

তৎপর হযরত নিজ হাতে পঁচিশটি টাকা নিয়া বলিলেন, "তোমার পেট বড় ভারী তুমি টাকাগুলি খাও।" আমি টাকাগুলি হাতে লইতে চাহিলাম। তিনি আমার হাতে না দিয়া টাকাগুলি আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এবং বলিলেন, চলিয়া যাও। তুমি আমার গোলাম।"

বিদায়ের পর আমার মনে নানা প্রকার প্রশ্ন জাগিতে লাগিল। তাঁহার কার্যকলাপ

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সবই আমার কাছে বিপরীত মনে হইল। আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি নিয়তে এখানে আসিয়াছেন। আমাকে কেন এইরূপ বলিলেন। বাবা উত্তরে বলিলেন যে, বর্তমানে তিনি অনেক টাকা কর্জদার আছেন।

আমারা বাড়ীতে গেলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার বাবার রোজগার হইতে লাগিল। এমন কি এক বৎসরের মধ্যে আমার বাবা সমস্ত কর্জ পরিশোধ করিয়া স্বচ্ছল হইয়া গেলেন।

তখন আমার বুঝে আসিল, হযরত কেন আমাকে টাকা মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি হয়তঃ ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে, বিনা চেষ্টায় আমাদের উপার্জন হইবে। বাস্তবিকই আমার বাবাকে লোকে ডাকিয়া নানা উছিলায় টাকা দিতেন। ইহা একমাত্র হযরতের দোয়া ও আধ্যাত্মিক শক্তিতেই হইয়াছিল।

উকিল বাবুর প্রেরিত কলা রাখিয়া দুগ্ধ ফেরত

ফটিকছড়ি থানা, নাম অতি সুন্দর, মাইজভাণ্ডার গ্রাম এক, তাহার ভিতর।
শুভক্ষণে শুভযুগে দয়া করি আল্লাহ, সেই দেশে জন্মাইল শাহ্ আহমদ উল্লাহ।।
সুপণ্ডিত আরবীতে মুখস্থ কোরান, ফকির মওলানা বলে বিস্তর সম্মান।
বাল্যাবধি স্বধর্মেতে ছিলেন নিষ্ঠাবান, করিতেন জগতের সতত কল্যাণ।।
নিরপেক্ষ লোক তিনি প্রসিদ্ধ ফকির, মনুষ্য কুলেতে হন সকলের পীর।
মানবের উপকার করিবার তরে, সতত প্রস্তুত ছিলেন প্রফুল্ল অন্তরে।।
নানা জিলা হতে লোক আসিয়া তথায়, ইচ্ছামত কার্যলভে তাঁহার কৃপায়।
দেশদেশান্তরে আছে তাঁহার বড় নাম, সর্বলোক ঘোষে যশঃ কীর্তি অনিবার।।
লোকের মনের কথা জানিতেন তিনি, নানা প্রকার গুণ ছিল অতি বড় জ্ঞানী।
ভোগ লিপ্সা নাহি ছিল তাঁহার অন্তরে, খেতে দিতেন অতিথিরে নানা উপচারে।।
শিষ্য সাগরিদ আছে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, কার্যসিদ্ধি হয় সবার তাঁর নাম নিলে।
ফটিকছড়ির নববাবু উকিল সরকার, জ্ঞাতিজ্যেষ্ঠ ভাই হয় সম্পর্কে আমার।।
কার্যেপলক্ষে আমি সেই বাসায় ছিনু, ফকিরের গুণ দেখি আশ্চর্য হইনু।
উকিল বাবুর এক গাভী প্রসবিল, বহুদুগ্ধ গাভী হইতে পাইতে লাগিল।।
ভাগ্যক্রমে সেই সময় বাসাতে তাহার, পাকিল কাবুলি কলা অতি চমৎকার।
তাহা দেখি নববাবু ভক্তি সহিতে, দুগ্ধ কলা দিতে চাইলেন ফকীর বাড়ীতে।।
কহিল মনের কথা কেরানীর ঠাই, অদ্যকার দুগ্ধ সব তথা দিতে চাই।
কেরানী শুনিয়া তাহার মনে মনে ভাবে, তিন সের দুগ্ধ ফকীর নাহি খাইবে।।
জনৈক বাহক দিয়া কলা দুই কান্দি, একসের দুগ্ধ দিল ভান্ড মুখ বান্দি।
ফকীরের কাছে গিয়া বাহক কহিল, উকিল সরকার বাবু দ্রব্য পাঠাইল।।
"এত দুধ নাহি খায়" ফকির কহিয়া, কলা রাখি দুগ্ধ সব দিলেন ফিরাইয়া।
বলিলেন, ফকির এত দুগ্ধ নাহি খায়, বুঝিতে না পারি তার কিবা অভিপ্রায়।।

তদন্ত করিয়া জানি কেরানীর কথা, পরদিন পাঠাইল সবদুধ তথা।
ফকীর সন্তুষ্ঠ হইয়া রাখে সেই দুগ্ধ, চক্ষে তাহার গুণ দেখি হইলাম মুগ্ধ।।
মোক্তার অনুকুল চন্দ্র বিশ্বাস-চট্টগ্রাম কোর্ট কর্তৃক রচিত

হযরতের নির্দেশে হিজরতে বিস্ময়কর উন্নতি

একদা রাউজান থানার গচ্ছিকুল নিবাসী হযরতের এক ভক্ত ওয়ালী মস্তান সাহেব, অত্যন্ত অভাব অনটনে ছিলেন। তাহার বহু টাকা কর্জ হইয়া গিয়াছিল। তিনি একদিন নিরুপায় হইয়া হযরতের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, "হুজুর আমি একজন হুজুরের গোলাম। খুব অভাব অনটনে আছি। অনেক টাকা কর্জ হইয়াছে। আমার এমন জায়গা জমি নাই, যাহাতে কর্জ শোধ করিয়া দৈনন্দিন খরচ নির্বাহ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারি। আমাকে এই অনটনের আজাব হইতে রক্ষা করার আদেশ হয়। না হইলে আমার ইজ্জত রক্ষা হইতেছে না।

হযরত উত্তর করিলেন, "হিজরত কর।"

ওয়ালী মস্তান, হযরতের আদেশ মত গচ্ছিকুল ত্যাগ করিয়া রাঙামাটি হিজরত করিলেন। তথায় তাহার নানা প্রকার উপার্জন হইতে লাগিল, লোকজন তাহাকে খুব ভক্তি করিত। ইহাতে ক্রমে তাহার অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গেল। তাহার বিস্তর জায়গা জমি ও টাকা পয়সা জমিয়া গেল। বর্তমানে ওয়ালী মস্তান সাহেবের ছেলে-হাজী ইমামুদ্দিন সাহেব সেখানকার বাসিন্দা হিসাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি একজন ধনীলোক বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত। সেখানে তাহার পিতা ওয়ালী মস্তানের মাজার আছে। তাহার মাজারের উপর পাকা দালান নির্মাণ করা হইয়াছে। এইরূপ হযরত তাহাকে হিজরত করাইয়া, তাঁহার শুভদৃষ্টি দ্বারা ধনী ও সুপরিচিত করাইলেন।

সুদখোরের পয়সা নিক্ষেপান্তে দেহে প্রভাব বিস্তার ও রহস্যময় কেরামত প্রদর্শন

নোয়াখালী জেলার রৌসন আলী নামক এক সুদখোর একদিন হযরতের খেদমতে আসিল। সে হযরতের সামনে আট আনা পয়সা দিল। তাহার প্রতি হযরতের দৃষ্টি পড়িতেই হযরত জালাল হইয়া উঠিলেন এবং পয়সা বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। সে পয়সাগুলি আবার আনিয়া হযরতের সামনে দিল। হযরত পয়সাগুলি পুনরায় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। সে আবার যাইয়া পয়সাগুলি কুড়াইয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর আট আনা পয়সা আপনার কাছে কিছুই নহে বটে-কিন্তু আমার কাছে মূল্যবান। আপনি ছাড়া আমার গোনাহ্ মাফ করাইতে পারে-এমন আর কেহ নাই মনে করিয়াই আপনার খেদমতে আসিয়াছি।" ইহা বলিয়া আবার পয়সাগুলি হযরতের সামনে রাখিল। হযরত

এবারও পয়সাগুলি সজোরে বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। সে আবার উহা কুড়াইয়া আনিল এবং বলিতে লাগিল "আমার গোনাহ্ মাপ-না হওয়া পর্যন্ত আমি যাইব না। আমার গোনাহ্ মাফ করাইতেই হইবে।"

তৎপর হযরত যেন তাহার প্রতি সহৃদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার হাতে একখানা বাতাসা দিলেন এবং বলিলেন, "মসজিদের পুকুরে গোসল করিয়া ইহা খাইয়া ফেল।" সে হযরতের আদেশে মসজিদের পুকুরে গোসল করিয়া উহা খাইতেই তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল। সে পাগলামী করিতে করিতে লোকজনকে মারিতে লাগিল। হযরতের কাছে নালিশ করিলে হযরত তাহাকে বাঁধিয়া রাখার আদেশ দেন। বাঁধা অবস্থায় ঘরে সে পায়খানা প্রস্রাব করাতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পুনরায় সে অশান্তির সৃষ্টি করায় কুলাল পাড়ার লোকেরা তাহাকে পুকুরে ফেলিয়া এমন ভীষণভাবে প্রহার করে যে তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাকে হযরতের সামনে আনা হয়। হযরত তাহার হাতে একখানা মিঠাই দিয়া খাইতে আদেশ দেন। সে মিঠাই খানা খাইতেই তাহার পাগলামী ভাবের পরিবর্তন হইয়া শান্তভাব ফিরিয়া আসে এবং সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পর হইতেই সে হারাম ব্যবসা ছাড়িয়া দীনদার মুত্তাকী ও খোদায়ী প্রেম প্রেরণায় দিন কাটায়। এমন করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে সুদখোরকে সংশোধন করিয়া দীনদার আশেক করিয়া লইলেন ও হারাম কার্য ত্যাগ করাইলেন।

হযরতের অলৌকিক প্রভাবে বৃষ্টি বারি বরিষণ

এক বৎসর চাষের মৌসুমে ভাদ্রমাসে বৃষ্টিপাত একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সমস্ত দেশ খালবিল শুকাইয়া গ্রীষ্মকালের রূপ ধারণ করে। পানির অভাবে চাষ বন্ধ থাকে। রৌদ্রের প্রখরতায় ধান্য চারা সমূহ মরিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। কৃষকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। চারিদিকে-দাওয়াত, খতমে কোরান ও নানা প্রকার আল্লাহ্‌র দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা শুরু হয়। কিন্তু কিছুতেই বৃষ্টিপাত হইল না! সেই সময় শহর কুতুব নজির শাহ্ মিঞা, যিনি হযরতের একজন অন্যতম ভক্ত ছিলেন, তিনি দরবার শরীফ আসিয়া হযরতের দরবারে বৃষ্টির জন্য ফরিয়াদী হন। তিনি দুই দিন না খাইয়া-দায়েরা শরীফে পড়িয়া থাকেন। ইহার পর শেষ রাত্রে উঠিয়া তিনি বকাবকি আরম্ভ করেন। "লোকে ধান চাউল না পাইলে খোদার জন্য কোথা হইতে দিবে? খোদা কি দেখিতেছে না" এই সমস্ত বলিতে বলিতে তিনি এ'দিক ও'দিক পায়চারী করিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইল। হযরত সাহেব কেবলা; খাদেম মওলানা আহমদ ছফা সাহেবকে বলিলেন, "মিঞা! আমি নাজিরহাট যাইব। আমার কাপড় আন।" মওলানা সাহেব তাঁহার জামা কাপড় আনিয়া দিলেন। হযরত একখানা ঢিলা তহবন্দ, একটি কোর্তা ও হলদে রঙের একখানা আবা গায়ে পড়িয়া বাড়ীর দক্ষিণ দিক দিয়া বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে খাদেমগণ ও অন্যান্য হাজতী, মকছুদি অনেক লোক তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল।

বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত মরা খালটি পার হইয়া বিলে উঠিতেই একজন লোক আসিয়া হযরতকে সালাম জানাইলেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা, তোমার বাড়ী কোথায়?" লোকটি উত্তর করিল, "হুজুর খন্দকিয়া" ইহাতে হযরত জালাল হইয়া লোকটিকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মিঞা খন্দকে বেঙই থাকে। তুমি খন্দকে থাক কেমনে?"

লোকটি কাতরভাবে বলিলেন, "হুজুর আমার গ্রামের নাম খন্দকিয়া।" হযরত ভীষণ জালাল হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত লাঠি দিয়া লোকটিকে দুই তিনটি আঘাত করিলেন। পরে দক্ষিণ দিকে হাটিতে লাগিলেন। রহম আলী নামক খাদেম হযরতের ছাতি ধরিয়া পিছনে যাইতেছিলেন। কিছুদুর যাইয়া হযরতকে বলিলেন, "হুজুর, নাজিরহাট যাইতে হইলে পশ্চিম দিকে যাইতে হইবে।" হযরত তিরস্কার করিয়া তাহাকে তাড়াইলে তিনি দূরে সরিয়া গেলেন। তখন রৌদ্রের প্রখর তেজ। হযরতের গায়ে সূর্যের কিরণ পড়িতেছে। হযরত সূর্যের প্রতি তাকাইয়া তিরস্কার করিতে করিতে পথ চলিতেছেন। সামনে বাঁশের সেতু দেখিয়া আরো অধিক জালাল ও রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় রাউজান নিবাসী ডাক্তার আবদুল হামিদ সাহেব একজাম সরবত লইয়া হযরতের সামনে পেশ করিলেন। হযরত সরবতগুলি একচামিচ করিয়া সকলকে বাটিয়া দিতে নির্দেশ করিলেন। সেই সময় হযরতের চতুষ্পার্শে ৫০/৬০ জন লোক জমায়েত হইয়া গিয়াছে। সকলকে এক চামিচ করিয়া সরবত দেওয়া হইল।

হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি পরিমাণ আছে?" তিনি বলিলেন, "হুজুর আরো অনেক আছে।" আদেশ দিলেন, "তুমি এক চামিচ খাও, আমাকে এক চামিচ দাও।" তাহা করা হইলে আবার বলিলেন, "তুমি আরো এক চামিচ খাও।: তৎপর মাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এক চামিচ এই হারামজাদীর "গুপ্ত স্থানের ফাটলের মধ্যে দাও।" তিনি আরো এক চামিচ খাইলেন এবং এক চামিচ মাটিতে ঢালিয়া দিলেন। তৎপর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি আছে?" উত্তর করিলেন হুজুর এখনও আরো কিছু আছে।" বলিলেন, "হারামজাদীকে আরো তিন চামিচ দাও।" মাটিতে আরো তিন চামিচ ঢালিয়া দেওয়া হইল। হযরত আবার বলিলেন, আর কি আছে? আরো কিছু আছে বলাতে হযরত জালালী হালতে উচ্চঃস্বরে গর্জিয়া বলিলেন, "সব তাহার "ফোরজের" মধ্যে ঢালিয়া দাও।" সব মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া হইল।

অতঃপর হযরত দ্রুত বাড়ী রওয়ানা হইলে, অন্যান্যরাও তাহাদের নিজ নিজ পথে চলিয়া যায়।

খোদার কি অসীম করুণা। হঠাৎ দক্ষিণ দিক হইতে একখানা মেঘ আসিয়া সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়া গেল। সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বৃষ্টি জলে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী পৌছিল।

প্রথমে কিছু বৃষ্টি হইয়া একটুখানি থামিল। তারপর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত রহিল। পুনঃ কিছুক্ষণ থামিয়া এমনভাবে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল যে, লোকজন পর্যন্ত বাহির হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিনের বৃষ্টিতে সমস্ত নদীনালা খালবিল ভরিয়া মাঠ ঘাট জলে ডুবিয়া রহিল।

আবদুল হামিদ সাহেব বলেন, পরদিন হুজুর আমাকে বাড়ী যাইতে আদেশ দিলেন। আমি অতি কষ্টে বৃষ্টির জল ভাঙ্গিয়া বাড়ী পৌঁছিলাম।

হযরত কেবলার বেলায়তী প্রভাবে ষ্টিমার রক্ষা ও মহামারী নিবারণ

জনৈক মওলানা সাহেব বলেন, "আমি বহুপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের চেস্টা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। কোন ব্যবসাতেই সফলকাম হইতে না পারিয়া দোয়ার জন্য একদিন কিছু বাতাসা হাদিয়া লইয়া হযরতের খেদমতে রওয়ানা হইলাম। দরবার শরীফ পৌঁছিতেই দেখিতে পাইলাম-হযরত সাহেব মসজিদের দক্ষিণের রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। আমিও পিছনে পিছনে চলিলাম। তিনি মাঠের মধ্যে যাইয়াই একটি মাটির ঢেলা লইয়া জমিনের ফাটলে রাখিয়া নিজ পাদুকা দিয়া উহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া জমিনের ফাটল বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি একটি মাটির ঢেলা লইয়া বলিলাম হুজুর! আমি বন্ধ করিয়া দিব কি?" তখন হযরত আমার প্রতি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "মিঞা, দেখিতেছনা, দুইটি বলিষ্ট ভইস ঠেলাঠেলি করিয়া উপর দিকে উঠিতেছে। আমি তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম।"

তৎপর হযরত যাইয়া বিনাজুরী খালের ধারে বসিলেন! চারিদিক হইতে হাদিয়া লইয়া আগন্তুকগণ তথায় আসিতে লাগিল! বহুলোক জমা হইয়া গেল। সকলে হযরতের জন্য আনিত দ্রব্যাদি সামনে পেশ করিতে লাগিল। আমিও আমার বাতাসাগুলি হযরতের সামনে দিলাম। হযরত পাঁচখানা বাতাসা আমাকে দিয়া বলিলেন, "মিঞা! চলিয়া যাও। বাড়ীতে সকলকে খাইতে দিও এবং নিজেও খাইও। সহসা চলিয়া যাও।" আসিয়া দেখিলাম আমাদের পাড়ায় কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। দুইজন লোক মারা গিয়াছে। আরো চারি পাঁচজন লোক আক্রান্ত অবস্থায় আছে। আমি তাড়াতাড়ি তবারোকগুলি বাড়ীস্থ সকলকে বন্টন করিয়া দিলাম। সামান্য নিজেও খাইলাম।

কলেরায় পাড়ার অনেক লোক মারা গেল প্রায় সকলেই আক্রান্ত হইল। খোদার কৃপায় আমাদের বাড়ীতে যাহারা এই তবারোক খাইয়াছিল, তাহারা সকলেই নিরাপদে রহিল।

কিছুদিন পরে আমি পুনরায় মাইজভাণ্ডার শরীফে যাই। সেই দিন আরো একজন ব্যবসায়ী লোক, হযরতের দরবারে সওগাত হাদিয়া লইয়া উপস্থিত হন। তিনি দরবারের লোকের নিকট প্রকাশ করেন যে, কিছুদিন পূর্বে তিনি ছোট একখানা স্টিমারে করিয়া কিছু সওদা লইয়া আরকান হইতে আসিতেছিলেন। পথে সমুদ্রে তাহার স্টিমারখানা বিপদে পতিত হয় এবং স্টিমারে ছিদ্র হইয়া যায়। তখন স্টিমারে প্রবলবেগে পানি উঠিতে থাকে, তিনি নিরুপায় হইয়া নিয়ত করিলেন, আল্লাহতা'লা যদি তাহাকে জানে মালে নিরাপদে রক্ষা করেন তিনি বাড়ী যাইয়া মালগুলি বিক্রয় করিয়া মাইজভাণ্ডারী হযরত সাহেব কেবলার জন্য হাদিয়া লইয়া দরবার শরীফ যাইবেন। স্টিমার কর্মচারীগণ তখন

ছিদ্র বন্ধ করিতে প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেছে। স্টিমার তখন প্রায় ঘাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে কি যেন হইয়া গেল। স্টিমারের পানি উঠা বন্ধ হইল। স্টিমার ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। খোদার অপার রহমতে এবং হযরতের দয়ায় তাহার মালপত্র রক্ষা পাইল। তিনি তাই তাহার নিয়ত মতে দরবারে পাকে হাজির হইয়াছেন।

লোকটির বর্ণনামতে দেখিলাম-তাহাদের স্টিমার দুর্ঘটনার তারিখ এবং আমি যেইদিন হযরতের দরবারে বাতাসা লইয়া আসিয়াছিলাম এবং হযরত সাহেব মাটির ঢিলা দিয়া জমির ফাটল বন্ধ করিয়াছিলেন তাহা একই তারিখ ও একই সময়। হযরতের পবিত্র কালাম "আগুন জ্বলিতেছে সহসা বাড়ী যাও।" তাহার মর্ম আমি বাড়ীতে গিয়াই বুঝিয়াছিলাম কিন্তু তাহার ঢেলা দিয়া ফাটল বন্ধের তাৎপর্য উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনার পর বুঝিতে পারিলাম।

কিছুদিন পর আমি গাছের ব্যবসা আরম্ভ করি। হযরতের দোয়ায় তাহাতে বিশেষভাবে লাভবান হই। বর্তমানে চট্টগ্রাম ষ্ট্র্যান্ড রোডে আমার যেই হোটেলটি আছে, তাহা হযরত সাহেবেরই দান।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের বেলায়তী প্রভাবে মৃত্যুকালে আজরাইল ফেরত ও ষাট বৎসর আয়ু বৃদ্ধি

হযরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) সাহেবের দরগাহ শরীফের খাদেম শাহ্ মনিরুল্লাহ সাহেব হযরতের মুরিদ ও অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিলেন, কোন এক সময় তাহার প্রতিবেশী আবদুল কাদের সাহেব এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎসা করা হইল, কোন প্রকার আরোগ্য লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার কবিরাজগণ আশা ত্যাগ করেন। ইহাতে তিনি এবং তাহার আত্মীয়স্বজন আল্লাহতা'লার মেহেরবাণী ও তাঁহার আউলিয়াদের শরণাপন্ন হন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাহার গোনাহ মাফের জন্য নানা প্রকার দান খয়রাত ও সিন্নি ছদ্‌কা আদায় করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি মওলানা মনিরুল্লাহ সাহেবকে ডাকাইয়া তাহার বাড়ীতে নিলেন এবং কাঁদিয়া বলিলেন, হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) এঁর মাজারে যেন তাহার জন্য দোয়া করেন। তিনি বলিলেন যে, তাহার জীবন বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে তাহার মৃত্যুভয় হইতে তাহার পাপের ভয়ই বেশী পীড়া দিতেছে।

মওলানা সাহেব তাহাকে বলিলেন, "ভাই সময় থাকিতে পরকালের ভাবনা করেন নাই, অসময়ে উপায় খুঁজিয়াই বা কি করিবেন। এখন এক মাত্র কামেল পীরের নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমি দেখিতেছিনা।" আবদুল কাদের সাহেব তাহার নিকট কামেল পীরের সন্ধান জানিতে চাহিলেন। মওলানা সাহেব বলিলেন, "বর্তমানে মহাশক্তিবান, স্মরণের সঙ্গে স্মরণকারী ভক্তকে উদ্ধার করিতে পারে এবং তাহাকে পাপমুক্ত করাইয়া পলকে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে পারে, এমন দয়াল অলি উল্লাহ বর্তমান গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাড়া অন্য কেহ আছে বলিয়া তো আমি মনে করি না। আপনার ভক্তি বিশ্বাস হইলে আপনি মনে মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও আন্তরিকতার সহিত আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার উছিলায় আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে পারেন। আমার বিশ্বাস আপনাকে আল্লাহ অতি সত্বর কৃপা করিবেন।"

হযরত সাহেবের নাম শুনিয়া তাহার মনপ্রাণ যেন গলিয়া গেল। মৃত্যুমুখির হতাশ হৃদয়ে যেন এক নূতন আশার জাগরণ হইল। তিনি সর্বান্তকরণে হযরতের প্রতি নিজকে সমর্পণ ও রুজু করিলেন। এবং জীবনে বাঁচিয়া শক্তি পাইলে তাঁহার খেদমতে আত্মনিবেদন করিবেন নিয়ত করিলেন।

আল্লাহতা'লার কি অভাবনীয় খেলা। গাউছে পাকের কি অসীম দয়া, বলিতে না বলিতে সেই মুহূর্তেই মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিল। তাহার ভীষণ "ছাকরাত" আরম্ভ হইল, তাড়াতাড়ি তাহাকে উত্তর শিরানা করা হইল। আত্মীয়স্বজনগণ মৃত্যু কালিন অনুষ্ঠানাদি করিতে লাগিলেন।

প্রায় ঘন্টাকাল ছকরাতের পর হঠাৎ আল্লাহ্‌র মহিমা যেন আকাশ হইতে নামিয়া আসিল। ধীরে ধীরে তাহার ছকরাত লাঘব হইতে শুরু হইল। কিছুক্ষণ পর দীর্ঘ নিশ্বাসে তিনি চক্ষু উম্মিলন করিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন এবং করুণ কাতর স্বরে মহান খোদাতা'লার শোকরিয়া আদায়ে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলিয়া উঠিলেন।

তখন মওলানা সাহেব তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! কেমন বোধ হইতেছে, আপনি এমন করিতেছেন কেন?

কাদের সাহেব প্রায় সুস্থ লোকের মত, নরম অথচ আবেগময় স্বরে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সাহেব আমি আপনার উপদেশ মত হযরত সাহেবের উছিলায় আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাহিয়া মনে মনে তাঁহার শরণাপন্ন হইতেই যেন তন্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেই অবস্থায় দেখিতে পাই যে, একজন ভীষণাকৃতির মানব উলঙ্গ কৃপাণহস্তে দৌড়িয়া আসিয়া আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল এবং আমাকে জবেহ করিতে উদ্যত হইল। তখন আমার এমন ভীষণ ভয় ও কষ্ঠ হইতেছিল যে, যাহা আমি ভাষায় বলিতে পারিব না। ঠিক সেই সময় একজন বৃদ্ধলোক বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া আসিয়া ঘাতকের হাত হইতে ভীষণ অস্ত্রখানা ছিনাইয়া লইলেন এবং ধাক্কা দিয়া আমার বক্ষ হইতে নামাইয়া দিলেন। উক্ত ভীষণাকৃতি লোকটি তখন দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। আমি এই মহা কষ্ট ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতেই দেখিতে পাই যে ঐ বৃদ্ধ মহাপুরুষটি হযরত সাহেব কেবলাই। তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আর চিন্তা করিওনা, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করিয়াছেন এবং তোমার আরো ষাট বৎসর আয়ু বাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তোমার বাবা ইন্তেকাল করিয়া যাইবেন। তুমি আরোগ্য লাভ করিয়া ওয়াদা মত আমার সাথে দেখা করিও। আমি তোমার জন্য জেয়াফতের খানা রাখিয়াছি।" এই কথা বলিয়া আমি কিছু বলার পূর্বেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমার তন্দ্রা ও অস্থিরতা দূরীভূত হইল। তাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতে করিতে চক্ষু উম্মিলন করিলাম। এখন আমার মনে হইতেছে আমি প্রায় সুস্থ। আমার সর্বাঙ্গ যেন অতি হালকা অনুভূত হইতেছে।"

তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। এক সপ্তাহ পর ঠিকই তাহার পিতা ইন্তেকাল করিলেন। এক মাস পর কাদের সাহেব সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া আমার সঙ্গে দরবার শরীফে আসিয়া হযরতের নিকট বায়াত গ্রহণ করিলেন। এবং হযরতের জেয়াফতের খানারূপী ফয়েজ অর্জন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে হযরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়, স্মরণকারীকে আজরাইল হইতে ছিনাইয়া লইয়া আরো ষাট বৎসর আয়ু বাড়াইয়া দিলেন! আল্লাহ পাক তাঁহার দোস্তদের প্রতি কি ক্ষমতাই অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। তাই হাদিছে বলেন, অলিরা আল্লাহ্‌রই ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁহারা যাহা করেন তাহা আল্লাহই করিয়া থাকেন।

হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় আজরাইল হইতে রক্ষা ও মৃত্যুর সময় পরিবর্তন

মাইজভাণ্ডার নিবাসী মুন্সী ইজ্জত উল্লাহ সাহেবের পুত্র মওলানা আবদুল গণি সাহেব হযরত কেবলার একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবত শারীরিক অসুখে ভূগিয়া অতিশয় কাতর হইয়া যান। অভাবের দায়ে তিনি কোন ভাল ঔষধও ব্যবহার করিতে পারেন নাই। একদিন হঠাৎ তিনি বেহুস ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাহার অন্তিম লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে উত্তর শিতানায় কলেমা পড়িয়া পানি দিতে থাকে। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আজরাইল কদাকার ভীষণ আকৃতিতে একখানা অসি হাতে তাহার বুকে বসিয়া গলায় অসি চালাইতে উদ্যত। এমনি সময় হঠাৎ গাউছুল আজম হযরত সাহেব কেব্‌লা হাজির। তাহার অসি ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখনই ফিরিয়া যাও। আমি তাহাকে এক সপ্তাহের সময় দিলাম। তাহার সাথে আমার দরকারী কাজ আছে।" তখন আজরাইল হযরতকে কিছু বলিতে চাহিলে, তিনি অতিশয় নারাজ ও জালাল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখনই যাও। তোমার খোদাকে আমার কথা বলিও। আমি সময় দিয়াছি।" তখন আজরাইল চলিয়া গেল, তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

এই ঘটনার তিন দিন পর কাঞ্চনপুরী মওলানা আবদুল গণি সাহেব হযরতের খেদমতে আসিয়াছিলেন। উক্ত মওলানা সাহেবের সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি এই ঘটনা বলিবার মত মনের মানুষ পাইতেছিলেন না। এমন সময় কাঞ্চনপুরী মওলানা সাহেব আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাহাকে ডাকিয়া নিলেন এবং অতি কষ্টে বিস্তারিত ঘটনা তাহাকে জানাইলেন। মওলানা সাহেব হযরতের এই অপূর্ব লীলা ও ক্ষমতার কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। ইহার চারিদিন পর উক্ত মওলানা সাহেব মারা যান।

এই ঘটনা মওলানা কাঞ্চনপুরী সাহেব তাঁহার আয়নায়ে বারী নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুকালে হযরতের দর্শন দানে ছকরাতি কষ্ট লাঘব ও ঈমান রক্ষা

নানুপুর নিবাসী মুন্সী নেছার আহমদ সাহেব হযরতের একজন শিষ্য ছিলেন। তাহার মৃত্যু কালীন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, তাহার আত্মীয়স্বজনগণ একজন মওলানা ডাকিয়া মৃত্যুসময়ে তওবা করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি তখন পীরভাই মওলানা আবদুচ্ছালাম ইছাপুরী ছাড়া কাহারো নিকট তওবা করিবে না বলিয়া প্রকাশ করেন।

মওলানা আবদুচ্ছালাম সাহেবকে তালাশে পাওয়া না যাওয়ায় অন্য মওলানা আনিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "আমার পীর হযরত সাহেব কেব্‌লা, বাবাজান কেবলা ও ছোট মওলানা আমিনুল হক সাহেব আমার সামনে উপস্থিত আছেন। আমাকে তাঁহারা তলকিন করাইতেছেন।" ইহা বলিতেই একটু মৃদু হাসিয়া তিনি ইন্তেকাল করেন। তাহার মৃত্যুকালে কোন প্রকার কষ্টই হয় নাই। বরং কথা বলিতে বলিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে দর্শনদানে ঈমান রক্ষা

মওলানা মীর আহমদ সাহেব বলেন, "আমার চাচা মওলানা আবদুল হাকিম সাহেব হযরতের মুরিদ ছিলেন। তিনি একশত এক বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তিনি বার বার হযরত কেবলাকে কদমবুচি করিতে উদ্যত হন এবং বলেন, "আমার হযরত তশরীফ আনিয়াছেন কলেমা স্মরণ করাইতেছেন।" কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন, "না আমি এক ছাড়া দ্বিতীয় জানিনা। না আমি দুই বলিতে পারিব না, ইহা আমার পীরের ছবক।" ইহা বলিয়া কলেমা শাহাদাত পড়িতে পড়িতে কোন প্রকার ছকরাত ছাড়া তিনি ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে হযরতের দর্শন দান

রাউজান নয়াপাড়া নিবাসী ডাঃ ফজলুল করিম বর্ণনা করেনঃ-

আমার পিতা হেকিম নুরুজ্জমান সাহেবের ওফাতকাল নিকটবর্তী হইলে স্থানীয় একজন মওলানা সাহেব তাহাকে বলেন, "আপনার সময় বোধ হয় অতি সন্নিকট। আপনার তওবা করা উচিত।" আমার বাবাজান উত্তর করিলেন "আমার মুর্শিদে কামেল হযরত সাহেব কেবলা সদাসর্বদা আমার সামনে উপস্থিত আছেন। যাহা কিছু দরকার হয় তিনিই করিবেন। আমার তওবার আর দরকার নাই। আপনারা জুমার নামাজ শেষ করিয়া সহসা চলিয়া আসিবেন।"

আমরা সকলে নামাজ পড়িয়া আসিলাম। ৭ই রমজান শুক্রবার জুমার নামাজের পর আমার বাবাজান কলেমা পড়িতে পড়িতে নশ্বর জগত ত্যাগ করিয়া জান্নাতবাসী হইলেন।

(আল্লাহ তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন)

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

খাদ্যের মধ্যে হযরতের প্রভাব

আজিম নগর নিবাসী ফয়জুর রহমানের পুত্র আলী আহমদ, অনেক বৎসর ভাণ্ডারখানায় মেহমান খাওয়ান ও মোছাফেরদের খেদমতে খাদেম ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, অনেক সময় নির্দিষ্ট মোছাফের ও মেহমানদের খানা তৈয়ার হওয়ার পর হঠাৎ বহুলোক আসিয়া পড়িল। তখন হযরত সমীপে আরজ করিলে, তিনি খাদ্যদ্রব্যাদি তাঁহার সম্মুখে নিতে আদেশ করিতেন। তাঁহার সামনে নেওয়া হইলে তিনি একটু একটু পরিদর্শন পূর্বক বলিতেন; "ইহাই যথেষ্ট হইবে। বিসমিল্লাহ পড়িয়া রীতিমত দিতে থাক।" তাঁহার আদেশমত দিতে দিতে পরে দেখা যাইত খানা আরো দুই একজনের পরিমাণ উদ্ধৃত্ত থাকিয়া যাইত। একবারের বেশী দুইবার খানা দিতে চাহিলে কেহই লইতে রাজি হইত না। তাহারা প্রথম বারেই তৃপ্ত হইয়া যাইত।

একদিন রাত্রে হযরতের মোছাফের খানায় ১৬ জন লোকের খানা তৈয়ার করা হয়। এমন সময় মিরশ্বরাই নিবাসী ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী সাহেব অনেক রাত্রে ২৪/২৫ জন লোক নিয়া উপস্থিত হন।

তখন পূর্বোক্ত আলী আহমদ খাদেম হুজুরের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, "হুজুর এখন উপায় কি? মাত্র ১৬ জন মেহমানের খানা তৈয়ার করিয়াছি। রাত্রও অধিক হইয়াছে। ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী সাহেব প্রায় ২৪/২৫ জন লোক লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

হযরত বলিলেন, "খাদ্য সামগ্রী কি পরিমাণ আছে? সব আনিয়া আমাকে দেখাও।" সমস্ত খাদ্য সামগ্রী হযরতের সামনে আনা হইল। হযরত প্রত্যেকটি পাত্রই ঢাকনী উঠাইয়া নাড়িয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, "মিঞা! ইহাই সকলের জন্য আল্লাহ্‌র ফজলে কাফি হইবে। তুমি বিছমিল্লাহ পড়িয়া দিতে থাক!"

অতঃপর খাদেম আলী আহমদ ১৬ জনের খাদ্য ৪০ জনকে পরিতৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন। পরে দেখা গেল, আরো প্রায় ২/৩ জনের খানা ভাণ্ডে রহিয়া গিয়াছে।

হযরতের প্রভাবে অল্পখাদ্যে তৃপ্তি

নোয়াখালী জিলার বভপুর নিবাসী আবদুস শুকুর সাহেব বলেন, আমি একদিন ফেণী কোর্টের পেস্কার মওলানা মকবুল আহমদের সহিত হযরতের দরবারে আসি। হুজুর হইতে বিদায়ান্তে মোছাফের খানায় বহুলোকের সাথে আহার করিতে বসি। পরিবেশনকারী খাদেম প্রত্যেক মেহমানকেই বড় তিন চামিচ করিয়া প্রথমবার খানা দিয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া মুন্সী সাহেব পেস্কার সাহেবকে বলিলেন, এই খানায় কি হইবে? পেস্কার সাহেব তাহাকে বলিলেন, চুপ থাক। এই মোবারক দরবারের কেরামত ও বরকত অন্যরূপ। যাহা দিবে তাহাতেই তৃপ্তি পাওয়া যায়। মুন্সী সাহেব এই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি পরিবেশনকারী খাদেমের অলক্ষ্যে দুই চামিচ খানা লইয়া বাসনে চাপিয়া রাখিলেন। তৎপর খাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক লোককেই খানা যাচনা করা হইল। কেহই আর দ্বিতীয়বার খানা লইল না। উক্ত খানায় প্রত্যেকেই তৃপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু উক্ত মুন্সী সাহেবের বাসনে প্রায় দুই চামিচ পরিমাণ খানা রহিয়া গিয়াছে দেখিয়া পেস্কার সাহেব তাহাকে তবরোকী খানা সব খাইয়া ফেলিতে বলিলেন। মুন্সী সাহেব বলিলেন যে, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, পারিতেছেন না। বমি আসিতে চায়। তাহার কেন রহিয়া গিয়াছে, অনুসন্ধানে-জানা গেল যে, মুন্সী সাহেব খাদেমের অগোচরে দুই চামিচ নিজে লইয়া ছিলেন। তখন সকলেই হযরতের মঞ্জুরী খানায় তাঁহার কেরামত বুঝিতে পারিল।

হযরতের অল্প দ্রব্য অসংখ্য লোকের মধ্যে বন্টন

একদিন হযরতের খেদমতে কোন এক ব্যক্তি কিছু লিচু লইয়া হাজির হন। সেই সময় হযরত নিতান্ত জজ্‌বাতী অবস্থায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি শান্ত অবস্থায় আসিয়া সুমধুর স্বরে কোরান তেলাওয়াত করিতে লাগিলেন। শাহজাদা ফয়জুল হক সাহেব তখন অবসর হইয়া হযরতের সামনে লিচুগুলী পেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হুজুর! এই লোকটি লিচুগুলি আপনার জন্য আনিয়াছেন। হযরত নিজহস্তে লিচুগুলি লইয়া সকলকে একটি একটি করিয়া বন্টন করিয়া দিলেন। অবশেষে দেখা গেল যে অল্প লিচু আছে কিন্তু তখনও অনেক লোক রহিয়াছে। হযরত তখন লিচুগুলি নিজ হাতের মুঠায় লইলেন। এবং একটি একটি করিয়া সবাইকে দেওয়ার পর দেখা গেল যে হযরতের হাতে আরো একটি লিচু অবশিষ্ট রহিয়াছে। সেই লিচুটি তিনি নিজে খাইলেন। উপস্থিত লোকেরা ইহা দেখিয়া আশ্চার্য না হইয়া পারিলেন না। হাতের মুঠায় ৫/৬ টির বেশী লিচু লওয়া যায় না, অথচ হযরত এক মুঠি লিচু ১৫/২০ জনকে দিয়াও একটি লিচু নিজ হাতে রাখিয়াছিলেন। সকলে বুঝিল ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কেরামত।

হযরতের প্রভাবে ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত সুযোগ অর্জন

মোহরা জান আলী চৌধুরী বাড়ীর কালামিঞা চৌধুরী সাহেব বলেন, আমি কোন এক সময় নানারূপ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া একেবারে খালী হাতে ও দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়ি। রুজি রোজগারের কোন সুপন্থা স্থির করিতে না পারিয়া একপ্রকার নিরুপায় হইয়া হযরতের দরবারে আশ্রয় লইতে আসি। আমি যখন তাঁহার খেদমতে আসি দেখিতে পাই যে, তিনি বাড়ী হইতে উত্তর দিকে যাইতেছেন। এমন সময় আমি তাঁহাকে কদমবুচি করিয়া আরজ করিলাম, হুজুর! আমি বর্তমানে আর্থিক অনটনে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছি। আপনার দোয়া চাই। হযরত যথারীতি নাম, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও উত্তরে নাম বলিয়া পরিচয় দিলাম।

হযরত সামনে কয়েক কদম হাঁটিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; এখন সবেকদর, কি চাও? আমি বলিলাম, হুজুর! আর্থিক কষ্ট হইতে মুক্তি চাই। তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, যাও মিঞা হাজীদের খেদমত কর। তোমার কষ্ট চলিয়া যাইবে। চলিয়া যাও।

হযরত বিদায় দিলেন। পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম কিভাবে হাজীদের খেদমত করিব। আমার কাছে তো টাকা পয়সা কিছুই নাই। বাড়ীতে আসিয়া প্রায় ৪/৫ দিন পরে, এক সময় চট্টগ্রাম শহরে সদরঘাটে বেড়াইতে যাই। তথায় জেটিতে আমার সাথে ম্যাকানীন ম্যাকাঞ্জি কোম্পানীর ম্যানেজার সাহেবের সহিত দেখা হয়। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, চৌধুরী সাহেব, এই বৎসর চট্টগ্রামে হাজীদের ক্যাম্প করার হুকুম হইয়াছে। আপনি আমাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারেন কি? আমি বলিলাম, কি সাহায্য আমি করিতে পারি আপনাকে জনাব? আপনি আমার কোম্পানীর অধীনে থাকিয়া হাজীদের রসদ সরবরাহ করিবেন। আমি কোম্পানীর নিকট হইতে আপনাকে অগ্রিম টাকা লইয়া দিতে পারিব।

তখন হযরত সাহেবের আদেশের কথা আমার মনে পড়িল। আমি তখনই রাজী হইয়া গেলাম। তিনি আমাকে টাকা পয়সা সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি সুচারুরূপে রসদ সরবরাহ করিতে লাগিলাম। হযরতের আদেশের বরকতে এবং আল্লাহতা'লার মেহেরবাণীতে আমার প্রচুর উপার্জন হইয়া অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া যায়। সেই হইতে আমি হযরতের ভক্ত হইয়া পড়িলাম। প্রতি বৎসরই তাঁহার খেদমতে নজর নেয়াজ হাদিয়া নিয়া উপস্থিত হইতেছি।

হযরতের আদেশে হিজরত করিয়া অপূর্ব অর্থশালী

রাউজান থানার অধীনে মগদাইর মৌজার আবদুল করিম সাহেব ছোটকাল হইতে হযরতের দরবারে খেদমতে ছিলেন। তাহার বয়স যখন ১৫/১৬ বৎসর হয়, তখন তাহার

মনে সংসার করিতে বাসনা জন্মে। একদিন হযরতের সমীপে তাহার বাসনা প্রকাশ করিয়া বিদায় চাহিল। হযরত কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলিয়া উঠিলেন, "আবদুল করিম! তোম হিজরত করো।" আবদুল করিম তখন বুঝিল হযরত তাহাকে জন্মভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস করিতে নির্দেশ দিতেছেন। আবদুল করিম আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইল। অতঃপর বাড়ী যাওয়ার কয়েকদিন পরে বার্মা চলিয়া যায়। সেখানে চাঁদা নামক শহরে বসবাস আরম্ভ করে। সে সেখানে ফেরী ব্যবসা করিয়া বেশ উন্নতি করে। ক্রমে আবদুল করিম ব্যবসা বাড়াইয়া সুনাম অর্জন করে। বর্তমানে উক্ত আবদুল করিম একজন ধনপতি। তাহার ধনসম্পদ হযরতের কেরামত প্রভাবে ও অপূর্ব দয়ায় প্রাপ্ত।

নানুপুর নিবাসী সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব বলেন, ১৬/১৮ বৎসর পূর্বে আমি যখন ছুটি উপলক্ষে আকিয়াব পোস্ট অফিস হইতে বাড়ী আসিতেছিলাম, পথে স্টিমারে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সাথে উঠি। তথায় উক্ত ধনকুবের আবদুল করিম সওদাগরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। পথে আলাপ প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় দিয়া আমাকে তাহার সম্পূর্ণ কাহিনী বলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "হায় আমি কি ভুল করিয়াছি। যদি আমি চাইতাম তিনি আমাকে আবদাল বানাইয়া দিতেন।" ইহা বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

হযরতের আদেশে রেয়াজ উদ্দিন উকিলের ভূ-সম্পত্তি খরিদ ও রেয়াজউদ্দিন বাজারের পত্তন

মরহুম মওলানা রেয়াজউদ্দীন আহমদ উকিল সাহেব একদিন হযরতের খেদমতে দোয়া প্রার্থী হইলেন। হযরত তাঁহাকে হুকুম করিলেন, "যোগিনীর জায়গা খরিদ কর। তাহাতে তোমার আর্থিক অনটন চলিয়া যাইবে।" বাড়ী আসিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন যোগিনীর জায়গা তিনি খরিদ করিবেন। টাকা পয়সাও এমন নাই। কয়েকদিন পর এক যোগিনী আসিয়া তাহার কাছে বর্তমান রেয়াজউদ্দিন বাজার যেখানে অবস্থিত, সেই জায়গাটি বিক্রয় করিতে চাহিল। উকিল সাহেব বিনা দ্বিধায় হযরতের আদেশ মত উক্ত জঙ্গলাকীর্ণ জায়গাটি অতি অল্পমূল্যে যোগিনী হইতে খরিদ করিয়া লইলেন। কিছুদিন পর রেলওয়ে কোম্পানী আসিয়া উক্ত জায়গার দক্ষিণ পার্শ্বে রেলওয়ে স্টেশন করার মানসে জরিপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি হযরতের কালাম পাকের প্রতি আস্থাবান হইলেন, দিন দিন জায়গার গুরুত্ব বাড়িতে লাগিল। তিনি সেই স্থানে বাজার পত্তন করিতে চেষ্টা করিলেন। ক্রমে চকবাজার মোহছেনিয়া মাদ্রাসার পাহাড় হইতে চট্টগ্রাম কোর্টও বর্তমান কাছারী পাহাড়ে আসিয়া পড়ে। কাজেই তাহার বাজার অতিশয় চালু ও উন্নতিশীল হইয়া গেল। ক্রমান্বয়ে তাহার অবস্থার অপ্রত্যাশিত উন্নতি হইতে লাগিল।

উক্ত রেয়াজউদ্দিন উকিল সাহেব, চট্টগ্রাম কোর্টের মোক্তার মওলানা আবদুল গণি সাহেবকে এই ঘটনাটি আলাপ প্রসঙ্গে বলেন। তিনি আরো বলেন হযরত

সাহেব কেব্‌লা একজন অতি দূরদর্শী ও অন্তঃচক্ষু বিশিষ্ট অতুলনীয় অলি যাঁহার অসীম দয়া ও দোয়ায় আমার অবস্থার এই উন্নতি। তাঁহার বদৌলতে জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা খরিদ করিয়া সোনার খনি পাইয়াছি। আমি ইহা তাঁহার আশ্চর্য কেরামত বলিয়া মনে করি। তিনি চাহিলে অঘাটকে ঘাট, অমানুষকে মানুষ করিতে পারেন। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনিও তাঁহার খেদমতে যাইয়া দেখুন। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁহার দোয়ায় একটি উপায় করিয়া দিবেন। আল্লাহ আপনার মোক্তারীতে প্রসার করিয়া দিবেন।

অতঃপর তিনি দরবার শরীফে হযরতের আশ্রয় গ্রহণে তাহার উন্নতি কামনা করেন। তিনিই এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি তাহার ব্যবসায় খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। বহুবার ফৌজদারী বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাহার নিজ ইউনিয়নের বহু বৎসরাধিক প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

(ক) হযরতের বাক্য সিদ্ধি ও কশ্‌ফ কেরামতে নিরুদ্দেশ প্রাপ্তি

শাহনগর নিবাসী জমিদার হাজী মখলছুর রহমান সাহেব বলেন, "আমার ১৮/২০ বৎসর বয়সকালে আমার পিতা সাহেব একটি দুধের গাভী খরিদ করেন। একদা গাভীটি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়ায় দোয়ার জন্য আমার পিতা সাহেবের আদেশ মত হযরত সাহেবের খেদমতে আসিলাম। তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেই তিনি বলিলেন, "মিঞা তোমার বাড়ীর উত্তর দিকে তালাশ কর। গরু পাইবে। আমি দোয়া করিতেছি।" তাঁহার নির্দেশমত বাড়ীর উত্তর দিকে তালাশ করিয়া গরুটি পাইলাম। আমার পিতা সাহেব হারানো গরুটি পাইয়া অতিশয় খুশী হইলেন এবং একদিন দুধ লইয়া তাঁহার দরবারে পাঠাইলেন। আমি দুধ হযরতের সামনে রাখিয়া বলিলাম-হুজুর! আপনার দোয়ায় আমাদের গরুটি পাওয়া গিয়াছে। আমার বাবা এই দুধগুলি লইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি রেঙ্গুন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার শারিরীক ও আর্থিক উন্নতির জন্য বাবা দোয়া করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

হযরত আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা দোয়া করিতেছি।" ইহা বলিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, "তেজারত করিও তবে একটি কাজ করিওনা।" (সেই কাজটি যে কি তিনি প্রকাশ না করায় এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না) বাড়ী আসিয়া কিছুদিন পর রেঙ্গুন চলিয়া গেলাম। হযরতের নির্দেশমত ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। হযরতের নির্দেশমত নিষিদ্ধ কাজটি কখনও করি নাই। তাঁহার বাক্যে আল্লাহতা'লা কি অসীম কেরামতি ও সাফল্য রাখিয়াছেন তাহা তিনি আর আল্লাহ জানেন। আল্লাহ্‌র রহমতে ও হযরতের দোয়ার বরকতে আমি বর্তমানে বহু টাকার মালিক।

(খ) মূর্খের প্রতি কোরান পাঠের আদেশে অদ্ভুত কেরামত

নোয়াখালীর হারিপুর নিবাসী নজমুদ্দিন আহমদ সাহেব বলেন, তিনি একদিন হযরতের সম্মুখে হাজির হইলেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা কোরান তেলাওয়াত করিও।" তাহাতে তিনি আরজ করিলেন "হুজুর! আমি কোরাণ শিক্ষা করি নাই।" হযরত বলিলেন, "কোরান শরীফ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ কর। তুমি শিখিয়াছ।" তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি কোরান শরীফ খুলিলেন। তাহার মনে হইল, তিনি কোরান পাঠ শিক্ষা করিয়াছেন। তারপর বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন, তিনি খুব সুন্দর কোরান পাঠ করিতে পারেন। সেই অবধি নিত্য তিনি কোরান পাঠ করিতেন, পাঠ না করিয়া শান্তি পাইতেন না।

বৃদ্ধাবস্থায় একদিন তিনি কোরান পাঠ করিতে না পারায় তাহার সর্বশরীরে এক ভীষণ জ্বালাপোড়া অনুভব করেন। তার পরদিন তাড়াতাড়ি কোরান পাঠে মন দেন। তাহার মরণকাল পর্যন্ত তিনি চশমা ছাড়া কোরান শরীফ পাঠ করিতেন। হযরত কোরান পাঠ অতি ভালবাসিতেন। মওলানা সৈয়দ মিঞাকে কোরান পাঠের আদেশ দেওয়ার পর হইতে তিনি কোরান পড়িতে অজ্দ করিতে করিতে বেহুশ হইয়া যাইতেন। লতিফ সিকদার নিবাসী শাহ্ মওলানা জমিরউদ্দিন সাহেবকে হুকুম দেওয়ার পর তিনি কোরান পাঠ কালে দেখিতে পাইতেন, হযরত তাহার সামনে বসিয়া কোরান পাঠ শুনিতেছেন। এইরূপ আরো বহু ঘটনা আছে।

(গ) হযরতের বাক্যে আশ্চর্য রহস্য ও কেরামত

মন্দাকিনী নিবাসী আলী মিঞা চৌধুরীর পুত্র মাস্টার ফজলুর রহমান বলেন, আমি কোন চাকুরী না পাইয়া একদিন ফরহাদাবাদ নিবাসী ছুফী চান্দ মিঞা সাহেবকে দুঃখের কথা জানাইলাম। তিনি আমাকে হযরতের দরবারে দোয়া প্রার্থনা করিতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাহার কথা মত কয়েকবার হযরতের দরবারে আসিলাম। একদিন তিনি আমাকে দুইটি রুটি হাতে দিয়া বলিলেন, "মিঞা। তুমি হিসাব নিকাশের কাজে থাকিও। যেখানে যাও আল্লাহকে ভয় করিও।" এবং খাদেমকে বলিলেন, "নাজিরহাটের পোস্ট মাস্টারকে দুইখানা কাবাব তবরুক দাও।" হুজুরের নির্দেশ মত খাদেম সাহেব আমাকে দুইখানা কাবাব দিল। আমার প্রতি নির্দেশ দিলেন "রুটিগুলি কাবাব দিয়া খাইয়া চলিয়া যাও।" আমি তাহাই করিলাম। কিন্তু হযরতের কালামের কোন রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক বৎসর পর নাজির হাটে পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। খোদার কি মহিমা! আমিই তথায় প্রথম পোস্ট মাস্টার নিযুক্ত হইলাম। এই সময় আমি একবার এয়াছিন নগর বেড়াইতে যাই। তথায় একটি খারাপ সুন্দরী স্ত্রীলোকের ফেরবে পড়িয়া পাপে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। তখন হঠাৎ হযরতের পাকবাণী ও তাঁহার

চেহারা মোবারক আমার সামনে আসে। অতএব আমি খোদার ভয় মনে আনিলাম। সারারাত বাতি জ্বালাইয়া স্ত্রী লোকটির সহিত কথাবার্তায় রাত পোহাইয়া সকালে বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

হযরতের বাক্য সিদ্ধি ও দোয়ার ফল

মাইজভাণ্ডার নিবাসী জনাব খায়েজ আহমদ বর্ণনা করেন, "ছোটকালে আমার পিতা সাহেব পড়ার তাগিদে একদিন আমাকে তাড়াইলে আমি হযরতের ঘরে ঢুকিয়া পড়ি। আমার পিতা সাহেব পিছে পিছে আসিয়া পড়িলে হযরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তাহাকে তাড়াইতেছেন কেন? বাবা উত্তর করিলেন, "সে লেখাপড়া করেনা। খোন্দকারের ছেলে না পড়িলে কি ভাবে জীবন কাটাইবে! সে তো আর হালচাষ করিতে পারিবে না!" হযরত উত্তর করিলেন, "আমার মিঞা ফয়জুল হকের মোছাহেব। তাহার পড়াশুনা লাগিবেনা। পড়িবেও না। হালচাষও করিবেনা। সেই ভাল খাইয়া, সুন্দর কাপড় পরিয়া চলিয়া যাইবে। আপনি চলিয়া যান।"

হযরত সাহেবানী একদিন হযরত সাহেবকে বলিলেন, "খায়েজ আহমদ ফয়জুল হক মিঞাকে কলিকাতা যাইবার পরামর্শ দিতেছে! আপনি তাহাকে নিষেধ করুন।" হযরত উত্তর করিলেন, "খায়েজ আহমদের কলিকাতা আমার আন্দর বাড়ী। আর মিঞার কলিকাতা চট্টগ্রাম শহর। আপনার সে বিষয়ে চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই।"

খায়েজ আহমদ বলেন, আমি বার বার চেষ্টা করিয়াও কলিকাতা যাইতে পারি নাই। বরং তাঁহার ওফাতের পর রেঙ্গুন যাওয়ার জন্য কলিকাতা হইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে, আমার টিকেটের টাকাগুলি হারান যায়। তখন তাঁহার অখণ্ডনীয় বাণীর কথা আমার স্মরণ হয় এবং বাড়ী ফিরিয়া আসি।

প্রকাশ, মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত খায়েজ আহমদ খাওয়া-পড়ায় এবং আর্থিক কোন বিষয়ে কষ্ট পায় নাই। বরং মৃত্যুকালে তদীয় কন্যা ও জামাতা তোফায়েল আহমদকে নগদ প্রায় এক হাজার টাকা দিয়া যান।

মানব অন্তরে হযরতের আশ্চর্য প্রভাব

মাস্টার ফজলুর রহমান বলেন, তিনি প্রথমবার দরবার শরীফ আসিতে আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তি তাহাকে কয়েকটি কমলা দিয়া বলেন, আমি বারটি কমলা হযরতের জন্য রাখিয়াছিলাম। আমার নিয়তি বারটি কমলা হইতে কয়েকটি কে খাইয়া ফেলিয়াছে। এই কমলাগুলি হযরতের খেদমতে নিবেন। তিনি কমলাগুলি আনিয়া হযরতের সামনে রাখিতেই, হযরত একটি কমলা হাতে লইয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিলেন, "ভাই আমার পড়ার সময় এক বাড়ীতে জায়গির ছিলাম। বাড়ীওয়ালা ফকিরের নামে বারটি কমলা নিয়ত করিয়াছিল। ছাত্রেরা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহারা

চুরি করে নাই। আল্লাহ্‌র নামে খাইয়া ফেলিয়াছে। কারণ ফকিরের নামে নিয়ত করিলেই আল্লাহ উহা পাহারা দেয়। আল্লাহকে পাহারা দিতে বাধ্য করে বলিয়াই, ইহা কেতাব মতে নাজায়েজ বলা হয়। কিন্তু লোকে বুঝে না এবং নিয়ত করে। খোদার নিয়তের হইতে যে কেহ খাইতে পারে। আবদুর রহমানকে বলিও।"

মাস্টার ফজলুর রহমান শুনিয়া অবাক হইলেন যে, আবদুর রহমান তাহাকে কমলা সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছেন, তাহা হযরত বলিয়া দিতেছেন। বোধ হয় তাহার নিয়তে কোন প্রকার দোষ আছে। না হয়, আল্লাহ নিশ্চয় পাহারা দিতেন এবং ফকিরের নিয়তি কমলা খাইতে পারিত না। অতঃপর তিনি বাড়ী যাইয়া আবদুর রহমানকে সমস্তই বলিলেন।

হযরতের কার্যে অন্তর্যামীর নিদর্শন

আবদুল্লাপুর নিবাসী ডাক্তার বাবু রসিকচন্দ্র শীল বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি প্রাইমারী স্কুলে পড়িবার সময় আমার মা চারি আনা পয়সা আমার কপালে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন এই পয়সাগুলি দিয়া একসের বাতাসা একদরে কিনিয়া ফকীর মওলানা সাহেবের জন্য নিয়া যাইও। তাঁহার সামনে দিয়া তোমাকে দোয়া করিতে বলিও। ডাক্তার বাবু বলেন, মাতার নির্দেশমত একসের বাতাসা লইয়া আমি দরবারে আসিলাম এবং তাঁহার সামনে দিয়া বলিলাম, হুজুর, মা এই বাতাসাগুলি আপনার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমাকে দোয়া করিতে বলিয়াছেন।" তখন তিনি ধ্যানরত অবস্থায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর একজন খাদেম বলিলেন, হুজুর! একজন হিন্দুছেলে আপনার জন্য কিছু বাতাসা হাদিয়া আনিয়াছে। হযরত চক্ষু উন্মিলন করিয়া বাতাসার প্রতি একদৃষ্টে চাহিলেন এবং বাতাসাগুলি বন্টন করিয়া দিতে আদেশ দিলেন।

লোকটি বাতাসা বিলি করিতে লাগিলেন। অনেক লোক। বিলি করিতে করিতে প্রায় ২০/২৫ হাত দূরে চলিয়া গেলে আমার মনে আসিল বোধ হয় আমাকে দিবে না। ইহা খেয়াল করার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত ডাকিয়া বলিলেন। "এই ছেলেটিকেও দাও।"

আমাকে দেওয়ার পর বাতাসা শেষ হইল। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, আমাকে তো দোয়া করিলেন না। তখন হঠাৎ তিনি হাত উঠাইয়া দোয়া করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিলাম তিনি মানুষের অন্তর্যামী।

হযরতের অন্তঃচক্ষু ক্ষমতার অলৌকিক পরিচয়

কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ ছরতা গ্রাম নিবাসী হাজী রহমত আলী সাহেবের পুত্র জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ কন্ট্রাক্টর সাহেব বর্ণনা করেন যে, ত্রিপুরা (কুমিল্লা) নিবাসী দারোগা বাড়ীর মওলানা রেয়াজ উদ্দিন আহমদ সাহেব গাজীপুর শাহ্ সাহেবের মুরীদ ছিলেন।

তিনি শাহ্ সাহেবের মুখে শুনিয়াছেন মাইজভাণ্ডারী পীর মওলানা শাহ্ সৈয়দ

জনাব আহমদ উল্লাহ (কঃ) সাহেব অত্যন্ত উচ্চস্তরের আউলিয়া ছিলেন। শাহ্ সাহেব বলেন, "আমি একদা তাঁহার খেদমতে যাওয়ার সময় পথে একজন লোক আমাকে তিনটি খোরমা দিয়া বলেন যে, তাহার এই হাদিয়া যেন আমি হযরত সাহেব কেবলার খেদমতে পৌছাইয়া দিই। আমি অতি যত্নের সহিত খোরমা তিনটি কাপড়ের পকেটে রাখিয়া ঐ কাপড় গাটরীর মধ্যে হেফাজতে রাখিলাম। দরবার শরীফ আসিয়া বিদায় হওয়ার সময় হযরত সাহেব কেবলা আমার প্রতি হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "আমারটি আমায় দিয়া যান।" আমি মনে মনে ভয় পাইলাম। কি ব্যাপার! আমি তাঁহার খেদমতে ফয়েজ ও দোয়া অর্জনের জন্য আসিলাম; আর তিনি বিদায় কালে আমার নিকট কি চাহিতেছেন। কি দ্রব্যই বা দিতে নির্দেশ দিতেছেন।

হঠাৎ আমার খোরমা চালানীর কথা মনে পড়িল। তখন তাড়াতাড়ি গাটরী খুলিয়া গচ্ছিত খোরমাগুলি হযরতের খেদমতে পেশ করিলাম। এবং লজ্জিত ও কৃতজ্ঞ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তিনি তো নিতান্ত দয়াবান সর্বসজাগ আউলিয়া। আমার পীরের কালাম সত্য। যদি এই আমানত চালানী না দিয়া যাইতাম, বেয়াদবী তো হইতোই; তদুপরি বুজুর্গানে দীনের আমানতী হাদিয়া অনাদায়ের দায়ে দুঃখকষ্টও ভোগ করিতে হইত। অতএব হুসিয়ারের সহিত অতি যত্নে যথাস্থানে তাঁহাদের হাদিয়া পৌছান উচিত। ইহার মত দায়িত্ব কম আছে।"

অলৌকিক প্রভাবে একজনকে পানি পড়া দানে অপরের রোগ মুক্তি

আবদুল্লাহপুর নিবাসী ডাক্তার রসিক বাবু বলেন, তাহার ছোট ভাই বাল্যকালে নানা প্রকার রোগ ভোগ করিতেছিল। কোন চিকিৎসায় আরোগ্য না হওয়ায় তাহার মা তাহার ছোট ভাই এর কপালে চারি আনা পয়সা স্পর্শ করাইলেন এবং তাহাদের সেইদিনের গরুর দুধ দোহন করিয়া চারি আনা পয়সাসহ তাহার চাচাকে মাইজভাণ্ডার হযরতের খেদমতে আশীর্বাদের জন্য পাঠাইয়া দেন এবং বলিয়া দেন যে, তাহার আরোগ্য কামনা করিয়া যেন কিছু জল পড়া লইয়া আসেন।

তাহার চাচা আদেশ মত হযরতের খেদমতে দুগ্ধ ও পয়সা পেশ করিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের আরোগ্য কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন। হযরত তাহার হাদিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিছু জল "দম" করিয়া তাহাকে জোর করিয়া পান করাইয়া দিলেন এবং তাহার চাচার পেটের উপর হাত ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, তাহার ছেলের পেটের অসুখ ভাল হইয়া যাইবে।

খোদার কি মহিমা। তাঁহার আধ্যাত্মিক কেরামত কত সবল, আমার চাচা বাড়ী পৌছিবার পূর্ব হইতেই আমার ভাই যেন ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে যাইতে লাগিলেন। ইহার কয়েক দিনের মধ্যে আমার ছোট ভাই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। এইভাবে হযরত একজনকে পানি খাওয়াইয়া অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিলেন।

পরীক্ষকের উপর হযরতের প্রভাব বিস্তারে অদ্ভুত কেরামত

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রামের হিঙ্গুলা গ্রাম নিবাসী আহমদ দায়েম চৌধুরীর পুত্র আবদুল হোসাইন চৌধুরী সাহেব ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় অত্যন্ত খারাপ করেন এবং পাশের আশায় নিরাশ হইয়া হযরতের দরবারে দোয়া প্রার্থী হন। তিনি বলেন, আমি দরবার শরীফে হাজির হইয়া হযরতের কদমবুচি করিয়া আরজ করিলাম, হুজুর! "আমি পরীক্ষায় সুবিধা করিতে পারি নাই। অঙ্কে মাত্র দশ নম্বরের উত্তর লিখিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ও তত ভাল করিতে পারি নাই। আমি গরীব ছাত্র। এইবার পাশ করিতে না পারিলে আর পড়িতে পারিব না। এখন হুজুরের দোয়া ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নাই।" হযরত আমাকে নাম, পিতার নাম, বাড়ীর কথা তিনবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যথারীতি উত্তর দিলাম। হযরত কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিয়া উঠিলেন, "মিঞা, খোদা তোমাকে সব বিষয়ে পাশ করাইয়া দিয়াছে। ভয় নাই। চলিয়া যাও।"

ইহা শ্রবণে খুবই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাকে কদমবুচি করিয়া বিদায় হইলাম। কিন্তু মনে শান্তি কিছুতেই আসেনা। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। দেখিলাম, আমি আল্লাহর রহমতে ও হযরতের দোয়ার বদৌলতে পাশ করিয়াছি। আমার পরীক্ষা পাশ তাঁহার দোয়া ও অসাধারণ কেরামত ছাড়া আর কিছুই নহে।

হযরতের অসাধারণ ক্ষমতা হাকিমের অন্তরে প্রবেশ ও মোকদ্দমার রায় প্রদান

হযরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) এঁর খাদেম মওলানা মনিরুল্লাহ সাহেব, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর একজন ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। তাহার প্রতিবেশী একজন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাহার সহিত জমি লইয়া বিরোধ সৃষ্টি করেন। তিনি ধনেজনে ও কৌশলে প্রতিপক্ষের সমকক্ষ নন। তাই কিছুতেই তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না।

তিনি নিরুপায় হইয়া হযরতের খেদমতে আর্জি পেশ করিলেন "হুজুর! আমিতো পারিতেছিনা আমার জমিগুলি জোর দখল করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার কবল হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাই। আপনি দোয়া করিয়া আমার উপায় করিয়া দেন।" হযরত তাহাকে বলিলেন, "তুমি আদালতে আর্জি কর। তোমার জমি পাইয়া যাইবে।"

তিনি হযরতের আদেশ মতে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিলেন। খোদার এমনই মহিমা, বিপক্ষের সমুদয় সাক্ষ্য তাহার অনুকূলে আসিয়া গেল। তিনি মোকদ্দমায়

জয় লাভ করিয়া জমি ডিগ্রী পাইলেন। কিছুদিন পর তিনি দরবারে আসিতে শুনিতে পাইলেন, বিপক্ষদল আপিল দায়ের করিতেছে। ইহাতে মওলানা সাহেব অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। কারণ বিপক্ষদল টাকার জোরে বড় বড় উকিল নিযুক্ত করিবে। অথচ তাহার কাছে টাকা নাই। তিনি কি করিয়া ভাল উকিল নিযুক্ত করিবেন। সুতরাং এবার তিনি হযরতের খেদমতে সমস্ত ঘটনা আরজ করিয়া জানাইলেন।

হযরত আক্‌দাছ বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বিপক্ষদল বড় বড় উকিল নিযুক্ত করিলে আমি ব্যারিষ্টার হইয়া বিচারকের অন্তরে প্রবেশ করিব।

কিছু দিন পর মোকাদ্দমার তারিখ পড়িল। তাহারা প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ উকিল নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। বিপক্ষের উকিলগণ সারাদিন ছওয়াল জওয়াব ও আইন নজির পেশ করিতে লাগিলেন। আর মওলানা সাহেবের উকিল নীরবে বসিয়া রহিলেন। ইহাতে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি মনে মনে ভাবিলেন নিশ্চয় তাহার উকিল বিপক্ষের দ্বারা বশীভূত হইয়াছেন। না হয় তো একটি কথাও না বলার কারণ কি? তিনি হতাশ হইয়া তাহার এক অফিসার বন্ধুকে গিয়া তাহা বলিয়া আসিলেন। বন্ধুটি উকিল সাহেবকে চুপ করিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উকিল সাহেব উত্তর করিলেন যে, বিপক্ষের জওয়াব এবং আমার যাহা বলার ছিল, হাকিম নিজেই তাহা বলিতেছেন। সুতরাং আমার বলিবার কি আছে। হাকিম তো আমার বলার অপেক্ষা করেনা। তাইতো তাহারা নানা নজিরে হাকিমকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

তখন হযরতের পবিত্র বাণী, 'আমি ব্যারিষ্টার হইয়া হাকিমের অন্তরে প্রবেশ করিব' মওলানা সাহেবের অন্তরে বার বার আলোড়ন করিতে লাগিলেন। এবং উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি এই বার আশ্বস্ত হইলেন।

অতঃপর বিচারক রায় প্রকাশ করিলেন। নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল রহিল। তিনি সমুদয় খরচ সহ ডিগ্রী পাইয়া মোকদ্দমায় জয় লাভ করিলেন। হযরতের এই অসাধারণ বাক্য রহস্য ও আশ্চার্য কেরামত দেখিয়া তিনি ভক্তিভরে ও প্রেম উন্মাদনায় ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য দরবারে হাজির হইলেন এবং হযরতের সমীপে সুসংবাদ পেশ করিলেন।

হযরতের আশ্চর্য কেরামতে বগলের নীচে কা'বা শরীফে মুছল্লি প্রবেশ করিতে দেখান

চট্টগ্রাম হাজীরখিল নিবাসী আবদুল হালিম চৌধুরী সাহেবের পুত্র আহমদ মিয়া চৌধুরী বলেনঃ-

"একদিন আমি দরবার শরীফে হযরত কেবলার খেদমতে হাজির হই। সেই সময় আমার বয়স ১৬ কি ১৭ বৎসর। রোজ শুক্রবার ছিল। আমরা বাবাজান কেবলা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী কুতুবে জমান সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) এঁর এমামতিতে জুমার নামাজ সমাপন করি। নামাজ শেষ হইলে হযরত কেবলা মসজিদে হাজির হইলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি নামাজ পড়িয়া ফেলিয়াছ? বাবাজান কেবলা উত্তর করিলেন, "ওয়াক্ত হইয়াছে দেখিয়া আমরা নামাজ পড়িয়া লইয়াছি।" হযরত তখন জালাল হইয়া বাবাজান কেবলাকে বলিলেন, "তুমি আমার বগলের নীচে দিয়া কাবা শরীফ দেখতো।" এই বলিয়া তিনি হাত উপরের দিকে উঠাইলেন। বাবাজান কেবলাও আদেশ পালনে হযরতের বগলের নীচ দিয়া চাহিয়া দেখিলেন। আমি তাঁহার পাশে দাঁড়ানো ছিলাম বলিয়া দেখিবার সুযোগ আমিও পাইলাম।

আমরা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, বহুদূরে একখানা মসজিদ ও কাবাশরীফের হেরেম শরীফ দেখা যাইতেছে। তখন তথায় মুছল্লিরা অজু করিয়া নামাজ পড়িতে প্রবেশ করিতেছেন। তৎপর তিনি হাত নামাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখিয়াছ? দেখিয়াছ? বলিতে বলিতে তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলাম। এই ঘটনা দর্শনে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলাম।

(ক) হযরত খিজির (আঃ) এঁর সঙ্গে হযরতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

একদিন রমজান মাসে সেহেরীর সময় হযরত সাহেবানী হযরত সাহেবকে বলিলেন, "ফকীরে ফকীরে শুনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে; কই আপনি তো আমাকে এখনও কোন দিন খিজির (আঃ) কে দেখাইতে পারিলেন না।" ইহাতে হযরত হাসিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন। "সত্যিই কি আপনি খিজির (আঃ) কে দেখিতে চাহেন।" ইহা বলিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন। হযরত সাহেবানী ছেহেরী খাইয়া কুলি ফেলিবার জন্য দরজা খুলিতেই দেখিতে পাইলেন, একজন সৌম্যমূর্তি শুভ্রবসন পরিহিত লোক বাহিরে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দরজা বন্ধ করিয়া হযরত সাহেবকে বলিলেন, "এই লোকটি কে? বাহির বাড়ীতে যাইতে বলুন। এখানে আমাদের অসুবিধা হইতেছে।" হযরত উত্তর করিলেন, "আপনি যাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তো আসিয়াছেন।" হযরত সাহেবানী ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইলেন এবং তাঁহার সহিত হযরতের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

(খ) ৫৯ মঘির প্রলয়ঙ্করী ঝড়-তুফানের ভবিষ্যৎ বাণী

একদিন হযরতের প্রতিবেশী ভক্ত খায়েজ আহমদ সাহেব, হযরত আক্‌দাছের নিকট শহরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

হযরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা গাছের পাতাগুলি পক্ষীর মত উড়িতেছে। তুমি শহরে যাইওনা।"

হযরত যখন এই কথা বলিতেছেন তখন আকাশে মেঘের লেশ মাত্রও ছিলনা,

প্রকৃতি বেশ স্বাভাবিক ও শান্ত অবস্থায় ছিল। ঝড় তুফানের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছিল না। খায়েজ আহমদ আর শহরে গেলেন না। সন্ধ্যায় অকস্মাৎ আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পৃথিবী যেন অন্ধকার হইয়া উঠিল। মুর্হুমুহ বজ্রের ভীষণ গর্জনে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া প্রবল ঝড়-তুফান ও মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হইল। চারিদিকে অস্বাভাবিক শীলা ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে লাগিল। সাগর জল উত্থিত হইয়া সাগর উপকূলবর্ত্তী এলাকা সমূহ নিমগ্ন করিয়া দিল।

সর্বজন বিদিত এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়ই ৫৯ মঘির তুফান নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত।

বিনা ঔষধে হস্ত পঁচা ও ক্ষত নালী রোগ আরোগ্য এবং হযরতের বাক্যে আশ্চর্য কেরামত

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ছাদেক নগর নিবাসী ফয়জুল হক ফকির ছোটকালে দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া ডান হাতের উপরিভাগের হাঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। নানা প্রকার ঔষধে ভাল না হইয়া উহা পাকিয়া পঁচা ধরে ও পাঁচটি নালী হইয়া পুঁজ পড়িতে থাকে। সমস্ত শরীর নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাহাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তথায় হস্ত কাটিয়া ফেলা ছাড়া অন্য চিকিৎসা না পাওয়ায় তাহার পিতা সাহেব হস্ত কাটিতে রাজী হইলেন না। তিনি ছেলে ফয়জুল হককে হযরতের সকাশে নিয়া আসেন এবং কাঁদিয়া হযরতের খেদমতে আরজ করেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, "কাটিতে হইবে না ভাল হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া ফয়জুল হকের পঁচা হাতের উপর তাঁহার হাত ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজ হাতে তাহাকে এক টুকরা পাকানো গোস্ত তবরুক খাওয়াইয়া দিয়া বিদায় দিলেন। ইহার পর হইতে তাহার হাতের পঁচা ও পানি বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যে হস্তনালী শুকাইয়া ধীরে ধীরে আরোগ্য হইয়া যায়। উক্ত ফয়জুল হক ফকির হযরতের বিশেষ আশেক হিসাবে বর্তমানেও বাঁচিয়া আছেন। তাহাকে হযরত সম্বন্ধে বা মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উচ্চ হাতকে দেখাইয়া হযরতের বেলায়তের উপর আস্থা ও ভক্তির নিদর্শন খাড়া করেন। তাহার উক্ত হাত এখনও অপর হাত হইতে একটু বেঁটে কিন্তু সমভাবে সবল। তিনি উভয় হাতে সমান কাজ কর্ম করিতে পারেন। হযরতের এইরূপ অসংখ্য ও অসাধারণ ঘটনাবলী রহিয়াছে যাহা গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধির কারণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিখিলাম না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের আচার আলাপ ও ভাব ভঙ্গি

(ক) গান বাদ্য ও ছেমায় হযরতের সম্মতি ঃ-

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার পাইন্দং নিবাসী মরহুম মওলানা সাদুল্লাহ সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ এসহাক সাহেব হযরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায় সময় হযরতের খেদমতে আসিতেন। কোন কোন সময় হযরত তাহাকে আদেশ দিতেন, "মামু সাহেব, 'বাঁশের ঘরে বাস করিয়া গানটি গাও তো।" তখন তিনি দোজানু হইয়া হযরতের সামনে বসিয়া নিজ হাটুর উপর দুই হাতে তাল বাজাইয়া গাহিতে থাকেন ঃ-

ওহে জগ মহাঠক কেন কর দিলদারী
বাঁশের ঘরে বাস করিয়ে পাকাইনু চুল দাড়ী 'ইত্যাদি'
(গুরুদাস রচিত)

প্রসিদ্ধ গায়ক গুরুদাস হযরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি হযরতের সামনে বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া বৈরাগী সুরে হযরতকে গান শুনাইতেন। হযরত উহা মনযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। তিনি গুরুদাস ফকির নামে পরিচিত; (সমাধি বাড়বকুন্ড)। বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীত বিশারদ আফতাবুদ্দিন, সুর বিশারদ আলাউদ্দিন প্রভৃতি হযরতের সামনে হাজির হইয়া বাঁশী ও সুর এস্রাজ সমেত হযরতকে সঙ্গীত শুনাইতেন।

ইহা ছাড়া হযরতের মুরিদ শিষ্য-পটিয়া থানার অন্তর্গত আহ্‌ল্লা মৌজার কাজী মওলানা আছাদ আলী, গোবিন্দের খিল মৌজার শাহ্ আমিরুজ্জমান, কাঞ্চনপুর নিবাসী মওলানা আবদুল হাদি সাহেবানের মধ্যেও কেহ কেহ হযরতের খেদমতে গান, গজল, নাতিয়া শুনাইতে অনুমতি চাইলে, তিনি অনুমতি দিতেন এবং শ্রবণ করিতেন।

প্রায় সময় দেখা যাইত, গান বাজনার ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীগণ তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে গান বাজনা শুনাইতেন।

(খ) পাহাড়ীয়া চাকমা জুমিয়া প্রভৃতি জাতির প্রতি হযরতের ব্যবহার

পার্বত্য চট্টগ্রামের চেঙ্গির অধিবাসী একজন চাকমা ভক্তকে হযরত বলিয়াছিলেন,

"তুমি এতদূর পাহাড় পর্বত অতিক্রমে কষ্ট করিয়া আমার জন্য এসব দুধ কলা কেন আনিয়াছ।" চাকমাটি উত্তরে হযরতকে বলিয়াছিল, 'তুই খোদামুহা মানুষ বলিয়া তোর জন্য আনি। তুর জন্য না আনিলে, আর কার জন্য আনিব।' হযরত হাসিতে হাসিতে তাহার হাদিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন। এবং খাদেমকে আদেশ দিলেন যেন তাহাকে যত্নের সহিত আহারাদি করান হয়।

এইরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য চাকমা, মগ, কুকি, পাকুজ, টিপরা প্রভৃতি তাঁহার খেদমতে আসিতেন। বর্তমানেও তাঁহার পবিত্র রওজা শরীফে পাহাড়ী ভক্তগণ আসিয়া তাহাদের মানতি আদায় করে।

মাজহাবী মাহফিলে হযরতের অদ্ভুত উপস্থিতি

(ক) জনাব মোন্সেফ সৈয়দ আমিন উদ্দিন সাহেবের জানাজায় হযরত

নানুপুর নিবাসী জনাব সৈয়দ আমিন উদ্দিন মোন্সেফ সাহেব ওফাত গ্রহণ করিলে জানাজার নামাজের সময় হঠাৎ হযরত সাহেব কেবলা উপস্থিত হইয়া এমামতিতে দাঁড়াইলেন। নামাজের সময় তিনি প্রতি তকবীরেই হাত উঠাইয়াছিলেন। ইহাতে উপস্থিত মওলানা সাহেবগণ তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং হাত উঠানো মছায়েলায় তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। হযরত তাহাদিগকে উত্তর দিলেন, "হামতো দুনিয়ায়ে দনিছে হাত উঠায়া। মিল্লতছে হাত নেহী উঠায়া।" অর্থাৎ মিথ্যা দুনিয়া হইতে হাত উঠাইয়াছি। ধর্ম বা মিল্লত হইতে নহে। তখন সকলেই চুপ হইয়া রহিলেন।

(খ) জনাব হায়দার আলী গোমস্তা সাহেবের জানাজায় হযরত

চট্টগ্রাম নানুপুর নিবাসী ডাক্তার আবদুল মান্নান সাহেব বর্ণনা করেন, "আমাদের নানুপুর গ্রামের জনাব হায়দার আলী গোমস্তা সাহেব মৃত্যুকালে অছিয়ত করাইয়া যান যে, তাহার জানাজা যেন হযরত সাহেব কেবলার দ্বারা পড়ান হয়। তাহার মৃত্যুর পর হযরত সাহেবকে ডাকিতে আসাকালীন পথে প্রেরিত লোকটির সহিত হযরতের দেখা হয়। হযরত একটি লাঠি হাতে গোমস্তা সাহেবের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন। লোকটি হযরতকে বলিতে না বলিতে হযরত বলিতে লাগিলেন, "হাঁ মিঞা তিনি যখন তাহার দাড়ি দিয়া হেরম শরীফ ঝাড়ু দিতেছিলেন, তখন আমার সঙ্গে তাহার জানাজা পড়াইবার ওয়াদা হয়। আমি উহা পালন করিতে যাইতেছি।" হযরত যাইয়া যথারীতি অজুগোসল সমাধা করাইয়া নামাজ শেষ করিলেন এবং বাড়ীতে রওয়ানা হইলেন।

(গ) ছুফী মমতাজ আলীর জানাজায় হযরত

আজিম নগর নিবাসী ছুফী মমতাজ আলী হযরতের মুরিদ ছিলেন, তাহার ওফাতের পর জানাজার নামাজের জন্য হযরতের নিকট লোক পাঠাইলেন। রাস্তার মধ্যে হযরতের সঙ্গে উক্ত লোকের সাক্ষাৎ হয়। হযরত তাহাকে বলিলেন, মিঞা; আমি আসিতেছি। হযরত যাইয়াই জায়নামাজে দাঁড়াইলেন। নামাজান্তে তাহার মাথায়, নির্দেশ দিয়া পাগড়ী বাঁধাইয়া দিলেন।

হযরতের মজহাবী মছায়েলার উত্তর দান

(ক) গায়েব প্রকাশঃ- (খ) সেজদাঃ- (গ) ফিতরাঃ-

(ক) গায়েবের মছায়েলার উত্তর

ফরহাদাবাদ নিবাসী মওলানা আবদুল জলিল সাহেব, একদিন হযরতের খেদমতে গায়েব বলার মছায়েলা জানিতে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-

হুজুর! গায়েব বলা বা প্রকাশ কি জায়েজ আছে? হযরত উত্তর করিলেন 'যব কুন কাহা ছব হোগেয়া। ফের গায়েব কাঁহা হ্যায়?'

অর্থাৎ আল্লাহতা'লা যখন হয়ে যাও বলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গেই সব হইয়া গিয়াছে। তখন আর অদৃশ্য কোথায় রহিল।

(খ) সেজদার মছায়েলার উত্তর

তিনি আবার জানিতে চাহিলেন, হুজুর! সেজদায়ে "তাহীয়ার" ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

হযরত উত্তর করিলেন, "পাঁচ আদমী কে লিয়ে সেজদায়ে তাহীয়া হ্যায়। কাজিখান ফতোয়া দেখো।"

অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঁচ জনকে সেজদায়ে তাহীয়া করা জায়েজ আছে। মা, বাপ, পীর, ওস্তাদ এবং সুবিচারক বাদশা।

হযরতের খলিফা ফরহাদাবাদ নিবাসী মওলানা আমিনুল হক সাহেব, "তোহফাতুল আখিয়ার" নামক কেতাবে উহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। উহাতে হযরতের অনুমোদন ও দস্তখত আছে। তিনি নিজে রেওয়াজ বা দেখাদেখি প্রথাকে পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, "আচ্ছালামু আলাইকুম" কহো।

(গ) ফিতরার মছায়েলার উত্তর

একদিন প্রতিবেশীগণ হযরতের নিকট ফিতরার মছায়েলা জানিতে চাহিলেন।

তাহারা বলিলেন, হুজুর! কেউ বলে আটা দিতে কেউ বলে গেউ দিতে, আমরা এখন কোন পথ ধরিব? হুজুরের রায় জানিতে চাই।

হযরত উত্তর করিলেন, মিঞা! যেই দেশে যেই খাদ্য প্রধান তাহাতেই ফিতরা দেওয়া যাইতে পারে। তোমাদের প্রধান খাদ্য চাউল।

তোমরা চাউল দিলেই ফিতরা আদায় হইয়া যাইবে।

বাহাছ মোনাজেরা

এক সময় আজিম নগর নিবাসী মাস্টার ফয়েজ উল্লাহ্ সাহেবের বাড়ীতে মওলানা মহিউদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে মাইজভাণ্ডারী তরিকামতে হালকা জিকির, ছেমা ও সেজদায়ে তাহীয়া সম্বন্ধে মাইজভাণ্ডারী ভক্তগণের বিরুদ্ধে ওয়ায়েজ করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়।

হযরতের মধ্যম ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র ও অন্যতম খলিফা জনাব মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক (প্রকাশ ছোট মওলানা) সাহেব আজিম নগর নিবাসী মুন্সী সৈয়দ আফাজুদ্দিন সাহেবের পুত্র হযরত সাহেবানীর সহোদর ভ্রাতা ও হযরতের ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফা আবদুল মজিদ মিঞাকে হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া আরজ করিলেন ঃ-

হুজুর! আমরা বহু আলেম দরবারে পাকে শিষ্য ভক্তদের মধ্যে বর্তমানে আছি। মহিষখালীর মওলানা আকামুদ্দিন সাহেব, রাঙ্গুনিয়ার মওলানা খলিলুর রহমান সাহেব, বাঁশখালীর মওলানা মোহছেন সাহেব, সুন্দরপুরের মওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব, কাঞ্চনপুরী মওলানা আবদুল গণি (আয়নায়ে বারী প্রণেতা) সাহেব, মওলানা আবদুচ্ছালাম, মওলানা আবদুল হাদি, ফরহাদাবাদী মওলানা আমিনুল হক সাহেব এবং হাফেজ কারী মওলানা মোহাদ্দেছ সৈয়দ তাফাজ্জুল হোসাইন সাহেব এবং আরো অনেক বিখ্যাত আলেমগণ উপস্থিত আছেন। খোদার ফজলে আমাদের কাছে সমস্ত মছায়েলার কেতাবাদি ও প্রমাণাদি মৌজুদ আছে। আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই মোনাজেরায় সুদক্ষ। হুজুরের অনুমতি পাইলে আমরা মওলানা মহিউদ্দিনের সাথে বাহাছ মোনাজেরা করিতে ইচ্ছা করি।

হযরত আদেশ করিলেন, "তিনি মুসবী তরিকার লোক খিজিরী কাজ কারবার তিনি কি বুঝিবেন? তোমরা ফাছাদ ও বাহাছ করিওনা। আপন হালতে থাকিয়া যাও। তাহারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।" তখন মওলানা আমিনুল হক সাহেবের (হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র) আদেশে, আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীতে ছেমাসহ জজ্‌বার মজলিশ করা হয়।

তাহারা ছেমার জজ্‌বা মজলিশ করা কালে যাহারা আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতে লাগিল; ছেমার শব্দ কানে আসিতেই তাহাদের জজ্‌বা ও সমস্ত শরীর আলোড়ন হইতে লাগিল। সকলেই ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। হিন্দুরা বলাবলী করিতে লাগিল, এই রাস্তা দিয়া যাইওনা। এই বাড়ীতে মক্কা চালান দিয়াছে।

কেহ স্থির থাকিতে পারিবে না। ফলে দেখা গেল মওলানা মহিউদ্দিনের মজলিস জমিল না। উক্ত মজলিস হইতে প্রায় সকলেই জজ্‌বা হালতে ও বেখোদ অবস্থায় এই হালকা ও ছেমার মজলিসে যোগদান করিতে লাগিল।

ফাতেহাখানি মছায়েলায় হযরতের উত্তর

বিভিন্ন মওলানা সাহেবের বিভিন্ন মতামত দেখিয়া মহল্লার লোকগণ একদিন হযরতের খেদমতে ফাতেহা ছওয়াব রূহানী সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। হযরত তাহাদিগকে বলিলেন, "মিঞা! আমার মাতা সাহেবানী ঘর দরজা পরিষ্কার করিয়া লেপ দিতেন এবং ফাতেহা পড়াইয়া ইছালে ছওয়াব করিতেন। মুরুব্বিগণের প্রতি ছওয়াব পৌঁছাইতেন, ইহা ভাল।"

শরিয়ত পালনে হযরত

হযরত সাহেবের একমাত্র পৌত্র (নাতি) জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন ঃ-

হযরত আক্‌দাছ নিত্য নামাজে পাঞ্জেগানা আদায় করিতেন এবং অতি বেশী নফল নামাজ, কোরান শরীফ তেলাওয়াত, রোজা পালন ও মোশাহেদা মোরাকাবাতে রত থাকিতেন বলিয়া শুনিয়াছি।

তাঁহার শেষ সময়ে আমি বয়স্ক ও বুদ্ধিমান হওয়ার পর একদিন তাঁহার পিছনে একতেদা করিয়া ঈদের নামাজ পড়িয়াছি। তিনি নামাজে "ছুন্নতামান কাদ্ আরছালনা কাবলাকা মিররাছুলেনা" আয়াত প্রথম রাকাতে পাঠ করিয়াছিলেন এবং মওলানা আমিনুল হক সাহেব, (তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র) হযরত কেবলার আদেশ মত "খোতবা" পাঠ করিয়াছিলেন। অন্য সময় জাহেরা নামাজ পড়িতে আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অনেক ঘটনায় ও অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাকে মদিনা শরীফে নামাজ পড়িতে ও ছায়ের অবস্থায় সাক্ষাৎ পাইতেন। তিনি অনেকের বিপদ মুক্তি ও উপকার করিতেন।

তাঁহার ওফাতের কিছুদিন পূর্বে ঈদের নামাজ মওলানা রহিমউল্লাহ সাহেব তাঁহার আদেশমত খোতবা পাঠ ও এমামতি করিয়াছিলেন। হযরত একখানা জায়নামাজে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু একতেদা করিতে দেখি নাই। ইহা ছাড়াও তাঁহাকে আমি কোন দিন কেয়াম, কউদ, রুকু, সেজদার কোন আরকান পালনে দেখি নাই। শেষ সময়ে রোজা পালনে তেমন কোন আগ্রহ দেখি নাই। কোন কোন সময় রোজা পালন করিয়া ইফতার করিতে দেখিয়াছি এবং কোন কোন সময় রমজান মাসে দিনের বেলায় সরবত পান করিতে ও করাইতে দেখিয়াছি।

হেদায়ত আলী ও মুন সিকদারের বাড়ীর আবদুর রহমান মিঞাকে রমজান মাসে

সরবত পান করাইতে দেখিয়াছি। তখন প্রতিবেশী ছায়াদ উদ্দিন সাহেব বলিয়াছিলেন, আবদুর রহমানের রোজাটি খলল হইয়া গেল। ইহা শ্রবনে হযরত বলিয়া উঠিলেন, "আমার ছেলেরা সব সময় রোজা রাখে।" আবার কোন কোন সময় হযরতকে একেবারে কিছু না খাইয়াও থাকিতে দেখিয়াছি।

পারিবারিক "মোয়ামেলাতে" হযরতের আপোষভাব

একদা এক ব্যক্তি, হযরতের খেদমতে নালিশ করিল যে, তাহার ভ্রাতা জুলুম করিয়া তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। হযরত তাহাকে তাহার ভ্রাতার সহিত আপোষ মীমাংসা করিয়া লওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। লোকটি তখন বলিল যে, তাহার ভাই আপোষ মানে না। হযরত আবার বলিলেন, সে হারামজাদা, তাহাকে কিছু বেশী দিয়া আপোষ কর। এইরূপ ঘটনাতে প্রায় লোককে তিনি আপোষ মীমাংসার আদেশ দিতেন।

অতিব্যয় অত্যানন্দ ও সংসার ধর্মে অনাসক্তি

হযরতের দরবারে কেহ শাদীর কথা বলিলে, তিনি বলিতেন, নবী করিম (সঃ) দুনিয়াকে "দারুল হোজন" বলিয়াছেন। আর তুমি বল শাদী। তিনি জালাল হইয়া যাইতেন। কিন্তু খাদেমা বা বাবুর্চি আনিবার কথা বলিলে তিনি যথারীতি নাম জিজ্ঞাসা করিতেন এবং অনুমতি প্রদান করিতেন।

হযরত কেবলা তাঁহার একমাত্র পুত্র মওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবকে বিবাহ করাইবার পর হযরত সাহেবানী বসতবাড়ীটা প্রশস্ত ও সুন্দর করিবার জন্য হযরত সমীপে বার বার অনুমতি চাহিলেন, তিনি উত্তর দিতেন 'দেখ, দুনিয়া "দারুল রেহালত" পান্থশালা। এখানে অত সুন্দর ও বেশী প্রশস্ত ঘরের দরকার কি? দুই দিন বিশ্রাম করার দরকার মাত্র, তাঁহার নিকট আনিত অগণিত হাদিয়া ও টাকা পয়সা তিনি অকাতরে লোকজনের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। কোন প্রকার সঞ্চয় বা জমা করিতে দিতেন না।

হযরতের পর- দুঃখ কাতরতা

কোন ছেলেমেয়ে কাঁদিলে বা দুঃখ পাইলে হযরত ব্যস্ত হইয়া যাইতেন। যেই পর্যন্ত তাহাদিগকে শান্ত করা না হইত সেই পর্যন্ত তিনি নিজে শান্ত হইতেন না বরং বিচলিত থাকিতেন।

যে কোন গরীব দুঃখী তাঁহার নিকট কাপড় চোপড়, খাওয়ার বা ঘর মেরামতের নাম করিয়া কিছু চাহিলে তিনি অকাতরে সম্মুখে যাহা পাইতেন, দান করিয়া দিতেন।

খাদেম ছেলেগণকে তিনি রাত্রে বিছানায় যাইয়া দেখিতেন, তাহাদের মাথায় বালিশ বা গায়ে কাপড় আছে কিনা? না থাকিলে নিজে ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। অনেক সময় নিজের কাপড় ও শাল চাদর তাহাদের গায়ে দিয়া দিতেন।

দূরে, ভিন্নস্থানে বিপদে বা কোন দুঃখে পড়িয়া তাঁহাকে কেহ স্মরণ করিলে বা সাহায্য চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ বিপদ বারণ ও দুঃখ হরণ করিতেন। টাকা পয়সার দরকার হইলে তাহার দরকার অনুযায়ী যথা সময়ে গায়েবী সাহায্য করিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিতেন।

মির্জাপুর নিবাসী মওলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, "আমি এক শীতের রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতে উঠিয়া অত্যন্ত শীত অনুভব করিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম আমার বেহাই হযরত সাহেব কেবলার নিকট সংবাদ পাঠাইলে নিশ্চয় তিনি আমার জন্য শীতবস্ত্র পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার কাছে আনিত অনেক শাল ও মূল্যবান কাপড়াদি আছে। আমার আর খরিদ বা তৈয়ার না করাইলেও চলিবে।

ঘটনাক্রমে সে রাত্রে হযরত নাজিরহাটে মুন সিকদার বাড়ীর তদীয়ভক্ত আবদুর রহমান মিঞার দোকানে অবস্থান করিতেছিলেন। শেষ রাত্রে হঠাৎ তিনি আবদুর রহমান মিঞাকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, "আবদুর রহমান মিঞা একখানা বালাপোষ তৈয়ার করিয়া রাখ।" তিনি সকালে উঠিয়া দরজী ডাকিয়া তাড়াতাড়ি একখানা বালাপোষ তৈয়ার করাইয়া হযরত সমীপে হাজির করিলেন। হযরত উহার সমস্ত খরচ আদায় করিয়া দিলেন। হাদিয়া রূপে লোকের আনিত দুইখানা শাল সহ উক্ত বালাপোষ খানা সন্ধ্যায় মির্জাপুর তাঁহার বেহাই জনাব মওলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন।" হযরত তাঁহাকে "মোস্তফা" বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। মওলানা মছিউল্লাহ সাহেব বলেন যে, 'সন্ধ্যায় আমি হযরতের পাঠানো বালাপোষ ও শাল কাপড় দেখিয়া অত্যন্ত অবাক হইলাম। কারণ গত রাত্রে যাহা আমি মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলাম তাহা কাহারো নিকট ব্যক্ত করি নাই। অথচ হযরত আমার জন্য ঐ কাপড়ই পাঠাইয়াছেন, যাহা আমি পাইতে মনে মনে আশা পোষণ করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তিনি পর দুঃখে দুঃখী ও অন্তর্যামী।

এইরূপ মুফতী মওলানা ফয়েজ উল্লাহ সাহেব বক্তপুরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা বক্তপুরী মওলানা হামিদ উল্লাহ সাহেবের পুত্র মওলানা এজাবত উল্লাহ সাহেব খাজনার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কারণ তাহার গুমান মর্দন এলাকার তরফ মহাল বাকী খাজনার দায়ে নিলামে উঠিয়াছিল। তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, হযরতের কাছে চাহিলে নিশ্চয় ইহার সমাধান হইবে। তিনি হযরতের নিকট আসিবেন স্থির করিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একজন লোক মারফত হযরত কেবলা তাহার নিকট কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। তিনি টাকা গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, যত টাকা তাহার প্রয়োজন ঠিক তত টাকাই হযরত তাহার জন্য পাঠাইয়াছেন।

ইহাতে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং খোদার দরবারে হযরতের উপকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। এইরূপ অসংখ্য ঘটনা আছে যাহাতে বিপদের সময় ভক্তজনের বিপদবারণ ও দুঃখহরণ হইয়াছে।

(ক) সকলের প্রতি হযরতের দয়ার্দ্রভাব ও শিষ্টাচারিতা

হযরত সকলের প্রতি যথাযথ সম্মান সূচক ব্যবহার করিতেন। কাহারো প্রতি কোন দিন রুষ্ট ব্যবহার করিতেন না। ছোটদের প্রতি তিনি মামু সাহেব, মিঞা, দাদা ভাই ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। বয়স্ক ও বড়দের প্রতি জনাব দাদা, ভাই সাহেব ইত্যাদি শব্দে সম্মান দেখাইতেন। নিতান্ত দুরাচার লোক হইলেও তাহাকে তিনি অতি আদর ও সম্মান করিতেন। ইহাতে তাহাদের নীতি ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়া যাইত। হযরত তাঁহার সমসাময়িক আলেম ফাজেলদিগকে অতিশয় সম্মান করিতেন এবং সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব রাখিতেন। এমন কি সময়ে সময়ে হযরতের জন্য আনিত সওগাত সমূহ হইতে তাহাদের জন্য সওগাত ও সালাম পাঠাইতে দেখা যাইত।

(খ) বিলাসী পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধানে হযরতের অসম্মতি

হযরত নারীদের জেওর বা অলঙ্কার এবং তাবিজ ইত্যাদি পরিধান পছন্দ করিতেন না। অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি আদেশ দিয়া এই সমস্ত খোলাইয়া ফেলিতেন। নাক কান ছেদন করিতে দেখিলেও তিনি সমবেত লোকজনকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেন এবং এই সমস্তকে "মনহুছির জহর" বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন।

"হযরতের ধর্ম নিরপেক্ষতা"

(ক) বৌদ্ধ ধননজয়কে স্ব-ধর্মে রাখিয়া দীক্ষাঃ-

জনাব শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বর্ণনা করেন- "আমি রোজ সকালে হযরতের সহিত চা পানে অভ্যস্ত ছিলাম। তিনি আমাকে ছাড়া চা নাস্তা খাইতেন না। একদিন সকালে নাস্তার সময় নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধননজয় নামক একব্যক্তি আসিয়া হযরতের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি হযরতের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। হযরত তাহাকে সম্মতি না দেওয়ায় তাহার মনস্কাম পুরনার্থে আমাকে তাহার জন্য হযরতের নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ জানান। আমি হযরতের নিকট তাহার আর্জি ও বাসনা পেশ করি। ইহাতে হযরত ধননজয়কে তালাশ করিলেন। ধননজয়, "হুজুর দাস হাজির আছি" বলিয়া হযরতের সামনে করজোড়ে বসিয়া পড়িলেন।

তখন হযরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা! তুমি তোমার ধর্মে থাক। আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।" ইহার পরও তিনি বসিয়া রহিলেন। হযরতের খাদেম মওলানা আহমদ ছফা কাঞ্চননগরী সাহেব তাহাকে পিছন হইতে ইসারা করিয়া ডাকিয়া নিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাকে হাকিকতে মুসলমান করা হইয়াছে।

ইহার পর হইতে তিনি প্রায় সময় হযরতের হুজুরায় তাঁহার ছোহবতে সময় অতিবাহিত করিতেন। হযরতের ওফাতের পর বাবাজান কেবলার হুজুরাতে প্রায় রাত কাটাইয়া দিতেন। তাহার স্ত্রী আমাকে একদা বলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহাকে স্বশরীরে বিচরণ করিতে অনেকে দেখিয়াছেন। তাহার নির্দেশক্রমে তাহার মৃতদেহ চিতায় অগ্নিদাহ না করিয়া সমাহিত করা হয়। এইরূপ বহু হিন্দুভক্তকে চিতাগ্নি জ্বালাইতে অক্ষম হওয়ার পরে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

(খ) হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ চৌধুরীকে স্ব-ধর্মে দীক্ষা ও উপদেশ দান

হযরতের সর্বপ্রথম খলিফা অলিয়ে কামেল মওলানা শাহ্ ছুফী অছিয়র রহমান ফারুকী (রঃ) এঁর সুযোগ্য সন্তান শাহজাদা মওলানা খায়রুল বশর মিঞা সাহেব বলেন- ডাক্তার মওলানা আবদুল মজিদ ও ডাক্তার মওলানা আবদুল মালেক তাহারা উভয়েই হযরতের মুরিদ ছিলেন। তাহারা বলিয়াছেন, কদুরখীল মৌজার শ্রীকান্ত চৌধুরী বাড়ীর হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ বাবু ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া স্বস্ত্রীক একদা হযরতের সমীপে হাজির হইয়া মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, "হুজুর আমি নিঃসন্তান। হুজুরের মেহেরবাণীতে যদি আমার ছেলেমেয়ে হয় এবং আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

তখন হযরত তাহাকে উত্তর করিলেন, "তোমাকে আজল (অর্থাৎ বাস্তবে) মুসলমান করিয়াছি। নিজের হাতে পাকাইয়া খাইও। পরের হাতের পাক খাইওনা। আমাকে নিরীক্ষণ কর। আমি বারমাস রোজা রাখি। তুমিও রোজা রাখিও। দেখ মাদার গাছে ফুল হয় ফল হয় কি।"

ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার সন্তান হইবে না। "আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলমান হওয়ারও তাহার প্রয়োজন নাই; রোজা নামাজের উদ্দেশ্য মতে পাপ বিরত থাকিয়া নিজের বুদ্ধিকে সামনে রাখিয়া চলাই প্রকৃত ইসলাম।" এই পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে। হযরত তাহাকে উহার প্রতি নির্দেশ দিতেছেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

'হযরতের শান ও বেলায়ত মর্যাদার পরিচয়'

(ক) হযরতের দেহের অলৌকিক অবস্থা ঃ-

ছুফী জিয়াউল হোসাইন সাহেব বর্ণনা করেন, একবার তিনি হযরত কেবলার সহিত তাঁহার বাড়ীর পশ্চিম দিকের লোহার খালের পশ্চিম দিক হইতে বাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন। খালে পানি ও কাদা দেখিয়া হযরত পা মোবারক হইতে জুতা খুলিতে উদ্যত হইলেন। তখন জিয়াউল হোসাইন বলিলেন, হুজুর আপনি জুতা খুলিবেন না। আমি কোলে করিয়া আপনাকে খাল পার করাইয়া দিব। ইহাতে হযরত বলিলেন, "আপনি আমাকে মাটি হইতে উঠাতে পারিবেন না।" জিয়াউল হোসাইন বলিলেন, কেন হুজুর আমি তো আরো কত বার আপনাকে খাল পার করাইয়াছি। হযরত বলিলেন, "না মিঞা অদ্য পারিবেননা।" তবুও জিয়াউল হোসাইন তাঁহাকে কোলে করিয়া খাল পার করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি তাঁহাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিলেন না, শেষ পর্যন্ত তাহার চক্ষু হইতে রক্ত বাহির হওয়ার উপক্রম হইল। তবুও পারিলেন না। তাহার মনে হইল যেন হযরতের পা মোবারক মাটির সহিত লাগিয়া রহিয়াছে। ব্যাপার তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেক সময় দেখা যাইত হযরত বিছানায় শুইয়া আছেন অথচ দেখিয়া মনে হইত যেন একখানা কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার পবিত্র দেহ মোবারকে একপ্রকার দারুচিনি গাছের খোসবু ছিল। যেই রাস্তায় তিনি চলিতেন সেই রাস্তায় বহুক্ষণ পরেও পরিচিত কেউ গমন করিলে অনুভব করিতে পারিত যে, হযরত এই পথে তশরীফ নিয়াছেন। তাঁহাকে একই সময়ে বহুস্থানে এমনকি মক্কা মদিনায় পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হইত।

(খ) সময় মত আবশ্যকীয় সওগাত

হযরত বা হযরতের পারিবারিক আবশ্যকীয় কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে তাহা খোদার মেহেরবাণীতে সময় মতো আসিয়া পৌছিত। প্রয়োজনের অধিক দ্রব্যাদি তিনি বিলাইয়া দিতেন।

হযরতের পৌত্রের প্রতি অবর্ণনীয় অনুরাগ ও প্রীতির নিদর্শন

হযরত আক্‌দাছের বর্তমান সাজ্জাদানশীন তাঁহারই খেলাফত অর্পিত একমাত্র পৌত্র শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের প্রতি হযরতের যে প্রীতি ও অগাধ ভালবাসা ছিল, ইহার নিদর্শন স্বরূপ একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

হযরত সাহেব কেবলা সব সময় তাঁহাকে সঙ্গে নিয়াই পান আহার করিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন দিনই তিনি আহার্য গ্রহণ করিতেন না।

একদা তিনি তাঁহার আম্মাজানের সহিত তাঁহার নানাজান মির্জাপুর নিবাসী বড় মওলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ শাহ্ সাহেবের বাড়ীতে বেড়াইতে যান এবং তথায় তিনি একদিন অবস্থান করেন। পরদিন সকালে খাদেম রহম আলীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনা হয়। তিনি বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি যাওয়া পর্যন্ত হযরত কোন আহার্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকট খাবার নেওয়া হইলে তিনি দাদা ময়না সৈয়দ দেলাওর হোসাইনকে তালাস করিতেন। তিনি নানার বাড়ীতে গিয়াছেন শুনিলে বলিতেন, "খানা নিয়া যাও, দাদা ময়না আসিলে এক সাথে বসিয়া খাইব।"

হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, এই ঘটনার পর হইতে আমার আর কোথাও যাওয়া হইত না। বরং তাঁহার সাথে সাথেই থাকিতে হইত। এমন কি আমার বাল্যকালীন খেলাধূলা পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে যাইয়া করা হইত না। তিনি দায়েরা শরীফে তাঁহার বিছানায় বসিলে আমাকেও ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে বিছানায় বসাইতেন।

হযরতের পৌত্রের শানে রহস্যপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী

(ক) নবাব হোচ্ছামুল হায়দারের নায়েব আজিজ মিঞার প্রতি হযরতের পৌত্রের শানে বাণী

একদা কুমিল্লার জনাব হোচ্ছামুল হায়দার তাহার নায়েব চিওড়া নিবাসী আজিজ মিঞাকে বহু হাদিয়া উপঢৌকন সহ হযরতের খেদমতে পাঠান। আজিজ মিঞা দরবার শরীফে উপস্থিত হইয়া হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন, "হুজুর নবাব হোচ্ছামুল হায়দার আপনার খেদমতে এই হাদিয়াগুলি পাঠাইয়াছেন।" সেই সময় হযরত জালালী অবস্থায় ছিলেন।

নায়েব সাহেবের আরজ শ্রবণ মাত্র হযরত অত্যন্ত জালাল হইয়া উঠিলেন। মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, "এই সময় আমি হযরতের সামনে

উপবিষ্ট ছিলাম।" আজিজ মিঞার কথা শেষ হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "নবাব হামারা দেলা ময়না হ্যায়। ফের আওর কোন নবাব হ্যায়?"

(খ) বাঁশখালী নিবাসী সুলতান আহমদ নামক এক ব্যক্তির প্রতি হযরতের পৌত্রের শানে বাণী

এইরূপ বাঁশখালী নিবাসী সুলতান আহমদ নামক এক ব্যক্তি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন। হযরত তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি উত্তর করিলেন, "হুজুর আমার নাম সুলতান আহমদ।" হযরত 'সুলতান' শব্দ শুনিতেই বলিয়া উঠিলেন, "তোম কোন সুলতান হ্যায়? সুলতান হামারা দেলা ময়না হ্যায়।"

"হযরতের গাউছিয়ত স্বীকৃতি"

হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, শৈশবে একদা আমি খেলার ছলে বাড়ীর আঙ্গিনায় গান করিতেছিলাম-

গাউছে মাইজভাণ্ডার, মুজহে সরবত পেলাদো।
তিশ্নেগিয়ে দেলকো মেরে, আজ ভোজা দো।
আফছরে লাহুত হো তোম, মালেকে মলকুত
ইন ছবকা তামাসা মোজহে, আয় মাওলা দেখা দো।

ইত্যাদি-

(মওলানা হাদী রচিত)

এই সময় হযরত সাহেব কেবলা আন্দরবাড়ীতে গদীশরীফে বসিয়াছিলেন। আমার গান শুনিতে পাইয়া খাদেমকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "দুধের সরবত বানাও।" তারপর আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি লজ্জিত হইয়া হযরতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

হযরত আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন-

"দাদা ময়না সরবত খাইবেন?"

হযরতের সামনে একজাম দুধের সরবত দেওয়া হইল। প্রথমে তিনি নিজে কিছু সরবত গ্রহণ করিলেন। বাকী সরবত একবার তিনি পান করেন, কিছু আমাকে পান করান। বাকী সরবত অন্যান্যদের বিলাইয়া দেওয়া হয়।

"হযরতের উত্তরাধিকারী খলিফা নির্ণয় ও গদী অর্পণ"

হযরতের পার্থিব নশ্বর জীবনের প্রায় শেষ সময় দেখা দিলে তাঁহার হস্ত ও

পা মোবারকে এক প্রকার শোথ ও আমাশার ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এমন সময় একদিন আমি তাঁহার সহিত বাহিরে দায়েরা শরীফে বসা ছিলাম। সেই দিন শুক্রবার ছিল। জুমার নামাজ শেষ করিয়া মুসল্লিগণ পূর্বের নিয়ামানুযায়ী তাঁহাকে ভক্তি ও কদমবুচি জানাইতে হাজির হইল। হযরত সাহেব কেবলা পূর্বমূখি উপবিষ্ট আছেন। আমার বড় ভাই সৈয়দ মীর হাছান সাহেব আগন্তুক হাজতিগণকে হযরতের খেদমতে আনিয়া সাক্ষাৎ করার কাজে রত আছেন। ঘরে বাইরে অসংখ্য লোকের ভীড়। মহল্লার সরদার মরহুম সায়াদ উদ্দিন ও তাহার ভ্রাতা আছাব উদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলেই হযরতের শেষকালীন লক্ষণ দেখিয়া মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। আছাব উদ্দিন সাহেব হযরতের খেদমতে অতি কাতর ভাবে আরজ করিলেন, "হুজুর আপনার তবিয়ত ও শরীর দিন দিন কমজোর হইয়া যাইতেছে। কোন সময় আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া আপনার স্বস্থানে চলিয়া যান, তারতো কোন ঠিক নাই; হুজুর স্বয়ং থাকিতে হুজুরের বড় নাতী সৈয়দ মীর হাছানকে গদীতে বসাইয়া গেলে আমাদের জন্য ভাল হইত। আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েগণ, হুজুরের ভক্ত-অনুরক্ত, আগন্তুকগণ আসিয়া হুজুরের গদীশরীফে সান্ত্বনা পাইতে এবং মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিতে পারিতাম।

হযরত আক্দাছ তাহাদের প্রতি উত্তর করিলেন, "মীর হাছান মিঞা নাবালেগ আমার "দেলাময়না" বালেগ! দেলাময়নাই আমার গদীতে বসিবেন।" সৈয়দ মীর হাছান মিয়া বয়সে বড় অথচ হযরত বলিতেছেন নাবালেগ; উপস্থিত জনগণ তাঁহার এই বিপরীত বাক্য রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। হযরতের পরলোক গমনের তেতাল্লিশ দিন পর যখন মীর হাছান মিঞাও জান্নাতবাসী হন তখন সকলে হযরতের পবিত্র কালামের রহস্য বুঝিতে পারিল।

হযরতের পৌত্রের মর্যাদা নির্দেশে তাঁহার নবী অবয়বতার পরিচিতি

একদিন হযরতের ভ্রাতুস্পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ হাসেম সাহেব ভোরবেলায় সৈয়দ মীর হাছান সাহেবকে নিদ্রা হইতে একটু কর্কশ ভাষায় ডাকিয়া উঠাইতে শুনিয়া হযরত বলিলেন, "মিঞা! রছুলুল্লাহর (সঃ) দুইজন নাতী হাছনাইনকে চিন না? (হযরত হাছান ও হোছাইন) আদবের মোকাম। আদব করিও।" সেই দিন হইতে সকলেই তাঁহাদের প্রতি হাছনাইনের সমান আদব ও সম্মান করিতেন।

হযরত কেবলার উপরোক্ত কালাম এবং ইঙ্গিত বহন করিতেছেন যে "হাকিকতান" বাস্তবে, হযরত-নবীর এবং তাঁহার পৌত্রদ্বয় হযরত হাছান হোছাইনের জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি।

হযরতের নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবাজান কেবলার প্রতি ফয়েজ বর্ষণ ও খেলাফত স্বীকৃতি

হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) সাহেব (প্রকাশ বাবাজান কেবলা) হযরতের প্রতি পতঙ্গতুল্য আশেক ছিলেন। হযরতও তাঁহাকে অত্যন্ত আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতির নজরে দেখিতেন। একদিন জনাব বাবাজান কেবলা হযরত সাহেবের কদম শরীফ দুইখানাকে দুইহাতে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, হযরত কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়াইতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি জজ্‌বার হালতে তন্ময় অবস্থায় তাঁহাকে চেয়ারের হাতল দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহার করিতে করিতে তাঁহার সমস্ত বদন মোবারক রক্তাক্ত করিয়া দিলেন এবং মাথার চুল মোবারক ধরিয়া মুখমণ্ডলকে উপর দিকে ফিরাইয়া সুন্দর চেহারার প্রতি জজ্‌বাতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বলিতে লাগিলেন, "ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি।"

হযরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, এমতাবস্থায় আমার দাদী আম্মা হযরত সাহেবানী ও আমার মাতা এবং জেঠাই শাশুড়ী সাহেবানী উপস্থিত হইয়া অতি কৌশলে সজোরে বাবাজান কেবলার হাত দুইখানা হযরতের কদম শরীফ হইতে ছিনাইয়া লইলেন এবং তৈল দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া হযরত সাহেবানী বলিতে লাগিলেন, "আপনি এখন কি কাজ করিলেন? এমন সুন্দর চাঁদের মত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে এইভাবে প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করা কি আপনার উচিত হইয়াছে? তাঁহার মাতাপিতা কি বলিবেন।"

হযরত সাহেব তখন বিশেষ শান্তভাবে বলিলেন, "তাহা ঠিকই; তাঁহাকে আমার একটি চক্ষু দিয়া দিয়াছি, সে শেষ পর্যন্ত আমার দুইটি চক্ষুই চায়। তাহাকে আমার দুইটি চক্ষুই দিয়া ফেলিলে আমি চলিব কি করিয়া।" তখন হযরত সাহেবানী বুঝিতে পারিলেন, ইহা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদারই মারপেঁচ।

তারপর বাবাজান কেবলাকে বলিতে লাগিলেন, "বাবা আপনি যখন তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, সামনে আসিলে আপনার প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করেন এবং তিনিও প্রহার করেন এমতাবস্থায় আপনি কিছুদিন বাহিরে ছায়েরে চলিয়া যান। যখন আপনাকে দেওয়ার সময় হইবে, তখন হযরত আপনাকে তালাশ করিয়াই যাহা দেওয়ার দিয়া দিবেন। তাঁহার হায়াত ও কাজ আরো বাকী আছে। আপনি কি এই সময়ে তাঁহাকে বিদায় দিতে চান? আওলীয়াদের কাজ শেষ হইলে তাঁহারা আর ক্ষণকালও এখানে থাকেন না। তাঁহার কালামে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই সময় আপনি কিছুদিন দূরে থাকা নিতান্ত দরকার।"

হযরত সাহেবানীর এই আদেশে বাবাজান কেবলা ছায়েরে বাহির হইয়া যান।

হযরতের হাকিকত রহস্যময় জজ্‌বাতি কালামে স্বমর্যাদা নির্দেশ ও উপদেশাবলী

হযরত সাহেব কেবলা ভাব বিভোর তন্ময় অবস্থার পর শান্ত প্রকৃতিতে যে সমস্ত জজ্‌বাতি রহস্যপূর্ণ কালাম করিতেন, তাহা সঙ্কলিত হওয়ার পূর্বে সাধারণ জ্ঞানের অতীত ছিল। তত্বজ্ঞানীরা কিছু কিছু বুজিলেও সম্পূর্ণ বুঝা বিশেষ দায় হইয়া পড়িত।

হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, একদিন আমি হযরতের পাশে উপবিষ্ট আছি। পার্শ্বস্থ কুলাল পাড়ার হারিচান্দ নামক এক ভক্ত হযরতের খেদমতে আসিতেই হযরত তাহার প্রতি চটিয়া জালাল হইয়া যান। হযরত বলিতে লাগিলেন, "আমি একদিন আমার ভাই পীরানে পীর সাহেবের সহিত কাবা শরীফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম-রছুল করিম (সঃ) এঁর "ছদর" মোবারক (ছিনা) এক অসীম দরিয়া। আমরা উভয়ে উহাতে ডুব দিলাম। পরে দেখি, দরজাতে রক্ষিত আমার দারুচিনি গাছের লাঠিটি হারিচান্দ চুরি করিয়া তাহার নিজের চাকের কাঠি বানাইয়াছে।" প্রকাশ থাকে যে, কুম্ভকারেরা মাটির পাত্র তৈয়ার করিতে ছাঁচ দেওয়ার জন্য যে কাঠি ব্যবহার করে উহাকে চাকের কাঠি বলে। তিনি এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, লোকে সুযোগ পাইয়া দুনিয়ার কাজে হাজত মকছুদ পূরণেই শুধু তাঁহার দৈহিক অবস্থা ও বেলায়তী শক্তিকে ব্যবহার করিতেছে।

কোন কোন সময় হযরত জজ্‌বাপূর্ণ অবস্থার পর বলিতেন, আমার চার কুরছি আছে, চার এমাম আছে, বারটি বোরুজ বা ছেতারা, বারখানি কাছারী আছে।" সময়ে সময়ে হিসাব করিয়া উহাদের নামও বলিতেন। যাহা নবী করিম (সঃ) এঁর সাদৃশ্যতার প্রতীক। সময়ান্তর ব্যক্তি বিশেষকে গালি দিতেন ও হস্তযষ্টি দিয়া প্রহারও করিতেন। সময়ে বলিতেন, "নবী করিম (সঃ) কে পাছ দো টুপী থে, এক হামারে ছেরপর দিয়া দোছরে হামারা বড়া ভাই পীরানে পীর ছাহেব কা ছেরপর দিয়া।"

একদা তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল হামিদ সাহেব তাঁহার খেদমতে আরজ করিয়া বলিয়াছেন, দাদা আপনি এতবড় আলেম হইয়া জজ্‌বার হালতে এইরূপ গালিগালাজ ও বকাবকি করেন কেন?"

তখন হযরত তাঁহাকে বলিয়াছেন "ভাই আবদুল হামিদ, তোমার স্ত্রী যখন ভাত পাক করে, তুমি কি তাহা দেখিয়াছ। পাতিলের মুখে ঢাকনি থাকে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তবে তোমার চিন্তা করা উচিত। সামান্য অগ্নিতাপে পাতিলের ঢাকনি উত্তপ্ত হইয়া অসহ্যে উছলিয়া পড়ে। অথচ খোদার অফুরন্ত অবর্ণনীয় দাউ দাউ আকারে প্রজ্বলিত প্রেমাগ্নি মানব দেহে যখন উত্তাপ বিস্তার করে, এলেমের ঢাকনী তখন কি করিতে পারে? আহমদ উল্লাহ্‌র কাছে খোদা প্রদত্ত এলেম আছে বলিয়াই তা এতদুর বরদাস্ত করিয়া আসিতেছে। তুমি একবার আমার চাদরের নীচে আসিয়া দেখ। আছমান, জমিন, আরশ, কুরছি, লৌহ, কলম, বেহেস্ত, দোজখ তোমাকে এক পলকে দেখাইয়া আনি। তবে তুমি বুঝিতে পারিবে। আমি কেন এইরূপ করি।"

সৈয়দ আবদুল হামিদ সাহেব ভাবিলেন, না জানি তাঁহার চাদরে দাখিল হইলে আমার অবস্থা আবার কেমন হয়! আমার অবস্থা বিরূপ হইলে এই সংসার পরিচালনা করিবে কে। এই ভয়ে তিনি হযরতের সম্মুখ হইতে দ্রুত সরিয়া গেলেন।

হযরত খোদাসক্ত ও পবিত্র সরলতাপূর্ণ মানুষকে বেশী ভালবাসিতেন তাই তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, "আমার নিকট কি লইয়া আসিয়াছ। একখানা ঘৈস্যা ডালস্ বা পাটি পাতার ফুল নিয়াও আসিতে পার নাই।"

"তিনি সময়ে নির্দেশ দিতেন ফেরেস্তা কালেব বনে যাও।" অর্থাৎ ফেরেস্তার মত পরিষ্কার পবিত্রতায় আল্লাহ্‌র প্রশংসায় রত থাক। "কবুতরের মত বাছিয়া খাও" অর্থাৎ হারাম পরিত্যাগ কর। "সন্তান সন্ততি লইয়া সুমধুর স্বরে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও প্রশংসা গীতিতে নিমগ্ন থাক।" যেমন কবুতর বলে "আক্য়াবুন মরফুয়াতুন ও আক্ওয়াবুন মউজুয়াতুন।" কোন কোন সময় কাহারো প্রতি আদেশ করিতেন, "কুনজাস্‌কের মত (চানচড়াপাখী) নিজ হুজুরায় বসিয়া আল্লাহ্‌র নাম জপন কর" কাহাকে বলিতেন, "কোরান শরীফ তেলাওয়াত কর।" আবার কাহারো প্রতি আইয়ামেবিজের (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫, তারিখাদির) রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন। কারো কারো প্রতি ছালাতে তসবিহ ও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে বলিতেন।

তাঁহার প্রথমাবস্থা ছাড়া শেষ অবস্থায়ও তিনি নামাজ রোজা পাত্রভেদে হজ্ব জাকাত বা আরকানে শরিয়ত পালন নির্দেশে ও তাঁহার বেলায়তী কৌশলে উহাকে কার্যকরী করাইতে দেখা যাইত এবং নানা প্রকার নফল পদ্ধতিতে পাপ বিরত ও প্রেম প্রেরণাবর্দ্ধক পূণ্যময় কার্যে মনোনিবেশ ও উৎসাহিত করিয়া থাকিতেন। তিনি আচারে, আলাপনে ভাবভঙ্গিতে মানবকে পার্থিব ও অপার্থিব অপচয় অনর্থক কার্য হইতে দূরে সরাইয়া সার্থকতা ও সফলতার প্রতি অনুধাবিত করিতেন। সময়ে তাঁহাকে বাহ্যিক শরীয়তি নির্দেশের বিপরীত হাকিকত শরিয়তে রহস্যযুক্ত কার্যেরতও দেখা যাইত। কোন কোন সময় অনেক দিন পর্যন্ত তিনি দিবারাত্র আহার করিতেন না। সপ্তাহ বা পক্ষকাল পর্যন্ত তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে দেখা যাইত।

(ক) দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিতে নবীর অবয়র দৃশ্য

হযরত কেবলা সর্বাঙ্গিন আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে নবী করিম (সঃ) এঁর অবয়ব ছিলেন। তাঁহার শারিরীক গঠন ও নবী মোস্তফার (সঃ) শারিরীক গঠনের মধ্যে কেবলমাত্র মোহরে নবুয়তের পার্থক্য ছিল এবং নামের মধ্যে নবী মোস্তফা (সঃ) এঁর মুহাম্মদ নামের নামীয় ছিলেন না বটে কিন্তু মুহাম্মদ ও আহমদ নামের সমস্ত প্রকৃতি ও গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠ মোবারকের বাজুর নীচে কতেক জায়গায় ঘনিভূত লাল তিল প্রায় পরিদৃষ্ট হইত। কাওলী অর্থাৎ আলাপ আলাপনে তিনি নবী করিম (সঃ) এঁর মত মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার মৃদু আলাপ মানব হৃদয়কে মোহিনী যাদু অপেক্ষাও অধিকতর আকর্ষণ করিত। তিনি ছোট বড় সকলের প্রতি যথাযথ সুমিষ্ট ও

সম্মান সূচকব্যবহার করিতেন। তাঁহার পবিত্র বাক্যালাপে সদা সর্বদা খোদায়ী প্রেম অনুগ্রহকণা বর্ষিত হইত। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্টি তো দূরের কথা তুষ্ট হয় নাই বলিয়া এমন কোন নজির ও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। প্রত্যেকে মনে করিত হযরত আমাকেই বেশী ভালবাসেন। "ফেয়ল ও আমলী" অর্থাৎ কার্যরত, খোদায়ী প্রেম প্রেরণায় ও ধ্যান ধারণায়, গুরুভক্তি ও পরোপকারিতায় এবং রেয়াজত সাধনায় বাহ্যিক প্রচার কার্য ছাড়া আছরারী রহস্যময় দিক্ দিয়া নবী করিম (সঃ) এঁর পূর্ণ সাদৃশ্য ও কার্য বিজড়িত ছিলেন। তিনিই কলেমা তৈয়ব "লা এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ" আল্লাহতা'লার একত্ববাণী সনাতন ইসলামী মুল মন্ত্রের সারবস্তু ছিলেন এবং মানবজাতিকে উহার উচ্চাসনে পৌছাইতে ও উক্ত মকামে পৌছাইবার সঠিক ও সহজাত পথ নির্দেশে বদ্ধপরিকর ও দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। উক্ত মুলমন্ত্রের উদ্দেশ্য স্থানের প্রতি তিনি মানবকে অনুধাবিত করিতেন।

ছেফাতি বা গুণাবলীর দিক দিয়া তিনি জাহেরী উম্মি নিরক্ষর না হইলেও পরম আল্লাহ তা'লার প্রেম প্রেরণায় ও তাঁহার তৌহিদ তত্ত্বে এমন বিভোর ছিলেন, যাহাতে পার্থিব জগতে প্রকাশ্য অক্ষর শিক্ষা পার্থিব কৌশল ও জীবিকা নির্বাহ বুদ্ধি তাঁহাকে কোন প্রকার সহায়তা করিতে সফলকাম হয় নাই। বরং তাঁহার খোদা প্রদত্ত তৌহিদ রহস্যপূর্ণ জ্ঞানের সামনে পরাজিত ও হার মানিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে জাহেরী জ্ঞানের স্বভাব হইতে তিনি চিরমুক্ত ও পার্থিব ব্যাপারে উম্মিই ছিলেন।

তিনি নবী করিম (সঃ) এঁর বাকী সমস্ত গুণাবলীতে স্বভাবতঃ জন্মগতভাবে পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। যাহা তাঁহার বর্ণিত বাণীতে ও আচার ভঙ্গিতে অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হয়। পূর্বে তাঁহার বর্ণিত কয়েকটি বাণীর নমুনা দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে নবী করিম (সঃ) সাদৃশ্যতার কোরান হাদিস বর্ণিত মতে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না।

চার এমাম, চার কুরছি ও বার বোরজের অধিকার লাভ করা তাঁহার অবয়ব প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কাহারো প্রাপ্য নহে। নছলী বংশজাত সন্তানাদির লক্ষণেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) একক অদ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত যুগ প্রবর্তক ও সংস্কারক প্রতিনিধি ছিলেন। এবং তাঁহারই পূর্ণক্ষমতা ও গুণের আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া বিশ্ব অলি গাউছুল আজম বেশে সারা ভূবন পরিচালনা করিতেছেন। বিশ্বভুবন ব্যাপী আখেরী নবীর তৌহিদ তত্ত্ব প্রেমপূর্ণ রহস্য লীলার মহা প্রভুর করুণা কথা বরিষণে "রহমতুল্‌লিল আলামিন" ভুবনবাসীর ত্রাণ কর্তা আখেরী অলির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। নবী করিম (সঃ) যেরূপ কোন পুত্রজাত সন্তান জীবিত রাখিয়া যান নাই। তেমনি হযরত আক্‌দাছও কোন ঔরসজাত পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেব, তাঁহার ইহলোককালীন সময়ে দুইজন শিশু সন্তান; সৈয়দ শাহ্ মীর হাছান ও শাহ্ ছুফী সৈয়দ মওলানা দেলাওর হোসাইনকে ভবে রাখিয়া জান্নাতবাসী হন। যাঁহাদের পরিচয় ও মর্যাদা নির্দেশ করিতে যাইয়া হযরতকে নিজের গোপন রহস্যময় পরিচয় দান করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে 'হাছনাইনে নবী' তুল্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরতের নাতিদ্বয় হযরত এমাম হাছান ও হোছাইনের সাদৃশ্য বলিয়া তাঁহার পবিত্র কালামে প্রকাশ পায় এবং কার্যক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয়। হযরত আক্‌দাছ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও যাবতীয় স্বাভাবিক অস্বাভাবিক গুণ কার্যবলীতে নবীর পূর্ণ অবয়ব এবং প্রত্যক্ষ প্রতীক ছিলেন।

(খ) হযরতের বেলায়ত মর্যাদার দৃশ্য

হযরতের শিশুকালীন স্বভাব ও অবস্থা হইতে নির্বিকারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি খোদাবাঞ্ছিত স্বভাবসিদ্ধ মাদারজাত অলি ছিলেন। জাহের বাতেন প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থে জ্ঞান অর্জনে তিনি 'বিদ-দারাছাত' মোকামের শ্রেষ্ঠতম অলি পদবী লাভ করেন। পীরে কামেলের নিকট প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দীক্ষায় ফয়েজ রহমত লাভ ও খোদাতা'লার তৌহিদ নিগুঢ় রহস্য জ্ঞান অর্জনে বিল বেরাছাত উত্তরাধিকারীর মর্যাদা সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধীকারী আউলিয়ার আসনে অলঙ্কৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে দুইজন শ্রেষ্ঠতম পীরে কামেলের বাঞ্চিত মুরিদ খলিফা সাব্যস্তে গাউছিয়ত ও কুতুবিয়তের সর্বোত্তম শক্তি ও মর্যাদা লাভ করেন। কঠোর রেয়াজত ও অবিশ্রান্ত প্রেমপূর্ণ সাধনা বলে আত্মশুদ্ধির পরম উন্নত স্তরে উপনীত হইয়া বিল মালামাত দরজার সর্বোপরি মালামিয়া কলন্দরীয়া ও আদর্শ অলি সাব্যস্ত হন।

এমনিভাবে তিনি পরম করুণাময় আল্লাহ্ ও তাঁহার মাহবুবগণের বাঞ্ছিত নির্বাচিত আজলি ও আদবী অলি এবং শিক্ষায় ও কঠোর সাধনায় সর্বস্তরে সমস্ত মোকামের শ্রেষ্ঠতম বিশ্বজনীন গাউছুল আজম ও কুতুবুল আক্‌তাব খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই আল্লাহতা'লার একমাত্র অদ্বিতীয় মাহবুব ও উভয় জাহানের প্রতিনিধি, শেষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর পদাঙ্ক অনুসারী "লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রছুলুল্লাহর" মুল রহস্য ও উদ্দেশ্য অনুগামী। এবং উক্ত পথের অনুসন্ধান দাতা ও নির্দেশকারী স্বাধীন শেষ অলির পদবী লাভ করেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিগত কোন গোত্র সমাজ বা সম্প্রদায় গত অলি নহেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে হিংসা বিদ্বেষ সমাজ ও ধর্মীয় বাধা বিঘ্ন পরিহারে সমস্ত ধর্মের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ এর একত্বে, প্রেম প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে বিশ্বমানবকে পৌছাইয়া দিতে ও উক্ত পথে অনুধাবিত করিতেই তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি বিশ্বজোড়া মহাসাগর রূপে বিশ্বমানবকে ভুবনব্যাপী প্রেম ধারায় বহাইয়া নিয়া খোদার প্রেমে নির্জীব দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতেন। সমস্ত তৃষ্ণাতুর জ্বিন মানবকে স্মরণের সঙ্গেই প্রেম বারীতে তৃষ্ণা নিবারণ করাইয়া প্রেম ইঙ্গিতে একত্বের মহাসাগরে আহবান করিয়া নিতেন। তাঁহার প্রেম প্রেরণা বরিষণে মানব হৃদয়ের নফ্‌ছাকৃতি আবর্জনাকে পরিষ্কার পবিত্র করিয়া মহান একত্বে মিশাইয়া দিতেন। জড় প্রাণী ও রূহানী জগত তাঁহার চক্ষুর সামনে ক্ষুদ্র সরিষা সাদৃশ্য ছিল। আল্লাহতা'লার গুপ্ত-ব্যক্ত ও ইহ-পরকালীন সমস্ত সৃষ্টি জগতে তাঁহার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি "মাহবুবে নাজনিন রহমতুল্লিল আলামিন" সমস্ত সৃষ্টি

জগতে অনুগ্রহ বারী বর্ষণকারী। সৃষ্টি সুপরিচিত পরম অদ্বিতীয় বন্ধু ছিলেন। মোমেন, মুত্তাকী, ছুফী, কামেল, তাইয়ারা, ছাইয়ারা, ফানাফিল্লাহ বাকাবিল্লাহ দর্শনে খোদা ভীতি, খোদা স্মরণ ও খোদার প্রেমবারী বর্ষণ ইত্যাদি বেলায়তী নমুনা সমূহের সর্বোচ্চ স্তরেই তাঁহার আসন ছিল।

প্রভাব বিস্তার ও ফয়েজ বরিষণের স্বরূপ

প্রভাব বিস্তার ও আলোক প্রদানে তিনি বিশ্ব রবি হইতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কারণ, সূর্য হইতে চন্দ্র আলোক আহরণ ও প্রভাবান্বিত হয় মাত্র। কিন্তু সূর্য সমতুল্য আলোক ও প্রভাবশালী দ্বিতীয় সূর্যের সৃজন হয় না। আবার সূর্য বিহনে চন্দ্র আলোক ও প্রভাব শূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু হযরত আক্‌দাছ এমনি খোদাদাদ সূর্য শ্রেয় অলি ছিলেন; যে একটি প্রদীপ হইতে যেমন বহু প্রদীপের সৃষ্টি হয়, তেমনি তাঁহার প্রেমালোকে ও প্রভাবে অসংখ্য প্রভাবশালী সূর্য তুল্য আউলিয়া সৃজন ও উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাঁহার প্রভাব ও আলোক রশ্মিতে বহু আবর্জনা ও অপবিত্র পবিত্র হইয়া নিজ পবিত্র মহান জাতে মিশিয়া গিয়াছে।

তাঁহার প্রভাবেই ঋতু পরিবর্তন, সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদ, পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, খোদার সমস্ত সৃষ্টি জগতে শৃঙ্খলা সংগঠন ও সমাধা হইয়া থাকে। যাহা খোদার সমস্ত চিরন্তন রীতি ও নীতি। পূর্বোল্লিখিত ঘটনাবলীতে সমগ্র জগতে তাঁহার প্রভাব অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান ও পরিলক্ষিত হয়।

হযরত চার প্রকার বেলায়ত ধারার ছালেক, মজজুব, ছালেকে মজজুব ও মজজুবে ছালেক, শেষোক্ত সর্বধারা সংযোজিত জজ্‌ব ও ছলুকের সংমিশ্রণে, জজ্‌ব বা প্রেরণাধিক্যে উন্নীত সর্বশ্রেষ্ঠ বেলায়তী ক্ষমতাশালী মজজুবে ছালেক পদবীধারী আউলিয়া ছিলেন। ইহাই বেলায়তের সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক প্রভাবশালী পদবী ও স্তর। অন্য স্তরের অলিগণ সাধারণতঃ এই স্তরের অলিদের অনুগত থাকে। এই স্তরের অলিরাই পীরে ফায়াল। বাক্যালাপে শিক্ষাছাড়া, নিজ নিজ প্রভাবে মুরিদকে খোদার রহস্য জ্ঞান ও একত্বে পৌছাইতে সর্বাধিক সক্ষম। তাই হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফয়েজে এনাকাছী-খোদার সুগন্ধিতে সদা অন্বেষণ প্রবৃত্তি জাগরণী ফয়েজ স্বভাবতই অর্পিত হইত। কোন মুত্তাকী বা উপযুক্ত লোক হযরতের সংশ্রবে হাজির হওয়া মাত্রই তাওয়াজ্জোয়ে এলকায়ী দ্বারা তৈলপূর্ণ প্রদীপের মত প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া যাইত। এবং এছলাহী ফয়েজ ও তাওয়াজ্জোর বদৌলতে জল সঞ্চয়ক হাউজের মত ঐশ্বরিক প্রেম প্রেরণায় পূর্ণ হইয়া সমস্ত লতিফা ও রগরেশা আলোড়িত নফ্‌ছ ও লতিফা সংশোধনের পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত হইত। যথাযথ-উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত হইলে অথবা তিনি যাহাকে ইচ্ছা করিতেন, নিজ ইত্তেহাদী ফয়েজ ও তাওয়াজ্জোর বদৌলতে স্বগুণে গুণান্বিত এবং স্বআত্মার প্রভাবে স্বীয়শক্তিতে মিশাইয়া লইতেন। এই নিম্নোক্ত ফয়েজই হযরত অত্যধিক দান করিতেন। ইহাতে দ্বিতীয় বার ফয়েজ অর্জনের বিশেষ

কোন প্রয়োজন হইত না। ইহাতে মুরিদ, পীরের সমগুণে রূপায়িত হইয়া পূর্ণ কামালিয়ত অর্জনে সক্ষম হইতেন। যাহাকে তিনি এক নজরে ইত্তেহাদী দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহাকে দোজাহানের সুলতান ও পরশমণি করিয়া দিতেন।

হযরত সাধারণতঃ নবী করিম (সঃ) এঁর প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিম্ন পদ্ধতিতে ফয়েজ রহমত অর্পণ, মুরিদ ও ভক্তগণের আত্মায় নিজ আত্মার প্রভাব বিস্তারে অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেন।

জবানী আলাপ আলোচনার মারফতে : যেমন- হযরত নবী (সঃ) স্ত্রীলোকদিগকে বায়াত করিতেন।

হাতে হাত রাখিয়া: যাহা অধিকাংশ সাহাবীগণ হযরত রছুল মকবুল (সঃ) এঁর হাতে বায়াত ও ফয়েজ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভক্তি ও বিশ্বাসের মাধ্যমে: স্ব-স্বাক্ষাতে মুরিদ নিজ ভক্তি এতেকাদের হাত হযরতের হুকুমের হাতে রাখিয়া তাঁহার আদেশ উপদেশ পালনে যেমন নবী করিম (সঃ) পরবর্তী উম্মতে মোহাম্মদীগণের ফয়েজ ও বায়াত গ্রহণ।

হযরতের খেদমত, সংশ্রব ও সাহচর্যতার দ্বারা: যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) এঁর বায়াত ও ফয়েজ গ্রহণ।

সাক্ষাৎ বিহীন: কেবলমাত্র প্রগাঢ় ভক্তি ও মহব্বতের মাধ্যমেও তিনি তাওয়াজ্জো দান করিতেন। যেমন হযরত ওয়ায়েজ করণীর (রাঃ) বায়াত ও ফয়েজ রহমত কণা অর্জন।

কাপড় ও ব্যবহারিক সামগ্রী প্রদানে : আবিসিনিয়াধিপতি নাজ্জাশীকে হযরত নবী মোস্তফা (সঃ) বায়াত ও তাওয়াজ্জো দান করিয়াছিলেন।

তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষেপিত খাদ্য সামগ্রী বা তবরুক প্রদানে : যেমন হযরত আলী (কঃ) এঁর বায়াত ও ফয়েজ রহমত অর্জন। এই তাওয়াজ্জোই বিশেষ প্রেম পূর্ণ শক্তিশালী বলিয়া প্রমাণিত। এই প্রণালীতেই হযরত আক্‌দাছ অধিকাংশ সময়ে ফয়েজ ও তাওয়াজ্জো দান করিতেন। সময় সময় নিজ ব্যবহারিক হস্তের লাঠি বা নিজ হস্তের প্রহারেও তিনি ফয়েজ ও তাওয়াজ্জো দান করিতেন।

কেরামত গুরুত্ব

হযরত নিজেকে আত্মগোপন রাখিতে সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। তবুও আল্লাহতা'লার মূখ্য উদ্দেশ্য ও বেলায়তী শানকে সফলকামী করিতে হইলে মানবজাতির বিশ্বাস ভক্তি ও প্রেম প্রীতি জাগাইয়া তাহাদের সুপথে গন্তব্য স্থানে আহবান করা একান্তই প্রয়োজন। তাই তাহাদের বিশ্বাস ভক্তি আনয়ন হেতু নবীদের মো'জেজা সম, অনেক প্রকার অলৌকিক ঘটনা ও কেরামত স্বভাবত: প্রকাশিত হইয়া পড়িত। মানুষদেরকে সুপথে আনিতে তাহাদের আত্মায় নিজ আধ্যাত্মিক বেলায়তী প্রভাব, ফয়েজ রহমত ও তাওয়াজ্জো বিস্তার করিতে অনেক রকম ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সংঘটন ও কেরামত

ঘটাইয়া বসিতেন। এই সমস্ত কেরামত সাধারণত ঃ- খোদাতা'লারই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। অত্র কারণে হযরত নিজ স্বরূপকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে পারেন নাই। স্বভাবতঃ খোদার ইচ্ছাতেই এই বিশাল ভব প্রান্তরে তাঁহার পবিত্র মহান আত্মার বুজুর্গী বিকাশ হইয়া পড়ে। নচেৎ খোদার উদ্দেশ্যে তাঁহার একত্বে আহবান লীলা বেলায়ত রহস্য ব্যর্থ হইয়া পড়িত। তাঁহার প্রভাবে এই দেশের অলিতে গলিতে মাঠে ঘাটে সর্বত্র অদ্ভুত অলৌকিক সংঘঠন ও কেরামত বিকশিত ও বিদ্যামান রহিয়াছে। দেশবাসীর মুখে অন্তরে তাঁহার প্রভাব জনিত যে সমস্ত কেরামত বিজড়িত ও বিঘোষিত রহিয়াছে তাহা সাধারণ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব মানবের প্রতি হযরতের অবদান

(ক) নিরপেক্ষ তৌহিদ দ্বার উদ্‌ঘাটন

হযরত আক্‌দাছ বিশ্ব মানবের জন্য এমন দুর্লভ অবদান সমূহ বিদ্যমান রাখিয়া গিয়াছেন যাহার সুফল আবহমান কাল পর্যন্ত স্থায়ী ও অবিকৃত থাকিবে। নবী করিম (সঃ) এঁর রক্ষিত চির অবিকৃত সর্বযুগোপযোগী পবিত্র কোরানগ্রন্থ ও তাঁহার বর্ণিত পবিত্র যুগ-সাপেক্ষ হাদিছাবলী এবং ভুবনময় সর্বজাতীয় ধর্মগ্রন্থ ও রীতিনীতি সমূহের মূল উদ্দেশ্য সনাতন ইসলাম তৌহিদ খোদাদাদ নীতি পালনে পরম দয়াময় এক অদ্বিতীয় মহা শক্তিবান প্রভুর একত্ব জাতে সম্মিলন। ইহাই একমাত্র স্রষ্টা ও সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। ইহজগতে মানবের অবতরণের পর নবীবর মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) তাঁহার আহমদী বেলায়তী শক্তি বলে একমাত্র মহা প্রভুর একত্বে মিলন পথ আবিষ্কার ও নির্দেশিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আহমদীয় বেলায়ত পদ্ধতির প্রাধান্য মোহাম্মদীয় নবুয়ত পদ্ধতীর সমাপ্তিতে স্থিতিশীলতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নবুয়ত পদ্ধতি কেবল মাত্র নাছুতী মোকামের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নাছুতী স্তরের মানবের জন্য বিদ্যমান ও অনুসরণীয় হইয়া থাকে।

পবিত্র কোরান হাদিছের মেরুদণ্ড ও সুক্ষ্ম উদ্দেশ্য, কলেমা তৈয়ব এর (লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ) মূল রহস্যদ্বার উদঘাটন প্রণালী খোদাতা'লার রহস্য জড়িত আহমদী বেলায়ত পদ্ধতি চিরন্তন, সার্বজনীন ও সকলের অপরিহার্য অনুসরণীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু হযরতের পূর্ববর্ত্তী আউলিয়াগণ ধর্মীয় বাঁধনের মধ্যস্থতায় সম্প্রদায়গতভাবে আংশিক উক্ত রহস্য উদঘাটন করিলেও সম্প্রদায়গত সর্বজন বিধিত হিসাবে বিশ্ব মানবের প্রতি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ধর্মমত বিরোধ পরিহারে বাধাহীন মুক্তির দ্বার উদঘাটন কেহই করেন নাই। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীই একমাত্র উক্তদ্বার উম্মোচক ও বাধ্য-বাধকতার পরিণতিকারী। তাই তাঁহাকে "বেলায়তে মোত্‌লাকা"র (স্বাধীন বাধাহীন বেলায়তের) অধিপতি ও খাতেমুল বেলায়ত পদবীতে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই নিরপেক্ষ অবদান মানব জগতে আল্লাহ্‌র একত্ব আলোক ছড়াইয়া সহজতর ভাবে নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র একত্বে পৌছাইয়া দিতেছে। ইহা সকল ধর্ম ও তরিকতের গন্তব্য স্থানে পৌছিবার একমাত্র সহজতম উপায়। ইহাই যুগসাপেক্ষ

খোদার তৌহিদালোক, যাহা বিশ্ব জগতকে মহাজাতে সুমধুর মিলনের একমাত্র নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন ও মুক্ত বেপরওয়া তরিকত পদ্ধতি এবং আহমদী বেলায়তী শক্তির সহজ সাধ্য সক্ষমকারী স্বরূপ। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী, লোকের বাহ্যিক আচরণ ও আচার পদ্ধতিতে অধিক গুরুত্ব না দিয়া আভ্যন্তরীণ ভক্তি বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে অধিক গুরুত্ব ও মূল্য দিতেন।

(খ) খোদার একত্ব পথের সন্ধানে প্রেরণা দান

খোদার একত্ব দেশে পৌছিতে হইলে আধ্যাত্মিক প্রেরণা শক্তির সহায়তা একান্তই প্রয়োজন। ইহাই বেলায়ত শক্তি অর্জনের একমাত্র অমূল্য সম্পদ। এই দুর্লভ সম্বল ও শক্তি সঞ্চয়ে সমগ্র ধর্মীয় তরিকায় ও রীতিনীতির মধ্যে রেয়াজত এবং কঠোর সাধনাই একমাত্র ভিত্তি। ছুফী পরিভাষা মতে যাহাকে নেছবতে ছকিনা বা স্থায়ী খোদা সম্পর্ক নামে অভিহিত করা হয়। যাহার অভাবে নাছুতি মোকামের পার্থিব স্বভাবপ্রবণ মানব, স্রষ্টার মহান প্রভুত্ব ভুলিতে বাধ্য হয়। যাহা না হইলে খোদায়ী সৎজ্ঞান অর্জন হয় না। এই সৎজ্ঞান ও প্রেরণা শক্তির অভাবে মানব হৃদয়ে খোদার প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ ও ভীতি সঞ্চার হয় না, তাহারা প্রেম-কাতরে ভক্তি ভরে মহা প্রভুত্ব স্বীকার-খোদায়ী নীতি সনাতন ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। এই প্রেম প্রেরণা ও সৎজ্ঞানের অপ্রাচুর্য ও স্বল্পতার কারণে মানব, বিচার-বুদ্ধি হারাইয়া অতি বিলাস সভ্যতার অনুসারী হইয়া দিন দিন অহঙ্কারী, খোদ্ মোক্তারী আত্মচিন্তায় বিভোর ও অত্যাচারী হইয়া নিজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নেয়।

তাই হযরত বিশ্ববাসীকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে খোদায়ী প্রেম প্রেরণায় বেলায়তী শক্তি অর্জনে, খোদার সহিত নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে, তাঁহার একত্ব পথের মহা সম্বল, প্রেম-প্রেরণা হাল ও জজ্‌বা উন্মুক্তভাবে দান করিতেন। হযরত সকাশে যে কেহ উপস্থিত হইতেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা ফয়েজ রহমত হইতে কখনও বঞ্চিত হইত না। এমনও দেখা যাইত তাঁহার এত্তেহাদী ফয়েজ অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই কশ্‌ফ ও অন্তঃচক্ষু উন্মিলিত হইত এবং খোদার গোপন রহস্য জ্ঞান অবগত হইয়া উহা ব্যক্ত করিতে থাকিতেন। তাঁহারই বদৌলতে এই দেশবাসী হাল ও জজ্‌বাতি সম্পদে ধনী। এমনকি তাঁহারই প্রভাবে সারা ভুবনবাসী মুক্তভাবে জজ্‌বাতি প্রেম প্রেরণার অধিপতি। যাহার ফলে অল্পায়াসে ও অল্পসময়ে বহু শক্তিশালী আউলিয়াগণের উৎপত্তি ও বিকাশ। ইহা সর্ব জাতির জন্য নিরপেক্ষভাবে রক্ষিত, তাঁহারই অপূর্ব দয়া ও অতুলনীয় অবদান।

(গ) একত্ব পথের সহায়ক নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা

অতিবিলাস মুক্ত নির্বিলাস সভ্যতা হযরতের অদ্বিতীয় দান। হযরত আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে এমন কি প্রত্যেক কাজের ভিতর দিয়া নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা

দিতেন। বিলাস মানুষের মধ্যে অনর্থকতা, অপচয়, অতিব্যয় আনিয়া দেয়। বিলাস বহুল সভ্যতায় জীবিকা অর্জনে মানুষ অতিচিন্তার অত্যধিক শ্রমে আত্ম বিভোরতায় নিমগ্ন হইয়া অবিচার, জুলুম, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দলাদলী ইত্যাদিতে লিপ্ত হইয়া নিজকে ধ্বংসের কবলে ফেলিতে বাধ্য হয়। ফলে মানুষ পরিণাম-পরিণতি ও খোদাপ্রেম-প্রেরণা এবং বিচার বুদ্ধি ভুলিয়া বিপথ অনুগামী ও দুঃখে পতিত হয়। ইহার ফলে মানুষ নিজ খোদাদাদ স্বাধীনতা হারাইয়া অনেক সময় অভিশপ্ত অধঃপতিত হইয়া পড়ে। তাই হযরত মানব জাতিকে অতি বিলাসের স্বভাব মুক্ত করিয়া সর্বজুনী সম্মত নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা দিতেন। যাহা সনাতন ইসলামী সভ্যতা। ইহা মানবকে নিস্প্রয়োজনীয় অতিব্যয় ও অপচয় হইতে রক্ষা করে। যাহার ফলে মানুষ অতি চিন্তা, অতি শ্রম জনিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতে রক্ষা পায়। আত্মচিন্তায় মত্ত হইয়া লোভ জনিত অবিচার অত্যাচার রূপী কাল ভূজঙ্গ তুল্য স্বভাবের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজ জীবনকে সুকাজে সার্থক ও সফলকাম করিয়া তুলিতে পারে। নিজ মুক্তি চিন্তায় রত হইয়া খোদার প্রেম প্রেরণা ও সৎজ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। যাহার প্রতিফল স্বরূপ ছবর-ধৈর্য, অল্পে তুষ্ট, জাহুদ, তাকোয়া, সুবিচার, অন্যায় বর্জন, খোদার ভয় ভীতি ও খোদার উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি গুণ মানুষের নিকট অর্জিত হয়। ইহাতে মানব নির্বিবাদ নিভৃত স্বর্গতুল্য শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া উভয় জাহানের সঞ্চয় বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। তাই হযরত সাহেব কেবলাকে দেখা যাইত- তিনি হাওয়ায়ী অর্থাৎ অনর্থক কাজকর্মে অযথা সময় নষ্ট, মন ও প্রবৃত্তির বশবর্তী আচরণকে কোন কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। তিনি অপচয় বিরোধী ছিলেন। তাই রেশমী কাপড় ব্যবহার, মেয়ে লোকদের অলঙ্কার ব্যবহার ও নাক কান ছেদন মোটেই পছন্দ করিতেন না। যাহা ব্যবহার ও ভোগ না করিলে চলে এমন কোন সামগ্রী ব্যবহারে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইতেন। অনেক সময় তিনি মেয়েদের অলঙ্কার খোলাইয়া ফেলিতেন। অলঙ্কার ব্যবহার ও নাক কান ছেদনকে তিনি জওহর ও মনছুছী বলিয়া অভিহিত করিতেন। বর্তমান প্রচলিত বিবাহ শাদীতে অতি উৎসব ও আমোদের বশবর্তী মানবের অতিব্যয় তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই হযরতের খেদমতে কেহ শাদী শব্দে বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন। বরং তাঁহার নিকট "ইজাব-কবুল" বিবাহ বন্ধনে ছুন্নতি উপায়ে বিবাহ কার্য নির্বাহের অনুমতি পাইতেন। সাধারণভাবে সংসার যাপনে খাদেমা ও সেবিকা নিযুক্ত করিতে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "অনাবশ্যক কার্যে লিপ্ত সংসার নির্বাহ নিশ্চয় নবী বর্ণিত "দারুল হোজন" অর্থাৎ চিন্তাগার ও দুঃখ খনি এবং দুনিয়াদারী। আবশ্যকীয় সম্ভব স্বল্পব্যয়ে জীবিকা নির্বাহ নিশ্চয় দীনদারী। শান্তিময় জীবন যাপন ও নির্বিলাস সভ্যতা খোদা পন্থের সহায়ক।

(ঘ) আউলিয়া বুজুর্গানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন

এই নির্বিলাস সভ্যতাবাদী হাল জজ্বার অধিপতি অলিবুজুর্গের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, আদব তাজিম তাঁহাদের দরগাহে লোক সমাগমে তাঁহাদের অনুগ্রহকণা

হাল ও প্রেরণা অর্জনে স্ব স্ব আত্মার উন্নতি সাধনে ও ওরশ উৎসর্গ কার্যাদিতে এই দেশীয় জন সমাজ এত অগ্রগামী ও অভ্যস্ত ছিল না। এমন কি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও নানা প্রকার পশ্বাদি জবেহ দ্বারা আল্লাহ ও অলিদের প্রতি প্রেমের কোরবাণী আদায় উৎসর্গ পদ্ধতি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কৃত স্মৃতি কোরবানী ছাড়া পরিদৃষ্ট হয় নাই। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) অলি শিরমণি হযরত পীরাণে পীর দস্তগীর (রাঃ) ও খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি (রাঃ) এঁর ওরশ শরীফ পর্যন্ত বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে উদ্‌যাপিত হইত না বরং সাধারণভাবে মোরগ জবেহে ও সিন্নি পাকাইয়া তাঁহাদের ফাতেহা খানি সমাধা হইত। তাও প্রায় মানুষের ঘরে ঘরে।

হযরত আক্‌দাছের আত্ম বিকাশের পর তাঁহারই প্রভাবে, তাঁহারই পবিত্র দরবারে এবং পর পর প্রায় পৃথিবীর সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীনের মাজারে ও স্থানে নবী ও অলিদের ওরশ কার্য পশ্বাদি জবেহে বিপুল সমারোহে তাঁহাদের ভক্ত মুরিদান কর্তৃক সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপন আরম্ভ হয়। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন কোরবাণী আদায়ে তাঁহাদের পবিত্র আত্মার প্রতি খোদার অনুগ্রহ বর্ষন করিয়া তাঁহাদের প্রেমকণা ও ফয়েজ অর্জনে নিজ আত্মা ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে থাকে। তাঁহারই বদৌলতে বর্তমানে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের মাজার সমূহ অত্যুজ্জ্বল ও নানা প্রকার সম্মানীত পরিচ্ছদে সজ্জিত। আর এদেশীয় বুজুর্গানে দীনেরা ভক্তি শ্রদ্ধা উপহারে ভূষিত হইয়া আগত ভক্তদের প্রতি নিজ পবিত্র আত্মার ফয়েজ রহমত বর্ষণে রত। তাঁহার প্রভাবে এই দেশের মৃত্তিকা সজীব ও মাজার অধিপতি আউলিয়াগণ নিত্যানন্দে জজ্‌বাতী কার্যে মগ্ন হইয়া দেশ ও দেশবাসীর প্রতি শুভ আশীর্বাদে উহাদের হারানো উন্নতি ও সফলতা ফিরাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রেম প্রেরণায় খোদার প্রতি অনুরাগী ও বিভোর চিত্ত প্রেমে মত্ত, হুজুরী কলবে ও হাল জজ্‌বার বন্দেগীরত করাইয়া তাঁহার একত্ব পথে আগাইয়া দিতেছেন। এই দিকে দেশবাসী ভক্তগণ চির অমর আউলিয়াদের প্রত্যক্ষ-কেরামত ও অনুগ্রহ দর্শনে তাঁহাদের প্রতি ভক্ত ও অনুসারী হইয়া খোদায়ী করুণাবারী অর্জনে দীনদুনিয়া উভয় জাহানের সফলতা লাভ করিতেছেন। এবং দিন দিন দ্রুতগতিতে খোদার একত্বের পথে অনুধাবিত হইতেছেন। এক কথায় হযরতের প্রভাবেই এই দেশীয় মাজারস্থ আউলিয়া, দেশ ও দেশবাসী পুনঃ নবজীবন লাভ করিয়াছে এবং দেশবাসীগণ অলিউল্লাহদের অনুসরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এক দিকে প্রকাশ্য ফয়েজ বর্ষণে অসংখ্য আউলিয়া নিযুক্ত করিয়া মানবকে খোদা পন্থে আহবান করিতেছেন। অপর দিকে সমাধিস্থ আউলিয়াদের প্রতি ফয়েজ দানে সজাগ করিয়া মানুষকে দলে দলে তাঁহাদের অনুসরণে খোদার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছেন।

(ঙ) হযরতের শানে-মওলানা জুলফিকার আলী সাহেবের নাতিয়া

হযরতের এই বেলায়তী প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া চট্টগ্রাম মোহছেনীয়া মাদ্রাসার সুপারেন্টেন্ডেন্ট মরহুম মওলানা জুলফিকার আলী সাহেব (চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজের

প্রিন্সিপাল শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমদ আই, ই, এস, সাহেবের পিতা) তাঁহার শানে নিম্নলিখিত নাতিয়া লিখিয়া তাঁহার প্রেম ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথাঃ-

از دم فیض غوث میبھنڈار ،، شرقیان سالک اندو صاحب حال
تربتش راز ہے اثر کہ فزود ،، در مزارات رونق و اجلال ،،
احمد اللہ شاہ سردار ، ولیش ،، غوث اعظم صفت شد ش جو ۔ وصال

অর্থ ঃ- গাউছে মাইজভাণ্ডারীর নিঃশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশীয় লোকেরা খোদা পন্থী, হাল ও জজ্‌বার অধিকারী হইয়াছে। তিনি কবরস্থ হওয়ার ফলে বিভিন্ন কবরে উজ্জ্বলতা ও জালালী দেখা দিয়াছে। আহমদ উল্লাহ যিনি, তিনি সমস্ত অলিদের সর্দার, যাহার "ছিফত" উপাধি গাউছুল আজম ইত্যাদি....

(চ) অশ্লীলতা মুক্ত-ভাব জনিত গীতি জগত

বাংলা-গীতি জগত হযরতের পূর্বে খোদায়ী রস শুন্য ও নানা প্রকার অশ্লীলতার রসে পরিপূর্ণ ছিল। বাংলার প্রায় সর্বস্থানেই অশ্লীলতা প্রেমের পাপজনিত রঙ্গ রহস্য পূর্ণ গান বাজনার প্রচলন ছিল। কামরিপু প্রবণ নাছুতী স্তরের মানব, স্বভাবতঃ কৃত্রিম প্রেমের বশবর্তী হইয়া নাট্য গান, গাজো গানে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে আমোদ প্রমোদ বিশিষ্ট বৈঠক গান, নাট্যা পোলার নাচগান, যাত্রা পালা গান, থিয়েটার ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ফলে উহার প্রচলন ও কুফল এমন চরমে পৌছিয়াছিল যে, গভর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষের প্রবল আইনগত বাধা সত্বেও উহা নিবারণ ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) প্রভাবে এবং তাঁহার শুভদৃষ্টি ও ফয়েজ রহমত বরিষণের ফলে বাংলায় অশ্লীল কৃত্রিম প্রেমের গীতি জগত সম্পূর্ণ উহার বিপরীত রূপ ও গতি ধারণ করিল। হযরত এদেশীয় জনগণের "মাজাক" রুচি অনুযায়ী তাহাদের প্রিয় গান বাদ্যের ভিতর দিয়া এমন অকৃত্রিম খোদা প্রেম, রহস্যরাজীর প্রস্রবণ বসাইয়া দিলেন, এমন খোদা প্রেমিক সঙ্গীত বিশারদ গায়ক, গান, গজল নাতীয়া রছমের পত্তন করিলেন, যাহার ফলে বাংলা গীতি জগত আল্লাহ রাছুল ও আউলিয়ার প্রেমের লহরী তুলিয়া প্রেম রসে খোদা স্মরণে মত্ত হইতে বাধ্য হইল। ভক্ত প্রবর সুর সঙ্গীত বিশারদ আলাউদ্দিন, সঙ্গীত বিশারদ আফতাব উদ্দিন, রায়হান, ইশান, মনোমোহন, বিজয় দাস, রায় ভবন, শিষ্য প্রবর মওলানা আবদুল হাদী, আবদুল জব্বার, আবদুল্লাহ, মওলানা বজলুল করিম, মওলানা সৈয়দ মোছাহেবউদ্দিন, মওলানা আমিনুল হক হারভাঙ্গীরী, কবি আবদুল হাকিম, কবি রমেশ বাবু ইত্যাদির প্রেম তরঙ্গ প্লাবিত গান গজল নাতীয়ার পুস্তকাদি হযরতের প্রভাবিত অবদানের অকাট্য নজির। হযরত বাংলার

গান বাজনাকে নির্দোষভাবে রূপায়িত করিয়া খোদার প্রেম প্রেরণা জাগরণের রুচিপূর্ণ কৌশল ও যুগোপযোগী জিকিরী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে সম্মতি দানে উহার গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন। তরিকত পন্থী খোদা প্রেমিক জন মাহফিলে পবিত্র গান গজল নাতীয়া বাদ্যসহ ব্যবহারে প্রেম জাগরিত বিভোর চিত্ত জজ্‌বাহালে হালকা জিকির ও অজ্‌দ পদ্ধতি একমাত্র গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত সাহেব কেবলারই অবদান।

এমনিভাবে হযরত রিপু জনিত স্বভাব ও আচরণ, মানবতা বিরোধী বিশ্বে প্রচলিত রীতিনীতির ধ্বংসকারী, খোদা-দাদ পদ্ধতির পরিপন্থি- এই সকল উৎসের প্রতিরোধী বিপরীত জ্ঞান এবং একত্ব ও উন্নত পথের সহায়ক বহু অবদান বিশ্ববাসীর সম্মুখে আয়না সাদৃশ্য বিদ্যমান রাখিয়াছেন। যাহা অনাদী অনন্তকাল পর্যন্ত মানব জগতে আদর্শ হিসাবে সুরক্ষিত ও কার্যকর থাকিবে। যাহার সুফল আহরণে মানব খোদার নৈকট্য ও চির শান্তি ভোগে আবহমানকাল খোদার কৃতজ্ঞতা ও যশগীতি গাহিতে থাকিবে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের ওফাত এবং আল্লাহতালার মহাজাতে মিলন

হযরত অনাবিল করুণাবারি বর্ষনের পর খোদাতা'লার তৌহিদ তোরণ চির উন্মুক্ত করিয়া সুদীর্ঘ ৭৯ (উনাশি) বৎসর কাল ভবে তাঁহার আধ্যাত্মিকলীলা সমাপনে, সকল জাতীয় ও সর্বধর্মীর মুক্তির তরণী, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অপূর্ব অদ্বিতীয় দোজাহানীর বন্ধু, বিশ্ব দরদী মানব কল্যাণে জগদ্বাসীর অতুলনীয় আশার প্রদীপ, মাহবুবে নাজনীন, উভয় জগতের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ, ভক্তদের শান্তি, পাপী তাপী দুঃখী দুস্থের একমাত্র ভরসা সহায় সম্বল ও আশ্রয়স্থল, নবীদের নয়নমণি, গুপ্ত খোদা রহস্যের ব্যক্ত খনি, সমস্ত গাউছ কুতুবদের অত্যুজ্জ্বল রবি, পীর আউলিয়াদের অগ্রনায়ক শাহান শাহ্-স্বাধীন বেলায়তের ঝাণ্ডাবর্দ্দার নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন বাধাহীন বেলায়তের মোহরধারী, গাউছুল আজম ও কুতুবুল আক্তাব অলিকুল শিরোমণি হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মহান পবিত্র নবীর সর্ব ছেফাতের আদর্শ ও অধিকারী হইয়া শেষকালে বিশ্ববাসীর নয়নাগোচরে মহান প্রভুর মহাজাতে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলেন। একদা ইংরেজী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, হিজরী ১৩২৩ সনে বাংলা ১৩১৩ সালে ১২৬৮ মঘীর ১০ই মাঘ মোতাবেক ২৭শে জিলকদ্ সোমবার দিবাগত এক পবিত্র শুভ নিভৃত মুহূর্তে নিঝুম রাত্রে একটার সময় পরম প্রিয়তম একমাত্র মাহবুব মহান আল্লাহ্‌র শুভ মিলনে বিশ্ববাসীকে ছাড়িয়া এই ধরাধাম ত্যাগে পবিত্র অমর ধামে শুভ যাত্রা করেন। ইন্নালিল্লাহে.......। তাঁহার পবিত্র মহান আত্মার উপর অবিরাম আল্লাহতা'লার অসীম শান্তি করুণাবারী বর্ষিত হউক।

বিধির কি বিচিত্র লীলা। পরিবর্তনশীল জগতের কি আমুল রদবদল। প্রকৃতির কেমন নিষ্ঠুর লীলা। কখনও জগদ্বাসীকে আনন্দ তরঙ্গে ভাসাইয়া দিগ্বিদিক উল্লাসিত ঢেউ তুলিয়া দেয়। আবার কখনও মুহূর্ত কালের মধ্যে সারা বিশ্বভুবনে শোক উচ্ছ্বাসিত বহ্নি বহাইয়া দেয়। আজ কারো মুখে হাসি নাই। আনন্দের লেশ নাই। আছে শুধু আর্তনাদ, আছে মাত্র করুণ কান্নার কুহরী রোল। আকাশ শোকাতুর হইয়া যেন নীচে নামিয়া আসিল। বাতাস যেন গতি রুদ্ধ হইয়া বন্ধ রহিল। জলধি যেন অচল হইয়া, কাতর হইয়া তাহার হু-হু রব হারাইয়া বসিল। স্থল জগত নিরাশায় নিস্তেজ হইয়া উর্বরা শক্তিহীন হইয়া গেল। শীত ঋতু বিরহ হুতাশনে তাহার বিষাদ মাখা শিশির বিন্দু বরিষণে সমগ্র জগত ভিজাইয়া দিল। বৃক্ষলতা দুঃখে হতাশ হইয়া তাহাদের পত্র-অশ্রু নিক্ষেপে ভূ-বক্ষ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলের পরিধানে শোকের পরিচ্ছদ। চোখে মুখে অপূর্ব বিষাদময় হতাশার লক্ষণ। প্রকৃতির সুশোভিত সুন্দর সজীব চেহারা যেন একেবারেই বিগড়িয়া এক বিস্ময়কর বিকট বিবর্ণ আকার ধারণ করিল। দিকদিগাঞ্চলে দুঃখের ধ্বনি যেন সারা বিশ্ব প্রকম্পিত করিয়া

তুলিল। যেন এক অদ্ভুত মাতম ধরণীতে সমগ্র ভুবন আলোড়িত করিয়া দিল। হায়রে দুর্ভাগ্য! হায়রে ললাট। একি তোমার বিধির বিধান! একি তোমার অখণ্ডনীয় লিখন! আমাদের আশার-রবি, প্রাণ-নিধি, নয়ন-মণি আজ বুঝি এই বিশ্ব ভুবন অন্ধকার করিয়া আমাদিগকে অসহায় করিয়া চলিয়া গেলেন। হে হৃদয় সখা গাউছ ধন। হে অফুরন্ত করুণা খনি! সর্বজাতি দুর্গতের আশ্রয় ভাণ্ডারী! আজ বুঝি তুমি নারাজ হইয়া চলিয়া যাইতেছ? অতি অল্প সময়ে এই বিষাদ মাখা দুঃখ-সংবাদ দেশ দেশান্তরে অলিতে গলিতে নগরে কাননে হাটে ঘাটে পবন প্রবাহের মত বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। ঘুমে চেতনে, শেষ রাত্রে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া যাইতেছে, ভাণ্ডরী আর ভবে নাই। কেহবা স্বপ্ন যোগে দৈব বাণীতে শুনিতে পাইতে লাগিল, আমাদের আশা রবি আজ অস্তমিত। ভোর হইল। চারিদিকে কান্না-কাটি বলাবলি শোক ধ্বনির যেন তুফান উঠিয়া গেল। সমস্ত দেশ দেশান্তরের ভক্ত-আসক্ত অনুরক্তবৃন্দ শোক-উচ্ছ্বাসে মাতাল বেশে পতঙ্গ সম দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কত আশেকবৃন্দ শোকে কাতরে বেহুস মৃত প্রায় শায়িত রহিল, কত শত শত ভক্তকুল মণিধর সর্পের মত হারানো মণি শোকে প্রাণ হারাইতে উদ্যত হইল। জন সমুদ্রে বিষাদ তরঙ্গ মালা তরঙ্গায়িত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই বিশাল শোকোদ্বেলিত অনিয়ন্ত্রিত জনসমুদ্র জমায়েতে মুরিদ ভক্ত কামেল বুজুর্গানের বিপুল সমাবেশে পরদিন মঙ্গলবার দিবা শেষে আছর-পাঁচটার পরে হযরত আক্‌দাছের বেহাই পীর ভাই ও ভক্ত শ্রেষ্ঠ মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ মছিহুল্লাহ মির্জাপুরী (রঃ) সাহেবের এমামতিতে জানাজার নামাজ কার্য্য সমাপন হয়। মগরেবের নামাজের পূর্বে তাঁহার পবিত্র দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হয়।

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমার মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।
কোলাহল পরিহারে, নির্জনতার আসরে,
তোমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে আজি তোমারই বাসরে।

-শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন রচিত।

হযরতের ওয়ারেছ

হযরত আক্‌দাছের ওফাত কালে তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না। তিনি তাঁহার একমাত্র স্ত্রী সৈয়দা লুৎফুন্নেসা সাহেবা, কন্যা সৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা সাহেবা, মরহুম একমাত্র পুত্র মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক ফানী ফিল্লাহ (কঃ) সাহেবের ঔরসজাত শাহ ছুফী সৈয়দ মীর হাছান ও মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবান পৌত্রদ্বয় ও পৌত্রী সৈয়দা ছবুরুন্নেছা বিবি সাহেবাকে একমাত্র উত্তরাধিকারী ওয়ারেছ হিসাবে এই ভবে রাখিয়া যান। এবং বিল অলায়েত আধ্যাত্মিক ওয়ারেছ হিসাবে অসংখ্য কামেল অলিআল্লাহগণকে তাঁহার খলিফা বা উত্তরাধিকারী বিদ্যমান রাখিয়া এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া অমর জগতে প্রস্থান করেন। তাঁহার ওফাতের ৪৩ দিনের মধ্যে তাঁহার বড় পৌত্র শাহ্ ছুফী সৈয়দ মীর হাছান সাহেব তাঁহার চিরসঙ্গী ও স্বর্গবাসী হইয়া চলিয়া যান।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সমাধিস্থ অবস্থায় হযরতের অলৌকিক কেরামত ও ফয়েজ রহমত দান

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ভববাসীকে ছাড়িয়া তাঁহার নূরানী স্বদেশের নির্জন নিভৃত কুটিরে আত্মগোপন করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার রূহানী আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রেম-প্রীতি ও আকর্ষণে, পূর্বের সম রহমত বরিষণে সর্বগুণে অপরিবর্তিত ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সশরীরে তাঁহার দৈহিক দরশন, তাঁহার পবিত্র নয়নে দো-নয়ন মিলন, পবিত্র কোমল দেহের সাহচর্যতা ও সুবাস অর্জনই শুধু বহুদূরে দুর্লভ আবরণে পড়িয়া রহিয়াছে। তাও কেবলমাত্র সাধারণ পার্থিব স্বাভাবিক মানবের জন্য। তাঁহার ভক্ত ও আশেকবৃন্দ সর্বদা তাঁহার সম্মুখে। তাহারা কেহ বা ধ্যানের ঘোরে কেহ বা মোরাকেবার আসরে আবার কেহ প্রত্যক্ষ সশরীরে সর্বত্র অবিরাম অবলোকন করিয়া যথাযথ তাঁহার অনুগ্রহ হাসিল করিতেছেন, কেহ তাঁহাদের স্তর ভেদে নানা প্রকার স্বপ্ন ও এল্‌কা যোগে তন্দ্রায় ঘুমের ঘোরে অচেতনে তাঁহার দর্শন হেরি সময়োপযোগী আদেশ নির্দেশ অর্জনে আহলাদে নিরাপদে জীবন যাপন করিতেছেন।

ওফাতের পরে হযরতের প্রত্যক্ষ দর্শন দান

চট্টগ্রামস্থ জাহাপুর নিবাসী মুফতী বাড়ীর মওলানা এজাহার বিল্লাহ সাহেবের পিতা মওলানা অদিয়ত উল্লাহ সাহেব হযরতকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত ওফাত গ্রহণের পর একদিন আমি অতি আবেগের সহিত "হযরতকে আর ইহজগতে দেখিতে পাইবনা" এই চিন্তা করিয়া অতি প্রত্যুষে অজু করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের মসজিদ পুকুরের ঘাটে গেলাম! এমতাবস্থায় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটি আমগাছ তলায় হযরত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার নয়ন-দৃষ্টি হযরতের প্রতি পড়িলে আমি অবাকচিত্তে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম একি ব্যাপার। হযরত তো আমাদিগকে ছাড়িয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন একি দেখিতেছি। কোথায় হইতে আবার তিনি আসিলেন? এ তো নিতান্তই অদ্ভুত কান্ড। অসম্ভব দৃশ্য! না জানি আমার নাকি দৃষ্টি ভুল হইতেছে, আমি বার বার

ভাল করিয়া দেখিলাম। আমার সন্দেহ স্বপ্ন একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। হযরত ধীরে ধীরে আমাকে নির্দেশ দিলেন। "মিঞা, এক লোটা অজুর পানি দাও তো।" আমি অতি আনন্দে পানির জন্য পুকুরে অবতরণ করিলাম। এক লোটা পানি লইয়া উপরে উঠিতেই দেখি, হযরত সেখানে আর নাই। তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এদিক ওদিক আগাইয়া অনেক দেখিলাম। কিন্তু হযরতের দেখা পাইলাম না।এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ আমি হারাইয়া বসিলাম, অথচ কোন আলাপও করিলাম না। আমি অতি হতাশ, দুঃখিত ও ভীত কম্পিত অবস্থায় ঘরে ফিরিলাম। আমার বিশ্বাসের কপাট সুদৃঢ় হইল যে, অলিআল্লাহ্‌গণ সশরীরে চির অমর ও বিরাজমান। তাঁহারা যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারেন।

ভক্তিপূর্ণ আবেগের প্রতি উত্তরে হরিণ দানে ভক্তবৎসলতার নিদর্শন

নানুপুর নিবাসী শ্রী মহেশ চন্দ্র বড়ুয়া একদিন সজল নয়নে বর্ণনা করেন- হযরতের দয়া অসীম। তিনি চিরকালই আমাদের প্রতি দয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। তাঁহার দয়া বর্ণনা করিতে পারিব এমন ভাষা শক্তি কি আমাদের আছে? আমাদের প্রতি যে তাঁহার অপরিসীম দয়া অবিকৃতভাবে রহিয়াছে তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টান্ত বলিতে গেলে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে।

একদিন, ফাল্গুন মাস। বেলা প্রায় চারি পাঁচটার সময় আমি, আমার খুড়া ফেঁজারাম, দাদা রাম গতি বাবু, দেবী চরণ মাঝি, আরও কয়েকজন লোক সহ আমাদের মধ্যম বড়ুয়া পাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখস্থ বড় পুকুরের পাড়ে বসিয়া বিশ্রাম ও আলাপ আলোচনা করিতেছি। পুকুরের পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণ মুখী একটি রাস্তা আছে, দেখিতে পাইলাম সে রাস্তা দিয়া কয়েকজন লোক একটি বড় বলিষ্ট হরিণ লইয়া মাইজভাণ্ডারের দিকে আসিতেছে। তাহারা আমাদের নিকটবর্তী হইলে তাহাদের মধ্যে একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ আর কত দূর আছে? এই রাস্তায় সঠিক যাওয়া যাইবে কি? আমি উত্তর করিলাম আর বেশী দূরে নয়, ঐ যে একটি খাল ও একটি ইটার আবা দেখা যায় সেখানেই দরবার শরীফ, এই রাস্তায় সোজা চলিয়া যান। তাহারা হরিণ নিয়া রওয়ানা হইল।

আমাদের মধ্যে ফেঁজারাম বাবু অত্যন্ত আবেগের সহিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "হায়রে বাবাজান মওলানা সাহেব। আপনি দিন দিন কত নিত্য নতুন ভাল ভাল দ্রব্যাদি, পশ্বাদি আপনার ছেলে ও ভক্তদিগকে খাওয়াইতেছেন, আমরা কি আপনার ছেলে নই! কিছুই কি আমরা পাইতে পারিনা? আমাদিগকে কি কোন কিছু খাওয়াইবেন না।" আমরা অন্যান্য গল্প গুজব করিতেছি। সেও আমাদের কাছে বসা আছে। এদিকে হরিণ লইয়া তাহারা বিনাজুরি খাল পার হইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হরিণ খালে অবতরণ করিতে চায়না। তাহারা সজোরে হরিণকে খালে নামাইয়া দিল, কি আশ্চর্য

কান্ড! হরিণটিকে আর উঠাইতে পারিল না। অথচ খালে এমন কোন কাদা ছিল না যাতে হরিণ উঠিতে না পারে। হরিণটি স্বেচ্ছায় প্রাণ দিল। হরিণ বাহকেরা অত্যন্ত মর্মাহত ও অবাক হইয়া গেল। হযরতের হরিণ কি করিয়া বিনা কারণে মারা যায়। তাহারা কি করিবে বিচলিত হইয়া পড়িল। অবশেষে স্থির করিল, এমত মোটা-তাজা হরিণ ফেলিয়া গেলে ভাল হইবেনা। হযরতের হরিণ হযরতের নামে মৃত ভক্ষণ কারীকে দিলে ভাল হইবে। তাহারা উপরে উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। হঠাৎ আমাদিগকে যথাস্থানে বসা দেখিয়া দুইজন লোক আমাদের প্রতি দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল। তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত মনে বলিল, "আমরা তো হরিণ নিতে পারিলাম না। হরিণটি স্বেচ্ছায় যেন প্রাণ দিয়া দিল। আপনারা কি মৃত হরিণ খান?" হরিণটি কোথা হইতে আনা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল, হাড়ভাঙ্গ নিবাসী এবাদুল্লাহ ফকির হরিণটি মাইজভাণ্ডারী হযরতের ফাতেহার জন্য পাঠাইয়াছিল।

এই সংবাদ কর্ণগোচর হইতেই আমাদের দাদা দেবী চরণ মাঝি বলিয়া উঠিল ফেঁজারাম তুই সর্বনাশ করিয়াছিস। তিনি যে অন্তর্যামী চৈতন্য, দয়ার্দ্র ও অমর। কেন তুই উহা বলিয়াছিলি? তোর কাছে কান্ডজ্ঞান নাই? সে তাহাকে নানারূপ অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করিল। দাদা ফেঁজারাম অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। সে উত্তর দিকে দরবার মুখী সেজদায় পড়িয়া বলিতে লাগিল, বাবা আমাকে ক্ষমা করুন! আমি আর কোন দিন এমন কথা বলিব না। আমি আপনার ওরশে এক বান্ডিল মোমবাতি মানস করিতেছি। নিশ্চয় উহা আদায় করিব। আমার বেয়াদবি ক্ষমা করুন। এই বলিয়া সেজদায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অতঃপর আমরা সকলে খালের পাড়ে আসিয়া দেখিলাম মৃত হরিণটি পরিষ্কার জায়গায় শায়িত রহিয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া উপরে উঠাইয়া আনিলাম। পরে ভাগ করিয়া পাড়া প্রতিবেশী সমস্ত বড়ুয়াকে কিছু কিছু দিয়া বাকী আমাদের প্রত্যেকের ঘরে নিলাম। হযরত বর্তমানেও আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সর্বদা সহৃদয় উদার ও মুক্তহস্ত রহিয়াছেন।

মহাসাগর গর্ভে হযরতের প্রভাবে জাহাজ ডুবিতে আরোহী উদ্ধার

চট্টগ্রাম পাঠানটুলির মুহাম্মদ ইয়াছিন সওদাগরের পুত্র মুহাম্মদ সিরাজ মিঞা সারেং সাহেব বলিয়াছেন, তিনি গত মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪২-৪৩ ইংরেজীতে) বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধিনে "রয়েল নেভীতে" জাহাজের সারেং হিসাবে চাকুরী করিতেন। একদা জাহাজ লইয়া মহাসমুদ্রে বিচরণ করা কালে জার্মান "টর্পেডোর" আঘাতে তাহাদের জাহাজ ধ্বংস হইয়া যায়। জাহাজের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়াছিল, বন্দিভাবে তাহাদিগকে জার্মানীতে নেওয়া হয়। সেখানে প্রায় ২ বৎসর কারা জীবন যাপন করার পর তাহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাড়ীতে তাহার মা, মাইজভাণ্ডার শরীফের

হযরত সাহেব কেবলার ভক্ত ছিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার মাতার নিকট শুনিতে পাইলেন যে, তিনি যেই সময় জাহাজে বিপদে পতিত হইয়াছিলেন ঠিক তখন তাহার মা, এক রাত্রে হযরত কেবলা কা'বাকে স্বপ্নে দর্শন করেন। হযরত তাহার মাতা সাহেবানীকে অভয় দিয়া বলিতেছেন "তুমি তোমার ছেলের জন্য ব্যস্ত হইওনা, আমি তাহাকে আমার বগলের মধ্যে রাখিয়াছি।" তিনি বাড়ী আসার পরদিন তাহার মাতা তাহাকে একটি খাসী ছাগল লইয়া দরবার শরীফ পাঠাইয়া দেন। ইহার পর হইতে তিনিও দরবার শরীফের একজন ভক্ত হইয়া পড়েন।

হযরতের প্রভাবে মৃগীরোগ আরোগ্য

নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত বেগমগঞ্জ থানার আমিরাবাদ নিবাসী সাব রেজিষ্ট্রার মওলানা মুজিব আহমদের পুত্র জনাব মওলানা মুহাম্মদ মখলেছুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে হযরত গাউছুল আজম বাবাজান কেবলার গদীনশীন সময়ে আমার চতুর্থ সহোদর ভ্রাতা মখছুদুর রহমান মৃগী রোগে ভুগিতেছিল। একদিন সে গোসল করিবার সময় মৃগী রোগে আক্রান্ত হইয়া পুকুর জলে পড়িয়া যায়। সকলে খবর পাইয়া অতিকষ্টে তাহাকে পানি হইতে তুলিয়া আনে। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট লোক আমার পিতা সাহেবকে বলিলেন, "জনাব। ইতিপূর্বে আমারও এইরূপ মৃগীরোগ ছিল। যেখানে সেখানে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতাম। চিকিৎসায় হতাশ হইয়া আমি চাঁটগায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত সাহেব কেবলার দরবারে জেয়ারত করিতে যাইয়া রোগমুক্তি প্রার্থনা জানাই। সেখানে দুই তিন দিন থাকিবার পর বাড়ীতে চলিয়া আসি। খোদার কৃপায়, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর অনুগ্রহে আজ কয়েক বৎসর গত হয় আর কোন দিন আমার মৃগী রোগ দেখা যায় নাই। আমার বিশ্বাস হয় আপনিও আপনার ছেলেকে নিয়া তাঁহার দরবারে জেয়ারত করাইলে তাঁহার দয়ায় নিশ্চয়ই ভাল হইয়া যাইবে।"

এই সংবাদে আমার পিতা সাহেব তখনই নিয়ত করিয়া বলিলেন, "আমি তাহাকে নিয়া নিশ্চয় দরবারে যাইব।" কিছুদিন পর আমার পিতা আমার ভ্রাতাকে লইয়া দরবার শরীফ জেয়ারতে আসিলেন। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) মেহেরবানীতে আমার ভ্রাতা সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যবান হয়। সেই অবধি কোন দিন তাহার মৃগী রোগ দেখা যায় নাই। সে বর্তমানে কন্ট্রাকটারী ব্যবসা করে।

হযরতের ওরশ শরীফে উট বুকিং-এ আশ্চর্য কেরামত

কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত তুলাতলী নিবাসী শেখ আবদুল গফুর সাহেব হযরতের দরবারে একটি উট মানতি করিয়াছিলেন। হযরতের ৪৯ (উনপঞ্চাশ)তম ওরশ শরীফে

উক্ত উটটি আনাইবার জন্য তিনি দরবার শরীফ হযরতের সাজ্জাদানশীন এক মাত্র নাতী হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি অনেক মিনতি করিয়া তাঁহাকে উটটি আনাইয়া দিতে রাজী করেন এবং উটের খরচ বাবদ প্রায় হাজার টাকা তাঁহার হাতে অর্পন করেন। অগত্যা তিনি তাঁহার সরকারী দরবার শরীফ ষ্টোরের ক্যাশিয়ার মাষ্টার খায়রুল বশর সাহেবকে উটের জন্য করাচী পাঠাইয়া দেন। উক্ত ক্যাশিয়ার সাহেব করাচীতে উট খরিদ করিয়া ভীষণ বিপদে পড়েন। কারণ কোন জাহাজ কোম্পানী উট বুকিং করিতে রাজী হয় না। এদিকে ওরশের সময়ও আগত প্রায়। তিনি জানিতে পারিলেন, ইউনাইটেড ওরিয়েন্টাল কোম্পানীর "আনোয়ার বক্স" নামক একটি নতুন জাহাজ সবেমাত্র প্রথমবার মাল বোঝাই করিয়া চট্টগ্রাম বন্দরে রওয়ানা করিবেন। ইহাতে তিনি কোম্পানীর অফিসে গেলেন। তাহারাও উট বহন করিতে কিছুতে রাজী হইল না। অবশেষে অনেক অনুরোধ করার পর কোম্পানী স্বয়ং রাজী হইলেন। কিন্তু কথা রহিল, যদি জাহাজের কাপ্তান রাজী থাকেন। পরদিন সকালে তিনি জাহাজের কাপ্তানের নিকট গেলেন। সেই জাহাজের কাপ্তান একজন ইংরেজ ভদ্রলোক। তিনি তাহাকে উট সম্বন্ধীয় কথা বলিতেই তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান। কারণ কাপ্তান সাহেব বলিলেন যে, তিনি গত রাত্রে যখন ঘুমাইতেছিলেন তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে জাহাজের উপর একটি উট বাঁধা আছে। তিনি উট সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন, উট কি জন্য, কাহার জন্যে এবং কোথায় যাইবে তাহা সবিস্তারে তাহার নিকট ব্যক্ত করা হয়। তিনি ভক্তিগদ্গদ্ চিত্তে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। পরে উট যখন জাহাজে নিয়া নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধিয়া রাখা হয়, কাপ্তান সাহেব দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঠিক এই উটটিই তিনি এই জায়গাতেই, এইভাবে বন্ধন অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। কাপ্তান সাহেবের নির্দেশে জাহাজের সমস্ত কর্মচারী এবং তিনি নিজে প্রত্যহ উট এবং উটের সঙ্গীর তদারক করিতেন। যাহাতে থাকা, খাওয়া কিংবা অন্য কোন প্রকারের অসুবিধায় পড়িতে না হয়। তাহারা অতি যত্নের সহিত উটটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাইয়া দেয়।

হযরত কর্তৃক স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হইতে নিরাপদে রাখার আভাস ও অভয়দান

চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী জনৈক রেঙ্গুন পোষ্ট অফিসের কেরাণী বক্তপুর নিবাসী মওলানা মুফতী ফয়েজুল্লাহ সাহেবের বন্ধু তাহার সম্মুখে বর্ণনা দেন যে, ১৯৪১ ইংরেজী ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে জাপানী বোমা বর্ষণের পর আমরা বার্মা কামকাউটে চলিয়া যাই। আমাদের মনে নিতান্ত ভয়, কখন কি হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষে এক সন্ধ্যায় হযরতের কাছে আরজ করিয়া শুইয়াছি, তন্দ্রাযোগে দেখিতে পাই, একটি "জানাজা আসিতেছে। আর লোকেরা বলাবলি করিতেছে, হযরত ওমর (রাঃ) এঁর জানাজা

আসিতেছে। দেখিতেছি জানাজাটি আনিয়া আমাদের ঘরের সামনেই রাখা হইয়াছে।” আমি কাফন খুলিয়া দেখিলাম, পীর হযরত সৈয়দ আহমদ পেশোয়ারী সাহেবই রয়েছেন কাফন পড়া জানাজায়। তাঁহার মুর্দাটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আবিহ্ যো চাটগ্রাম মে বোম্বারী হোয়া হ্যায়, উহ রওজা শরীফ ছে কেত্না দূর হ্যায়।” যেন তিনি ইঙ্গিত দিয়া মাইজভাণ্ডার হযরতের রওজা শরীফের কথা বলিলেন বলিয়া বুঝা গেল। আমি কত মাইল বলিলাম, এখন তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। ইহাতে আভাস পাওয়া গেল চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণ হইলেও হযরতের রওজা শরীফের তোফাইলে চট্টগ্রাম শহরের কোন ক্ষতি করিতে পারিবেনা। চট্টগ্রাম কোর্টের Public Procicuter জনাব বদরুল হক খান সাহেব বর্ণনা করেন যে, ১৯৪২ ইংরেজী ২৩শে ডিসেম্বর হঠাৎ চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের ফলে শহর হইতে লোকজন প্রায় চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি করি? উপায় নাই। সরকারী কোর্টের কাজ ছাড়িয়া কোনদিকে যাইতে পারিতেছি না। শহরে থাকিতে বাধ্য। সর্বদা হযরতের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইতেছি। এক সন্ধ্যায় হযরতের কাছে মিনতি করিয়া শুইয়াছি, তন্দ্রায় দেখিতে পাইলাম, হযরত কোর্ট পেন্ট পরিয়া ইউরোপিয়ানের পোষাকে আমার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিতেছেন, “মিঞা!” খওফ নেহী হ্যায়। দোষমন কো সমন্দর কে তরফ ভাগা দিয়া, কুছ খওফ নেহী হ্যায়।”

তখন থেকে আমি আশ্বস্ত হইয়া সাহস পাইলাম যে, হযরতের সুনজরে খোদা আমাকে বিপদমুক্ত রাখিবেন। আরও বুঝিলাম যে, এই যুদ্ধে হযরত ইউরোপীয়ানকে সাহায্য করিতেছেন। নইলে তাহাদের পোষাকে হযরতকে দেখিতাম না! নিশ্চয় ইংরেজ যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। এই আশাতে নির্ভয়ে শহরে রহিয়া গেলাম। ইংরেজ যুদ্ধে জয়লাভ করিল। আমি সম্পূর্ণ নিরাপদে রহিলাম।

হযরতের কালাম ও “কবা” মারফত প্রভাব বিস্তারে বিস্ময়কর কেরামত

হযরত আক্‌দাছ (কঃ) এঁর পৌত্র মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা শাহজাদী মুনিরা খাতুন এক সময় ভীষণভাবে অতিশার জনিত টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। অনেক চিকিৎসায় ও বিফলে সকলের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। তাঁহার পিতা মাতা জীবনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এমন সময় এক রাতে মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব, কন্যার এই দুরারোগ্য অসুখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তিনি সাধারণ তন্দ্রায় দেখিতে পাইলেন, হযরত কেবলা সাহেব তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন আমার কবা জুব্বাটি তাঁহার বদনে ঢাকিয়া দাও, ভাল হইয়া যাইবে।” ইহা দর্শনে হঠাৎ তিনি জাগিয়া বসিলেন এবং রওজা শরীফ আসিয়া তাঁহার পবিত্র কবাখানা তালাশ করিয়া নিলেন। উহা তাঁহার পায়ের উপর চাপাইয়া দিলেন। প্রায় অর্ধ ঘন্টা পর দেখিতে পাইলেন তাঁহার শরীরের

ভীষণ উত্তাপ, ঘর্ম দিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। আর তাঁহার কন্যা সাহেবা প্রায় শান্তভাবে কাতর অবস্থায় ঘুমাইতেছেন। ইহা দেখিয়া সকলের মনে আনন্দ আসিল। তারপরদিন হইতে দেখা গেল তিনি আরোগ্যের পথে। তিনি কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা

তাঁহার বড় সন্তান শাহ্ সৈয়দ মওলানা জিয়াউল হক সাহেব বর্তমান যিনি আধ্যাত্মিক প্রেরণায় বিভোর আছেন, বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময় তিনি হযরত বাবা জান কেবলা কাবার আধ্যাত্মিক সুনজরে পড়েন। প্রেরণাধিক্যে ক্রমান্বয়ে তিনি আহার নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ পান। কিছু দিনের মধ্যে যেন তিনি উম্মাদের মত হইয়া গেলেন। উহা তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ মনে করিয়া-অনেক প্রকার চিকিৎসা করা হইল। কোন প্রকার পরিবর্তন না দেখিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তাঁহার প্রেরণা আরও বাড়িতে লাগিল। একদিন এমতাবস্থা হইয়া গেল যে, তাঁহার মাথার উপর অনেক পানি ঢালার পরও শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিল না। ইহাতে তাঁহার পিতা সাহেব বিশেষভাবে চিন্তাশীল হইয়া পড়িলেন। বড় সন্তানের এরূপ অবস্থা অথচ কোন ঔষধ খুঁজে পাইতেছেন না। এক রাতে তিনি চিন্তিত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, হযরত কেবলা সাহেব তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বলিতেছেন, "আপনি উদগ্রীব হইয়াছেন কেন? আমার কবা অর্থাৎ জুব্বাটি তাহার গায়ের উপর ঢাকিয়া দিন।" তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া হযরতের স্মৃতি কামরা হইতে কবাটি তালাশ করিয়া নিলেন এবং কবাটি তাঁহার গায়ের উপর ঢাকিয়া দিয়া তিনি আপন হুজুরায় বিশ্রাম করিতে আসিলেন। তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমতাবস্থায় তাঁহার উক্ত সন্তান আসিয়া তাঁহার হুজুরার দরজা খুলিতে চেষ্টা করিলেন, তিনি উঠিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনিও তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার এমন নিদ্রা আসিল যে, সারা রাত্র গত হইয়া পর দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাইয়া রহিলেন। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন; তাঁহার অবস্থা প্রায় শান্ত। তাঁহাকে স্নান ও আহারান্তে পুনঃ বিশ্রাম করিতে দিলেন। এইবারও তিনি সারারাত্র ও পরদিনের প্রায় ৯টা পর্যন্ত ঘুমে বিভোর হইয়া রহিলেন। সেই দিন হইতে দেখা গেল; তিনি সম্পূর্ণ ভাল ও শান্ত। কিছু দিনের পর পুনঃ তাঁহার প্রেরণাধিক্য দেখা দিল।

দরবার শরীফে নবাগত ব্যক্তির প্রতি অপূর্ব দর্শনদানের কেরামত

পাকিস্তানের অন্তর্গত "সোয়াদ" নামক স্থানের এক ব্যক্তি হজ্ব করিয়া নবী করিম (সঃ)-এঁর জেয়ারতান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমতাবস্থায় স্বপ্নযোগে নির্দেশিত হইলেন,

"তুমি মশরেকী মূলকে" বা পূর্বের দেশে ভ্রমন কর ইহাতে তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে, তথায় আমার দর্শন পাইবে।" এই নির্দেশে তিনি পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়া পড়েন এবং বিভিন্ন আউলিয়াদের মাজারাদি জেয়ারত করিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। কোন মাজারে তাহার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় অবশেষে মহান আউলিয়ার সন্ধান নিয়া তিনি একদিন মাইজভাণ্ডার শরীফ আসিয়া উপস্থিত হন। তখন মাইজভাণ্ডার শরীফে ময়দানের উত্তর পার্শ্বে হযরতের নামীয় একখানা জুনিয়ার মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসার একটি কামরায় শিক্ষকগণ থাকিতেন। তিনি হযরত আক্দাছের জেয়ারত শরীফ সমাপনান্তে উক্ত কামরায় বসিয়া জনাব মওলানা আবদুস সালাম সাহেবের সঙ্গে হযরতের পরিচয় সম্বন্ধে আলাপ করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় মওলানা আবদুস সালাম সাহেব বলেন, "আমি বাংলা ভাষায় হযরতের একখানা পরিচয় গ্রন্থ লিখিয়াছি। তাহা আপনি পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন না। ইহাতে আপনি হযরতের পরিচয় পাইতেন।" এই কথা শ্রবন মাত্রই তাঁহার হৃদয়ে হতাশ ভাবাপন্ন আবেগের সঞ্চার হয়। দেখিতে দেখিতে তিনি নৃত্যমান অবস্থায় অজ্দ করিতে করিতে বেখোদ ও বিভোর হইয়া পড়েন। পরে শান্তি লাভ করিলে তিনি বলিতে থাকেন "ইছকা নাম হ্যায় দেখ্না, ইছকা নাম হ্যায় ছুননা।" উপস্থিত সকলে তখন বুঝিতে পারিলেন হযরত তাঁহাকে দর্শন দানে ফয়েজ এনায়েত করিয়াছেন। তিনি নিতান্তই সৌভাগ্যশালী উপযুক্ত লোক বটে। কিছুক্ষণ পর বিদায় গ্রহণান্তে তিনি চলিয়া গেলেন।

হযরত কর্তৃক পূর্ব হইতে ঠিক সময়মত সওগাত প্রেরণ ও অতিথি-সেবা

একদিন হযরত আক্দাছের জেয়ারত উপলক্ষে অনেক রাত্রে প্রায় ১৪ (চৌদ্দ) জন দুরদেশী মেহমান আসিয়া পড়ে। তখন হযরত আক্দাছের ঘরে সমস্ত লোকজনের পানাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘরে অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী সংগৃহীত নাই। খাদেম আবদুল মালেক ঘরে গিয়া দেখিলেন, কোন ব্যবস্থা হয় কিনা? রাত্রি অনেক, কোন মওজুদ না দেখিয়া তাহারা এক প্রকার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এতগুলি লোক উপবাসও কি করিয়া থাকিবে? তিনি তাহাদিগকে যথারীতি বসিতে দিয়া পান তামাকের ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত খাদেম চিন্তিত অবস্থায় বসিয়াছেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন--রাঙ্গুনীয়া থানা নিবাসী দুইজন লোক এক আড়ি চিকন চাউলের ভাত ও একটি খাসির মাংস, কুমরাসহ পাক করিয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। খাদেম তাহাদিগকেও অতি যত্নে বসিতে দিলেন এবং আনিত খাদ্য সামগ্রী পরিতৃপ্তির সহিত সকলকে খাওয়াইয়া দিলেন। অবশিষ্টাংশ ভাণ্ডার খানায় সযত্নে রাখিয়া দিলেন। পরে আলাপ প্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন হযরত কেবলা স্বপ্ন যোগে চালের কদু দিয়া খাসির মাংস ও এক আড়ি চিকন চাউলের ভাত দুইদিন পূর্বে তাহার কাছে চাহিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া সকলেই অবাক হইয়া রহিল। এমনভাবে হযরত এখনও যথাসময়ে অতিথি সেবায় রত রহিয়াছেন দেখা যায়।

হযরতের প্রভাব ও গাউছিয়ত ক্ষমতার পরিচয়

সিনেটারী ইন্সপেক্টর, সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম আজিম নগরী সাহেবের বর্ণনা

তিনি বলেন- তিনি যখন নবম শ্রেণীতে পড়িতেন হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে আসিল, পীরানে পীর দস্তগীর হযরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) গাউছুল আজম বলিয়া শুনিয়াছি। আবার লোকে মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) সাহেবকে গাউছুল আজম বলে কেন? তাহার মনে সদাই এই প্রশ্ন জাগিতে লাগিল। দিন দিন উহা বাড়িয়া চলিল! কিন্তু কোন প্রকারে উহার মীমাংসা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান, তিনি বাবাজান কেবলার নূতন বাড়ীর উত্তর পার্শ্বস্ত রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইতেছেন সেই সময় দালানের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত একটি ইটার পাঁজা ছিল। সেই বরাবরে উপস্থিত হইতে প্রায় তিন হাত লম্বা একটি প্রকাণ্ড বাঘ কোথায় হইতে বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। এহেন সঙ্কটময় অবস্থায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী! আমায় রক্ষা করুন।" ইহা বলার সাথে সাথে দেখিতে পাইলেন; হযরতের রওজা মোবারকের উত্তর পার্শ্বস্থ জানালাটি ফাঁক হইয়া গেল এবং দেখা গেল রওজা শরীফে মশারী তরতর করিয়া কাঁপিতেছে আর রওজা শরীফ হইতে আওয়াজ বাহির হইয়া আসিতেছে "খবরদার!" তখন দেখিলেন ব্যাঘ্রটি দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া ব্যস্তভাবে জবান খুলিয়া বলিতেছে, "কার নাম শুনিলাম!" ইহা বলিয়াই ব্যাঘ্রটি তাহার সম্মুখে রাস্তার উপর ধরাশায়ী হইয়া পড়িল এবং তাহার নিকট কাতর মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা জানাইল। তদ্দর্শনে তাহার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল তিনি বসিয়া পড়িলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সত্যই গাউছুল আজম। সেই দিন হইতে হযরতের গাউছিয়তের উপর তাহার পূর্ণ আস্থা জন্মিল।

হযরতের প্রভাবে আয়ুবৃদ্ধি ও মৃত্যুবরণ

আজিমনগর নিবাসী মওলানা মাহমুদল হক ই. পি. সি. এস সাহেব বর্ণনা করেন

আমি খুলনা জেলা সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে কাজ করার সময় একদিন কালেক্টর সাহেব সহ আমার টুর প্রোগ্রাম হয়। পূর্ব রাতে আমার উপর এক অদ্ভুত স্বপ্ন হয়। আমি দেখিতে পাইলাম, হযরত বাবাজান কেবলা মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) আমাকে একখানা আয়ু চার্ট দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ তোমার আয়ুষ্কাল এখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তুমি নিজেই হিসাব করিয়া দেখ।" তখন আমি নিজেও হিসাব করিয়া দেখিলাম, ঠিকই উহার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে বটে। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, একখানা গাড়ী কোন দিক হইতে আসিয়া দূর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে। এতদর্শনে আমার দেহমন যেন একেবারে নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে

দেখিলাম, হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) সেখানে উপস্থিত। তিনি হযরত বাবাজান কেবলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "কি হইয়াছে?" এই বলিয়া তিনি চার্টখানা বাবাজান কেবলা হইতে নিজ হাতে নিলেন। বাবাজান কেবলা চার্টের প্রতি নির্দেশ করিয়া হযরত সাহেবকে বলিলেন, "তাহার আয়ুষ্কাল এইখানেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

হযরত আক্‌দাছ চার্ট দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ ঠিকই তো।" তখন আমি করজোড়ে চার্টে আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলাম এবং বলিলাম "হুজুর এইরূপ হইলে কেমন হইবে।" হযরত আক্‌দাছ আমার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "হাঁ ঠিকই তো।" তারপর বাবাজান কেবলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "ঠিক করিয়া দিলেই তো হয়", কিন্তু বাবাজান কেবলা নীরব রহিলেন। আমি হযরতের নিকট বার বার মিনতি করিতে লাগিলাম। এমন অবস্থায় আমার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। সজাগ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম আমার মৃত্যু অনিবার্য। না হইলে এই স্বপ্ন দেখিতামনা। সকালে টুরে রওয়ানা হইবার পূর্বে আমার কাছে যাহা ছিল প্রায় শ দুইয়েক টাকা আমার স্ত্রী সাহেবার হাতে দিয়া বলিলাম, "আমি অদ্য মাননীয় কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে টুরে যাইতেছি। খোদা না করুক যদি কোন দুর্ঘটনা হয় আপনি এই টাকাগুলি লইয়া আমার নিজ বাড়ীতে চলিয়া যাইবেন।" এই ব্যবহারে আমার স্ত্রী সাহেবা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? আমি তাহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলাম, এতদশ্রবণে তিনি আমাকে টুরে না যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম 'অদৃষ্টের লিখা অখন্ডনীয়। যাহা হওয়ার আছে ঘরে বাহিরের প্রশ্ন নাই। যেইখানেই বা থাকি হইবেই। বিশেষ করিয়া কালেক্টর সাহেবের কাছে ওয়াদা দিয়া নিজেই প্রোগ্রাম করিয়াছি। আমাকে যাইতেই হইবে। তদুপরি স্বপ্নেও দেখিয়াছি, আমি আর তিনি একই গাড়ীতে আছি।"

বর্তমানে এক কাজ করিব, দুইজন দুই গাড়ীতে যাইব ধারণা করিয়াছি। যাহাতে আমার দুর্ভাগ্য তাহাকে স্পর্শ না করে। আমি বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দুজনে দুই গাড়ী লইয়া টুরে যাত্রা করিলাম। ফিরিবার পথে একখানা গাড়ী বেকার হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসিলাম। চলার পথে আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত সাহেবকে বলিলাম। আল্লাহ্‌র নাম স্মরণে পথ অতিক্রম করিতেছি। গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার কিছু পূর্বেই দেখিলাম, একখানা ট্রাক দ্রুত আসিতেছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের গাড়ীর হরণ বন্ধ হইয়া যায়। দেখিতে না দেখিতে ট্রাকখানা বিদ্যুৎ বেগে আসিয়া আমাদের গাড়ীর এক পার্শ্বে আঘাত (একসিডেন্ট) করিয়া গেল। সৌভাগ্য এই যে, আমাদের গাড়ীখানার একপার্শ্ব নষ্ট হইয়া গেলেও আমরা উভয়ে কোন প্রকারে জীবনে বাঁচিয়া গেলাম। কালেক্টর সাহেব ট্রাকখানার নম্বর টুকিতেই আমি তাহাকে বারণ করিয়া বলিলাম, ইহা দৈব দুর্ঘটনা। আল্লাহ আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে শোকর। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাওয়া উচিত হইবেনা। মনে মনে ভাবিলাম উহা হযরত সাহেব কেবলার (কঃ) তছর্‌রোপাত! তখন মন শ্রদ্ধাপ্লুত হইল এবং ভক্তির সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিলাম।

মাজার শরীফ জেয়ারতে নবী করিম (সঃ) এঁর রওজা মোবারকের সাদৃশ্য-মাহাত্ম্য

চট্টগ্রাম মির্জাপুর, ছাদেক নগর নিবাসী জনাব আহমদ উল্লাহ চৌধুরী সাহেবের পুত্র জনাব হাজী ওয়াশীল মিঞা চৌধুরী সাহেব একদিন হযরত আক্‌দাছ (কঃ) এঁর রওজা শরীফ জেয়ারত করার পর হযরত আক্‌দাছের খাদেম মওলানা হাফেজ কারী হাকিম তফাজ্জুল হোসাইন সাহেবের নিকট বর্ণনা করেন যে, "হযরত আক্‌দাছের রওজা শরীফ জেয়ারত করিয়া যেই খোশবু পাইলাম, উহা অবিকল নবী করিম (সঃ) এঁর পবিত্র রওজা মোবারকের খোশবু। আমি খোদার ফজলে দুইবার নবী করিম (সঃ) এঁর রওজা জেয়ারত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। তাঁহার পবিত্র রওজার শান্তিময় খোশবু আর কোথাও পাই নাই। হযরতের পবিত্র রওজা শরীফ জেয়ারতে আজ তাহা পাইলাম।"

দারুল উলুম মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মোদার্রেছ মওলানা নজির আহমদ সাহেবের অভিমত

সাতকানিয়া নিবাসী মওলানা আবদুচ্ছালাম সাহেব বর্ণনা করেন যে, "আমি দারুল উলুম মাদ্রাসার মোদার্রেছ জনাব মওলানা নজির আহমদ সাহেবের ছাত্র। উক্ত মাদ্রাসায় পড়া কালে একদিন মাইজভাণ্ডার শরীফের ভক্ত ও মুরিদদের আচরণ ও কার্যকলাপ দেখিয়া আমার বিশেষভাবে সন্দেহ হইল। ইহাতে আমি তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সমালোচনা করিলাম। জনাব মওলানা নজির আহমদ সাহেব আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার কাছে আস আমি তাহার নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মাইজভাণ্ডারী তরিকা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছ? আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম "হাঁ হুজুর, বলিয়াছি।" তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, মিঞা! কান পাকড়ো! তওবা কর! আর কখনও বলিবেনা বলিয়া শপথ কর! আমি আদেশ পালনে তওবা করিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর জীবনে কোন দিন মাইজভাণ্ডারের বিরুদ্ধে এইরূপ সমালোচনা করিবনা। পরে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বলিয়াছিলে?" আমি উত্তরে বলিলাম, 'হুজুর! যাহা বলিয়াছি ঠিকই বলিয়াছি মিথ্যা বলি নাই। তবে আর বলিব না। হুজুর আমাকে অতি আদরের সহিত একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, উহা একটি

দরিয়া সদৃশ্য! দরিয়াতে কি না থাকে? কিন্তু দরিয়ার পানি কি কখনও অপবিত্র হয়? বরং সর্বপ্রকার অপবিত্রতা দরিয়ার লোনা জলে মিশিয়া পবিত্র হইয়া যায়। আদব করিও! আর এইরূপ কখনও কিছু বলিওনা। আমি বাড়ীতে যাওয়ার পর একদিন আমার পিতা মওলানা সাহেবকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষঃস্থল ভিজাইয়া ফেলিলেন। অতঃপর মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে কয়েকটি পরিচয় আলাপ করিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে হুশিয়ার! তাঁহার ভক্ত অনুরক্তদের সম্বন্ধে কোনরূপ আলাপ করিওনা। ইহা তুমি এখনও বুঝিতে পারিবেনা। আর যদি বলিয়া থাক চিরকালের জন্য তওবা করিয়া ফেল। তখন আমি বাবাকে মাদ্রাসার ঘটনাটি বলিলাম। তখন বাবার কাছেও আবার তওবা করিলাম। বাবা বলিলেন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) অতুলনীয় অলি আল্লাহ। কোন আউলিয়ার সঙ্গে তাঁহার তুলনাও করিও না।" সেই দিন হইতে মাইজভাণ্ডারকে ভক্তি করিতাম ও কোন প্রকার সমালোচনা করিতাম না। পরে মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে আরও পরিচয় পাইয়া আসা-যাওয়া করিতেছি।

হযরতের প্রতি দেওবন্দী মওলানা অলি আহমদ নেজামপুরী সাহেবের অভিমত

জনাব মওলানা অলি আহমদ নেজামপুরী একজন দেওবন্দ পাশ সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও কামেল পীরে তরিকত ছিলেন। তিনি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর উপর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতেন। কিন্তু গান বাজনা ও সেজদায়ে তাহিয়া সরাসরি জায়েজ রাখিতেন না।

তাহার এক ভক্ত শেখ মোছলেহ উদ্দিন, চট্টগ্রামস্থ ৫২ নং নালা পাড়া বাস করিতেন। ১৯৫১ সালে মাঘ মাস মাইজভাণ্ডার শরীফ হযরতের ওরশ ও ওরশকালীন রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে মরহুম মওলানা অলি আহমদ সাহেব বলেন ঃ-

"মাটির উপর নাচ গান করিলে কি হইবে? মাটির নীচে উত্তম জিনিষই আছে। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী আহমদ উল্লাহ (কঃ) চট্টগ্রামের একজন সর্বশ্রেষ্ট বুজুর্গ ও আলেম ছিলেন। তাঁহার এন্তেকালের পর মাজার শরীফে কি হইতেছে উহার জন্য তিনি দায়ী নহেন।"

বর্ণনাকারী--
শেখ মোছলেহ উদ্দিন
৫২ নং নালা পাড়া, চট্টগ্রাম।

শ্রেষ্ঠ কেরামত

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কাদেরী (কঃ) পার্থিব জগতে থাকা কালীন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও উরূজে রূহানীর প্রভাবে অসংখ্য অলৌকিক কেরামতাদির দ্বারা ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন।

তাঁহার নশ্বর দেহ-ত্যাগের পরও দেখা যায় তাঁহার অবিনশ্বর মহাশক্তিশালী রূহানী শক্তির প্রভাবে পূর্ববৎ অন্তর্যামী ফকীর রূপে ভক্ত অনুসন্ধিৎসু জনমনের না হওয়ার এবং না পাওয়ার মত দুর্লভ কাম্য বস্তুতে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা মূলে সূলভে পাওয়ার এবং হওয়ার রূপদানে যত্নবান আছেন। পবিত্র হাদিছের বাণী মতে ঃ-

تموتون كما تحيون و تحشرون كما تموتون ،

অর্থাৎ ঃ- তিনি ওফাতের পরও সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন এবং জনমনের হাজত মকছুদ পুরা করিতেছেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বার্ষিক ওরশ শরীফের দৃশ্য

প্রতি বৎসর ১০ই মাঘ এই মহান বিশ্ব অলি মহামানব কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী গাউছুল আজম বিল আছালত জনাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর এই নশ্বর পৃথিবী হইতে ওফাত পাইয়া পরম করুণাময় আল্লাহতা'য়ালার নূরীজাতে শুভ-মিলন দিবসে লক্ষ লক্ষ লোকের সমবায়ে এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই তাঁহার স্মৃতি বার্ষিকী ওরশ শরীফ। জন সমাগমে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মেলন সমূহের মধ্যে পঞ্চম।

বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্ত জায়েরিনগণ পবিত্র মাজার পার্শ্বে শ্রদ্ধাবনতভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী স্বাধীন ও প্রথানুসারে প্রত্যেকের ধর্ম-কর্মে রত থাকেন। কেউ কাহাকে বাধা দেয় না। বিপুল সমাবেশের স্থানে স্থানে ও মাজার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন তাঁবু ও শামিয়ানার তলে নানা প্রকার ধর্মীয় গজল নাতিয়ামুলক প্রেমগীতি আল্লাহ, রছুল ও তাঁহার শানে, বাদ্যের তালে তালে গাহিয়া জিকির ও অজ্দ করিতে থাকে।

নামাজের সময় বিভিন্ন তাঁবু ও শামিয়ানার তলে মসজিদ ও এবাদতগাহে উপাসনা রত কাতারবন্দীর এক অপরূপ আকর্ষণীয় দৃশ্যের অবতারণা করে।

এই প্রেম-পাগল মেলায় "ছালাতে দায়েমী" রত প্রেমিকদের করুণ কান্না গীতি, বাদ্য ধ্বনি ও জিকির এবাদতের অভিনব অবস্থা দর্শনে হাশর ময়দানের দ্বিতীয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই অপূর্ব সম্মেলনে আগত জন সমুদ্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন বণিক সওদাগর নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী লইয়া দোকান সাজাইয়া আংশিক সেবায় সানন্দে ব্যবসা করিয়া মহান অলি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে থাকে।

হযরতের উত্তরাধিকারী ওয়ারেছ-কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় এই মহাসম্মেলনের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শত শত সেবকদল আগত ভক্ত জায়েরিনদের সেবায় রত থাকিয়া হযরত আক্দাছের ফয়েজ রহমত ও সন্তুষ্টির ভরসায় নিজ দেহ-মনকে নিয়োজিত করিয়া সেবা ধর্মের পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেন।

তবরুক বিতরণ

রাত বারোটার পর সমস্ত বাদ্য জনিত ছেমা জিকির বন্ধ করিয়া মিলাদে নবী ও হযরত আক্‌দাছের তাওয়াল্লোদ শরীফ পাঠান্তে ফাতেহাখানী সমাধা করা হয়। অতঃপর সেবকদল ক্যাম্পে ক্যাম্পে শৃঙ্খলার সহিত তবরুক পৌছাইতে থাকেন এবং জেয়াফত পদ্ধতিতে জায়েরীন ও পর্যটকদিগকে আহরীয় সামগ্রী বিতরণ করেন।

১৩ই মাঘ দিবাগত রাতে বিপুল আয়োজনে তাঁহার চাহরম শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতি বাংলা মাসের দশ তারিখ হযরতের মাসিক ফাতেহা কার্য সমাধা করা হয়। এবং জিলক্‌দ চাঁদের ২৭ তারিখ কমরী ওরশ শরীফ পালিত হয়। এই সমস্ত দিবসে অসংখ্য লোক হযরতের দরবারে হাজির হইয়া সেবা কার্যে শরীক হন। ইহা ছাড়া প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা হইতে দেশী-বিদেশী, দুর-দুরাগত ভক্তজন হযরতের রওজা মোবারকে আসিয়া জেয়ারত ও ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন।

পবিত্র ওরশ শরীফে নেয়াজ ফাতেহার প্রচলন, ধরণ সংক্রান্ত ইঙ্গিত মূলক হযরত আক্‌দাছের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব রওয়ায়েত করেন যে, একদা পড়শি মহল্লা সরদার ছায়াদউদ্দীন ও আছহাব উদ্দীনদ্বয়কে হযরত আক্‌দাছ বলিয়াছিলেন "তোমরা হিসাব কর দেখি, ১২০ একশত বিশটি গরু, ভইষ (সংখ্যা কত উল্লেখ করিয়াছিলেন আমার মনে নাই তদ্রুপ ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যাও নির্ণয় করিয়াছিলেন) পাক করিয়া খাওয়াইতে কি পরিমাণ চাউল, মরিচ গুড়া, ডাইলের গুড়া, (তৎকালীন চট্টগ্রামী জেয়াফতে কলাইর গুড়ার ডাইল তৈরী করার প্রচলন ছিল) এবং কয় খাঁচি মূলা লাগিবে।"

প্রকাশ থাকে যে হুজুরে আক্‌দাছের উত্তরাধিকারী সরকারই এই পর্যন্ত হযরতের উপরোল্লিখিত ইঙ্গিত মত ওরশ শরীফ নেয়াজ ফাতেহা চাহরম শরীফ ইছালে ছওয়াব, মাসিক এবং চন্দ্র বার্ষিক ওরশ শরীফ ও প্রতি বাংলা মাসের ১০ তারিখের ফাতেহা ইত্যাদিতে ঐ নিয়মেই ভাত গোস্ত, তরকারী ও শুরুয়া পৃথক পৃথকভাবে পাক করতঃ জনগণের মধ্যে তবরুক বিতরণ ও খাওয়াইবার রেওয়াজ অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রাখিয়াছেন।

১০ই মাঘ তাঁহার বেছালী ওরশ শরীফ মূলার মওসুমে বিধায়ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী রহস্যমূলক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

হযরত আকদাছের তরীকত পরিচয়-
সজরায়ে আহমদিয়া কাদেরিয়া গাউছিয়া

আল্লাহুম্মা ছল্লেআলা ছৈয়দেনা মওলানা মোহাম্মদিন ওয়া আলেহি ওয়া আসহাবেহি ওয়া আলে এর্শাদেহি গাউছুল আজম মহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদের ওয়া গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মায়াদনিজ্জোদে ওয়াল করম। ওয়ালেহি ওয়া আসহাবেহী ওয়া জমিয়ে খোলাফায়ে তরিকতেহি ওয়া বারেক ওয়াচ্ছালাম।

(১) এলাহী বহুরমতে রহমতুল্লীল আলামীন রাহাতুল আশেকীন মুরাদুল মোশতাকীন শফীউল মুজনাবীন খাতেমুন্নবীঈন সৈয়দুল আম্বিয়া ওয়াল আউলিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মোজতাবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ওয়ালা আলেহি ওয়া আসহাবেহী ওয়া আহলে বায়তেহি ওয়াছল্লেমা তছলিমান কাছিরান।

(২) এলাহী বহুরমতে আছাদিল্লাহিল গালেব আমিরুল মোমেনীন আলী ইবনে আবীতালেব (কঃ)

(৩) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুশ্‌শোহাদা হযরত এমাম হোছাইন (রঃ)

(৪) " " ছৈয়দুছ্‌ছালেকীন হযরত সৈয়দ জয়নাল আবেদীন (রঃ)

(৫) " " ছৈয়দুল ওয়াছেলিন হযরত এমাম মুহাম্মদ বাকের (রঃ)

(৬) " " ছৈয়দুল কামেলীন হযরত এমাম জাফর সাদেক (রঃ)

(৭) " " ছৈয়দুল আলম হযরত এমাম মুছা কাজেম (রঃ)

(৮) " " ছৈয়দুছ ছাক্‌লাইন হযরত এমাম আলী ইব্‌নে মুছা রেজা (রঃ)

(৯) " " ছৈয়দুল ওয়াছেলীন হযরত শেখ মারুফ কুরখী (রঃ)

(১০) " " ছোলতানুল মাহবুবীন হযরত ছির্‌রি ছাক্‌তী (কঃ)

(১১) " " ছৈয়দুল আছফীয়া হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (কঃ)

(১২) " " ছোলতানুল আউলিয়া হযরত আবুবকর শিবলী (কঃ)

(১৩) " " মাহবুবুছ ছালেকীন হযরত শেখ আবদুল আজিজ তামিমী (কঃ)

(১৪) " " এমামুল কামেলীন হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ তামিমী (কঃ)

(১৫) " " ছৈয়দুল আউলিয়া হযরত মওলানা আবুল ফরাহ্‌ তরতুছী (কঃ)

(১৬) " " ছৈয়দুছ্‌ছাকলাইন হযরত মওলানা আবুল হাছান কোরাইশী (কঃ)

(১৭) " " শেখুশ্‌ শেখ হযরত ইব্‌নে মোবারক আবু ছায়িদ মখ্‌জুমী (কঃ)

(১৮) " " কুতুবুল আলম গাউছুল আজম হযরত সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)

(১৯) " " সোলতানুল আরেফীন হযরত শাহবুদ্দিন ছরওয়ার্দি (কঃ)

(২০) " " ছৈয়দুল আরেফীন হযরত নেজামুদ্দিন গজনবী (কঃ)

(২১) " " হযরত ছুফিউল আছফীয়া সৈয়দ মোবারক গজনবী (কঃ)

(২২) " " হাদীউল আশেকীন হযরত ছুফী নজমুদ্দিন গজনবী (কঃ)

(২৩) এলাহী বহুরমতে সোলতানুল মাহবুবীন হযরত ছুফী কুতুবুদ্দিন রওশন জমির (কঃ)
(২৪) " " হাদী এলাল্লাহ হযরত ছুফী ফজলুল্লাহ (কঃ)
(২৫) " " জোবদাতুল কামেলীন হযরত সৈয়দ মাহমুদ (কঃ)
(২৬) " " সোলতানুল মোকাররেবিন হযরত নছিরুদ্দিন (কঃ)
(২৭) " " এমামুল মাশায়েখ হযরত ছুফী তকিউদ্দিন (কঃ)
(২৮) " " মকছুদুত্তালেবীন হযরত ছুফী নেজামুদ্দিন (কঃ)
(২৯) " " ছৈয়দুল আরেফীন হযরত সৈয়দ আহালুল্লাহ (কঃ)
(৩০) " " কোদ্ওয়াতুছ্ ছালেকীন হযরত সৈয়দ জাফর হোছাইন (কঃ)
(৩১) " " মতলুবুত্তালেবীন হযরত ছুফী খলিলুদ্দিন (কঃ)
(৩২) " " কুতুবুল আক্তাব হযরত মওলানা মুহাম্মদ মোনায়েম (কঃ)
(৩৩) " " ইমামে হাইউল কাইয়ুম হযরত ছুফী মুহাম্মদ দায়েম (কঃ)
(৩৪) " " মোতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ হযরত ছুফী আহমদ উল্লাহ (কঃ)
(৩৫) " " হাদী এলল্লাহ হযরত হাজী ছুফী লকিয়ত উল্লাহ (কঃ)
(৩৬) " " হাজীউল হারমাইন গাউছে জমান হযরত ছুফী সৈয়দ মুহাম্মদ ছালেহ লাহোরী (কঃ)
(৩৭) " " কুতুবুল আফখম গাউছুল আজম সোলতানুল আরেফীন রূহুল আশেকীন মুরাদুল মোশতাকীন খাতেমুল আউলিয়া হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)
(৩৮) " " সোলতানুল মোকার্‌রেবীন কুতুবে আলম, অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ)।
(৩৯) " " সোলতানুল মাহবুবীন, ইমামুল কামেলীন, ছাহেবে আছরারে অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক (মঃ জিঃ আঃ)

খোদাওন্দা বহককে হাজেহিল আছমা, পুরাকর মেরে দিলকী আরমাঁ।

পরিশিষ্ট

প্রথম সংস্করণ প্রকাশকের বিবৃতি

আজ আমার সংগৃহীত নোটমূলে জনাব মওলানা ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া নিজামপুরী গোল্ডমেডালিষ্ট সাহেব কর্তৃক লিখিত গাউছে আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর "জীবনী ও কেরামত" নামক গ্রন্থখানি দর্শনে সন্তুষ্ট হইলাম। যাহার সত্যতা ও সততা সম্বন্ধে আমার আস্থা আছে।

মওলানা সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ইছাপুরী সাহেব রচিত "হযরত শাহ্ মাইজভাণ্ডারী" নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থাতে ছাপানো হইয়াছিল। তাহাও আবার "আয়নায়ে বারীর" অনুকরণে মছায়েলা মছায়েল বহুল বলিয়া জীবনীর সারল্য হারা ছিল। বর্তমানে হযরত কেবলার জীবনীটি সেই দিক দিয়াও পছন্দসই।

উক্ত মওলানা ইছাপুরী সাহেব লিখিত "হযরত গাউছুল আজম মওলানা আল সৈয়দ গোলাম রহমান আল হাছানী আল মাইজভাণ্ডারী বাবাজান কেবলা কাবার (কঃ) জীবন চরিত" নামক গ্রন্থখানি পাঠে দেখিতে পাইলাম হযরত কেবলা শাহ্ ছুফী গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর নাম উল্লেখে তিন চারিটি রেওয়ায়েত মারাত্মক ভুল, পরিকল্পিত এবং অপবাদমূলকভাবে সন্নিবেশিত।

যেমন উক্ত জীবন চরিতের ২২ পৃষ্ঠায় ৭ম লাইনে লেখা আছে, "আমার সমস্ত বাগান খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও একটি গোলাপ ফুল খুঁজিয়া পাইলাম না।" অথচ সেই সময় হযরতের ফয়েজ বরকাত ও কামালিয়ত প্রাপ্ত বহু লোক বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারা এই দেশে সুপরিচিত। তাঁহাদের চালচলন ও খোদা আসক্তি দর্শনে এই মাইজভাণ্ডার শরীফের দিকে সাধারণ লোকেরাও ঝুঁকিয়া পড়ে।

এই ইছাপুরী সাহেব 'হযরত শাহ্ মাইজভাণ্ডারী' নামক গ্রন্থে নিজে লিখিয়াছেন, তাহার চাচা মরহুম সাবরেজিষ্ট্রার জনাব সৈয়দ ফোরক আহমদ সাহেবকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) বলিয়াছিলেন, 'তোম হামারা বাগকে গোলে গোলাব হো।" মওলানা সাহেবের এই 'স্ববিরোধী' কথার কোন মিল দেখা যায় না। পক্ষান্তরে তাহার এই বানাওটি কথার দ্বারা হযরত কেবলার বেলায়তের উপর বিরাট ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন হযরতের বেলায়ত যুগটি অনর্থক ও অকেজো। কোন প্রস্ফুটিত মানুষ সেই যুগে গড়িয়া উঠে নাই। এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক।

হযরতের বেলায়তের দ্বারা এই পূর্বের দেশবাসীরা যে উপকৃত এবং ছাহেবেহাল

ও জজ্‌বার অধিকারী, তাহা এই দেশবাসীরা এক বাক্যে স্বীকার করে এবং বুঝে। (বেলায়তে মোত্‌লাকা বা মুক্ত ছুফীবাদ এবং আয়নায়ে বারী দ্রষ্টব্য) এই জীবনী দ্বারাও মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কোন ধরনের অলি উল্লাহ। ইহা ছাড়া বহু পুস্তক-পুস্তিকা আছে যাহাতে তাঁহার শানের গান গজল লিপিবদ্ধ এবং তাঁহার শান বর্ণিত আছে। (রত্ন ভাণ্ডার দ্রষ্টব্য)

মওলানা ইছাপুরী সাহেব লিখিত ঐ জীবন চরিতের ৪৭ পৃষ্ঠায় ১২শ লাইনে আছে, শাহ্ আবদুল মজিদ আজিম নগরী (রঃ) হযরতের খেদমতে হাজির হইয়া হযরত বাবাজান কেবলার (কঃ) শানে বাক্যালাপ করিলে হযরত আক্‌দাছ (কঃ) তাঁহাকে বলেন, "মিঞা উহ্ শাহে জালাল হ্যায়। মুলকে এমনকো রাহনে ওয়ালা হ্যায়। উনকো আদব করো। তোম লোগোঁকে এবতেদা আওর এনতেহা উনহিকে হাতমে হ্যায়।" ইছাপুরী সাহেব লিখিত উপরের বাক্যগুলি সেইরূপ এক বিকৃত বর্ণনা, তদ্রূপ উদ্দেশ্যমূলক এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উক্তি।

(ক) আবদুল মজিদ মিঞা হযরত কেবলার আত্মীয় হইলেও হযরত কেবলা তাঁহার পীরে তরিকত ছিলেন। কাহারো শেকায়েতমূলক গল্প গুজব বে-আদবী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতেন। তিনি সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বরং হযরতের ফয়েজ প্রাপ্ত সাহেবে তাছার্রোপ লোক ছিলেন। এমন কি তিনি যাহাকে হালকা জজ্‌বার সময় স্পর্শ করিতেন তাহারও হাল জজ্‌বা গালেব হইত। যাহারা তাহাকে জানে, তাহারা নিশ্চয় ইহা স্বীকার করিবে। ফয়েজ দানে হযরত কেবলা তাঁহাকে খেলাফত দিয়াছিলেন। যাহা সকলে স্বীকার করিত। ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মন্দাকিনী, ধলই, ফরহাদাবাদ, গুয়াবিল, দৌলতপুর বাবুনগর, আজিমনগর, মাইজভাণ্ডার ও নানুপুর মৌজার আবাল বৃদ্ধ বণিতা তাঁহার তছার্রোপ সম্বন্ধে নিশ্চয় ওয়াকেবহাল আছেন। এহেন অবস্থাতে উক্ত শাহ্ সাহেবের এবতেদা অর্থাৎ শুরু, এনতেহা অর্থাৎ শেষ, বাবাজান কেবলার হাতে কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝার উপায় নাই। ইহা এমন এক উক্তি, যাহার কোন যুক্তি নাই।

(খ) প্রকৃত ঘটনা এইরূপ ঃ- আঁ-হযরত কেবলা কাবার দায়রা শরীফের সোজা দক্ষিণ দিকে মধ্যখানে একটি 'দর' বা বাহির উঠানে আসার পথ বাদ, সৈয়দ মওলানা আবদুল করিম সাহেবের যেই কাছারী ঘর ছিল, তাহাতে ছোট মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক কুতুবে এরশাদ ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সাহেব মুরিদান এবং পীরভাইগণ সহ হালকা জজ্‌বা করিতেন ও করাইতেন। আমরা সেই ঘরে হাজির হইতাম ও তাঁহার তালিম নিতাম। তিনি উপস্থিত হইতে না পারিলে উক্ত আবদুল মজিদ মিঞাকে তালিম দিবার হুকুম দিতেন। একদা বাদে মগরিব, নামাজান্তে নিয়মিত হালকা জজ্‌বার মজলিশ বসিলে, ছোট মওলানা সাহেবের অনুপস্থিতে আবদুল মজিদ মিঞা উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পাশে বসিয়াছিলাম। এই কাছারী ঘরখানাকে হযরত কেবলা 'দপ্তরখানা" বলিতেন। হযরত আক্‌দাছ লোক বিশেষকে কোন কোন সময় বলিতেন, 'দপ্তরখানায়' আমার আমিন মিঞার কাছে গিয়া বস।

এইদিকে গান বাজনা সহ হালকা জজ্‌বার মজলিশ চলিতেছিল। এমন সময় ঘরের

উত্তর পাশের দরজা দিয়া জনাব বাবাজান কেবলা কাবা জালালিয়ত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতঃ "থাক" অর্থাৎ বাতি রাখার গাছ বিশেষ দিয়া আবদুল মজিদ মিঞার মাথায় আঘাত করিয়া পূর্ব দরজা দিয়া বাহির হইয়া যান। ঘরটি বাতির অভাবে অন্ধকার হইয়া যায় এবং মজলিসও ভঙ্গ হয়।

আবদুল মজিদ মিঞা হাউ হাউ রব করিতে করিতে হযরতের আন্দর হুজুরা শরীফের দিকে হুজুর সকাশে অগ্রসর হইলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। সামনে যাইতে না যাইতেই হযরত কেবলা বলিতে লাগিলেন, "শোর করে কে?" লাতু নামে এক বৃদ্ধা খাদেমা বলিল, "হুজুর আবদুল মজিদ মিঞা শোর করিতেছেন।" এই অবসরে আবদুল মজিদ মিঞা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হুজুর! খুইল্যার ছেলে আমাকে খুন করিয়াছে। হযরত কেবলা তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং মাথায় তৈলপট্টি দিবার জন্য খাদেমকে হুকুম দিলেন। হযরত কেবলা আবদুল মজিদ মিঞাকে বলিলেন, "ভাই? উহ্ সাহেবে জালাল হ্যায়। মুলকে এমন মে রাহাতা হ্যায়, আলমে আরওয়াহ মে ছায়ের করতা হ্যায়। আপতো হামারা ছাত রহিয়েগা; উনকে পাছ কেউ গেয়া"? জনাব বাবাজান কেবলা এইরূপ "জালালী" অবস্থায় যাহাকে সামনে পাইতেন তাহাকে প্রহার করিতেন। এমন কি একদিন তাঁহার পিতা মওলানা সৈয়দ আবদুল করিম সাহেবকেও প্রহারে রক্তাক্ত করিয়াছিলেন। কোনরূপ বাহ্যিক লোকাচারী লেহাজ করিতেন না। বরং হাল জজ্‌বা ছোকর গালেব অত্যধিক প্রকাশ পাইত। উক্ত জীবন চরিতের ৪৮ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে লিখা আছে; বোয়ালখালী থানার চরনদ্বীপ নিবাসী মওলানা অছিয়র রহমান (রঃ) বহু বৎসর যাবত হযরত আক্‌দাছ (কঃ) এঁর খেদমতে ছিলেন। অবশেষে হযরত আক্‌দাছ (কঃ) তাঁহাকে বলেন, "তোমহারে নেয়ামত পীরানে পীর সাহেবকে হাতমে হ্যায়। তোম উনকে পাছ যাও।" এই উর্দু বাক্যটি যেমন উদ্ভট তেমন অস্বাভাবিক। যেহেতু মওলানা অছিয়র রহমান সাহেব হযরতের প্রথম খলিফা এবং ফয়েজ প্রাপ্ত কামেল অলিউল্লাহ। জনাব বাবাজান কেবলা ফয়েজ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং বাড়ীতে গিয়া গদী-নশীন হওয়ার হুকুম প্রাপ্ত হন। দাদী আম্মা বলিতেন, নানুপুরের-খুইল্যা মিঞা ফকীর, রাউজানের ওয়ালী মস্তান, সাতকানিয়ার জাফর আলী শাহ্, চরণদ্বীপের মওলানা অছিয়র রহমান শাহ্ হযরত কেবলার প্রথম অবস্থার মুরিদ এবং ফয়েজ প্রাপ্ত। এই মওলানা অছিয়র রহমান সাহেবই গদীর হুকুমপ্রাপ্ত হযরতের প্রথম খলিফা। বাড়ীতে গিয়া গদীতে বসার পর মাত্র একবারই তিনি দরবার শরীফ আসিয়াছিলেন। তাহাও হযরত কেবলার ওফাতের ১৬/১৭ দিন পূর্বে সেই সময় শীতের মৌসুম ছিল। আমি সেই সময় একদিন প্রাতঃকালীন পড়া শেষ করিয়া গোছলের পূর্বে উত্তরের উঠানে খেলিতে আসিয়া হঠাৎ দক্ষিণ দিকে নজর করিতেই মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। যেন হযরত কেবলা দক্ষিণ মুখি উঠানে শীতকালীন রৌদ্র উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে কিছু সুস্থ বলিয়া মনে হইল। তাড়াতাড়ি দক্ষিণ দিকে সম্মুখে আসিলেই আমার ভুল ভাঙ্গে। কারণ যিনি উপবিষ্ট আছেন তিনি চরণদ্বীপের মওলানা অছিয়র রহমান সাহেব। তিনি এত্তেহাদী ফয়েজের বদৌলতে দেহে পর্যন্ত হযরতের অবয়বতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খোদাতা'লার মহিমায় বয়সের ফলে চুল দাড়ি মোবারকও একই রূপ সাদা হইয়া গিয়াছিল। যাহার ফলে আমার মত নিত্য সাহচর্য প্রাপ্ত লোকও

বিভ্রান্তিতে পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমার নিশ্চিত স্মরণ আছে, তিনি দরবার শরীফ হইতে বাড়ী চলিয়া যান। জনাব বাবাজান কেবলা তখন ফটিকছড়ি বিবির হাটের নিকট সুন্দরপুর গ্রামেই ছিলেন। এমন কি হযরত কেবলার ওফাতের সময়েও বাড়ী আসেন নাই। কাজেই বুঝিতে কষ্ট হইবেনা যে, এই রেওয়ায়েত নেহায়ত উদ্ভট ও উদ্দেশ্য মূলক। এই উদ্দেশ্য কি; তাহা বুঝিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। উক্ত জীবন চরিতের ৪৯ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে লিখা আছে, "এইরূপ হযরত কেবলা (কঃ) শেষ বয়সে তাঁহার বহু খাস মুরিদগণকে বাবাজান কেবলার (কঃ) খেদমতে যাইতে বলেন এবং তাহারা বাবাজান কেবলা (কঃ) হইতে ফয়েজ প্রাপ্ত হন।" এই উদ্দেশ্যটি ছাবেত করার জন্য বোধ হয় এমন উদ্ভট রেওয়ায়তের দরকার ছিল।

ছুফী তরিকা বা দস্তুর মতে পীরে তরিকত বা বায়েতী একজনই থাকেন। পীরে তাফাইউজ অর্থাৎ ফয়েজ বরকত বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে নেওয়ার নিষেধ নাই। যাহারা এই পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল বা অবগত আছেন, তাহারা জানেন, যেমন হযরত আক্দাছ; শাহ ছুফী হাজিউল হারমাইন আবু শাহ্মা সৈয়দ মুহাম্মদ ছালেহ লাহুরী কাদেরী (রঃ) পীরে তরিকত হইতে গাউছিয়তের ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া খেলাফত হাছেলে কামালিয়ত প্রাপ্ত হন এবং তিনি পীরের হুকুম মত শাহ্ ছুফী হাজিউল হারমাইন সৈয়দ দেলাওর আলী পাকবাজ (চিরকুমার) লাহুরী কাদেরী মোহাজেরে মদনী (রঃ) হইতে কুতুবিয়তের ফয়েজ ও খেলাফত প্রাপ্ত হন। এইরূপে মওলানা আবদুল আজিজ দেহলভী (রঃ), শাহ্ এমদাদুল্লাহ (রাঃ), হযরত শাহ্ ওয়ারেছ আলী (রাঃ) প্রমুখ চিরকুমার সাহেবানেরা এবং মোল্লা ছাদী (রাঃ) এইভাবে ফয়েজ বরকত হাছেল করিয়াছেন দেখা যায়, আর রেওয়াজও আছে।

আমি নিজেও হযরত মওলানা কুতুবে এরশাদ সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সাহেবের নিকট বায়াতে ছুন্নাত ও শিক্ষা গ্রহণ করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে বায়াত হন। তাঁহার ওফাতের পর আমার দাদা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কেবলা কাবার হাতে বায়াত এবং তরিকা কবুল করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে তরিকত। জনাব বাবাজান কেবলা কাবার (কঃ) নিকট হইতে আমি রূহানি ফয়েজ হাছেল করি এবং এলম জ্ঞান অর্জন করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে তাফাইউজ।

হযরত আক্দাছ (কঃ) একদিন আমার সামনে বলিয়াছিলেন, আমার দেলা ময়না আমার 'বাচা' ময়নার চেহেরার উপর থাকিবে। হযরত কেবলা জনাব বাবাজান কেবলাকে 'বাচা ময়না' বলিতেন। ইহা তাঁহার রূপমূলক এসতেলাহী কালাম বা কথাভঙ্গি! যথা- আমার পিতা হযরতের একমাত্র পুত্র, শাহ্ ছুফী সৈয়দ মওলানা ফয়জুল হক (কঃ) সাহেবের ওফাত হওয়ার কয়েকদিন পর একদা খাদেমকে একখানা শাল কাপড় ও নিজের পাগড়ী মোবারক দিয়া বলিলেন, এই শাল কাপড়খানা আমার ফয়জুল হক মিয়ার কবরের উপর পরাইয়া দাও এবং এই পাগড়ীটি তাহার ছিরানে রাখিয়া দাও। দস্তার বাঁধিবার জন্য তাঁহার আরজু ছিল। আমি তাঁহাকে জনাব মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রাঃ) এঁর চেহারার উপর রাখিয়াছি।

একদিন "দায়েরা" শরীফে তাঁহার বাহির বাড়ীর গদি শরীফে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিলাম। হযরত কেবলা কোরান শরীফ হাতে নিয়া ১৭ "ওরক্" বা পৃষ্ঠা লিখিত অংশ বাহির করিয়া লইলেন এবং আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "দাদা ময়না এইখানে কি হরফ আছে"? এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সব হরফ উড়িয়া গিয়াছে। কমবক্তেরা কালামুল্লাহ বেচিয়া কলা মোলা খাইয়াছে, তবুও বলে কালামুল্লাহ।" একজন খাদেমকে বলিলেন, "এইগুলি আমার ফয়জুল হক মিঞার কবরের উপর রাখো"। পুনরায় ১০ "ওরক" বাহির করিলেন এবং আমাকে পূর্ববত দেখাইলেন এবং পূর্ববত সম্বোধন করিয়া উত্তরের সময় না দিয়া আগের মত বলিতে লাগিলেন, "সব হরফ উড়িয়া গিয়াছে! কমবক্তেরা কালামুল্লাহ বেচিয়া কলামোলা খাইয়াছে, তবুও বলে কালামুল্লাহ!" একজন খাদেমকে হুকুম করিলেন-এইগুলি সামনের পুকুরে ঢালিয়া দাও। এইরূপ বহু "তছার্রোপ মূলক আধ্যাত্মিক কাজকর্ম ও কথাবার্তা এবং "এস্তেলাহ" কথাভঙ্গি আছে যাহার রহস্য "সাহেবে এলমে লদুন" সোজা স্রষ্টা-জ্ঞান অর্জিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোক বুঝিতে অক্ষম। আবার এমন কতেক কথা ভঙ্গি বা "এস্তেলাহ" ছিল যাহা নিত্য সাহচর্য প্রাপ্ত লোকেরাই বুঝিতে পারিত। অন্যের পক্ষে বুঝা কঠিন ছিল।

যেমন কোন বিমারী লোকের দোয়া প্রার্থীকে কলা দিলে বা সরবত খাইতে বা খাওয়াইতে বলিলে কিংবা চাদর বা রজাই গায়ে দিয়া শোয়াইতে বলিলে বুঝা যাইত সেই বিমারী ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। যদি কাহাকে বলেন, দোয়া করিতেছি বা তাহার হাদিয়া গ্রহণ করেন তাহা হইলে বুঝা যাইত দোয়া প্রার্থী সফলকাম হইবে। কাহাকে কোন ঔষধ তবরুক দিলে যথা আদ্রক, রসুন, সাজনা পাতা ও পাটপাতার ঝোল বা মধু মিছরী খাইতে বা মসল্লা ব্যবহার করার হুকুম দিলে বুঝা যাইত সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে। কাহাকে-গালি গালাজ করিলে বা হস্তস্থিত যষ্টির প্রহার করিলে সেই ব্যক্তি রোগ মুক্ত বা মামলা হইতে খালাস পাইত। এইরূপ বহু কাজ কারবার দ্বারা তছার্রোপ প্রভাব বিস্তার করিতে দেখিয়াছি। আবার এমন কতেক কাজকারবার ও কথাবার্তা আমার জানা আছে যাহা সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে অথচ এইগুলিও তছার্রোপ মূলক রহস্য ও কথাবার্তা ছিল; যাহা সময় মত বিকাশ হইতে দেখা যায়। এই অবোধ্য তছার্রোপাত মূলক কথাবার্তা বিরাট প্রভাবশালী সুদূর প্রসারী কালাম।

যেহেতু কামেলের বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির "হিম্মত এরাদী" পূর্ণ ইচ্ছাশক্তিকে, কার্যকলাপ বা বাক্যালাপ জনিত যোগাযোগের মাধ্যমেই সৃষ্ট জাগতিক বস্তু বা শক্তি বিশেষের প্রতি খোদায়ী শক্তির প্রভাব বিস্তার করিতে হয়, যাহা এই জগতের স্বভাব সুলভ। যাহার জন্য দর্শন প্রবণ বা কাশ্‌ফ অন্তর দৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা মতে অবগতি একান্ত দরকার। তৎমতে কল্যাণী মনোভাব "ফায়ালী" কার্যকরী আচরণও দরকার। যাহা না হইলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ থাকিবে না। যাহাকে 'ছুলুক' বলিয়া ছুফী পরিভাষায় বলা হয়। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক আকর্ষণ বা "জজ্‌বারও" একান্ত আবশ্যক আছে, যাহাকে "জজ্‌ব" বলে। এই কল্যাণী জজ্‌ব ও ছুলুকের অধিকারী ব্যক্তিই এই তছর্রোপাতমূলক বেলায়তের অধিকারী বা মালেক। এই তছর্রোপ মূলক কাজ বা বাণী লোকের লোকচারী রীতিনীতির অনুরূপ নাও হইতে পারে। যাহা সাধারণ লোকের বুঝে আসে না।

এই কামেল হিম্মতকে পার্থিবতার সঙ্গে ফেরেস্তা বা মালায়ে ছিফলীর কার্যকরী শক্তির দিকে প্রভাব বিস্তারকে ছুফী পরিভাষা মতে তছার্রোপ বলে। আর মালায়ে আলা বা উর্দ্ধজগতের ফেরেস্তা বা কার্যকরী শক্তির দিকে কামেলে হিম্মতকে উত্থিত করার নাম ছুফী পরিভাষা মতে দোয়া বা বদ্‌দোয়া যাহা সমাজের পরিচিত। এই জজ্‌বা ও ছুলুকের সংমিশ্রণ ছাড়া ইচ্ছা ও শক্তি একত্রিত হইতে পারে না। এই দুই এর একত্র মিশ্রণ ছাড়া তছার্রোপ বিকাশ হয় না। যদিও অর্জিত বা অর্পিত বেলায়ত ক্ষমতার অধিকারী বা অধিকার থাকে।

এই 'লায়েক' লেখক মহোদয়ের উদ্দেশ্য আরো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যখন ঐ জীবন চরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৪ পৃষ্ঠা তক্ সংক্ষিপ্ত লেখা (কঃ) এবং (রাঃ) এঁর হেরফেরের প্রতি নজর দেওয়া যায়, যাহাতে (কঃ) কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ এবং (রাঃ) ইঙ্গিত মতে রাজি আল্লাহু আনহু বুঝায়। অর্থ (কঃ) পবিত্র হউক তাঁহার রহস্য, (রাঃ) তাঁহার প্রতি খোদা সন্তুষ্ট হউক, অর্থ বোধক দোয়া বটে। এই (কঃ) আর (রাঃ) লেখার ভিতর তিনি বুজুর্গানের মধ্যে সম্মান ও মর্ত্তবার বেশ কম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যথা ঃ- জনাব বাবাজান কেবলার নামের পর লিখিয়াছেন (কঃ), আর হযরত কেবলার নামের পরে লিখিয়াছেন (রাঃ) এইভাবে অন্যান্য বুজুর্গানের নামের পরও ঐভাবে (রাঃ) লিখিয়া এইসব বুজুর্গানের প্রতি এক ধরনের এবং বাবাজান কেবলার প্রতি অন্য ধরনের সম্মান বোধক সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহারে যেই হীন ও হেয় মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নেহায়ত হাস্যকর ও উপভোগ যোগ্য।

বিজ্ঞ লেখক অবশ্য জানেন, হাল জজ্‌বা বিভোরতা বৃদ্ধি পাইলে পারিপার্শ্বিকতার প্রতি নজর দিবার অবসর লোকের থাকেনা। ঘটনার অবস্থাও তদ্রুপ। কাজেই শাহ্ জালাল অর্থে, জালালিয়াত হাল জজ্‌বাই বুঝা উচিত ছিল। শাহ্ জালাল ও শ্রী হট্টকে টানিয়া আনা খাপ ছাড়া দেখা যায়। সেইরূপ আরবী "এমন" শব্দের অর্থ বেপরোওয়াই নিকটতম দেখা গেলেও আরবের এমন মূলুক ও জনাব ওয়াইছকরণীকে (রাঃ) নিয়া টানাহেছড়ার চেষ্টা দেখিলে অলক্ষ্যে আসল উদ্দেশ্য উকি মারিয়া দেখা দেয়। পক্ষান্তরে হযরতের অবিকৃত কালামের প্রতি নজর দিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে 'উহ্ শাহ্ জালাল হ্যায়"-অর্থ সেই সময়ে তাঁহার হাল জজ্‌বা গালেব ছিল, তাই বেপরোয়া আলমে আরওয়ায়ে ছায়ের করা, পার্থিবতা হইতে দূরে অতি উর্দ্ধের মকামে বা স্তরে বিচরণ করিতেছিলেন অর্থই বোধ হয় যথাযথ হইবে।

একই গরজে লেখক মহোদয়ের শ্বশুর সাহেব জনাব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসেম সাহেবকে তরজুমান-ব্যাখ্যাকারী দাঁড় করাইয়া চৌগার এক ঘটনাকে দলিল হিসাবে আনিয়াছেন। আমি সেই ঘটনার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিনা। কারণ এই ঘটনা কাহারো মুখেও শুনি নাই। এমন কি স্বয়ং এই মুহাম্মদ হাসেম সাহেবের মুখেও শুনি নাই। বরং আমার দাদী আম্মার মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন "একদা হযরত সাহেবানী বলিয়াছিলেন, আপনি কি করিলেন! এমন সুন্দর ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারিয়া রক্তাক্ত করিলেন। তাঁহার পিতামাতা আসিলে কি উত্তর দিব। প্রতি উত্তরে হযরত কেবলা

বলিয়াছিলেন, "দেখ! তাহাকে আমি একটি চক্ষু দিয়াছি সে আমার দুইটি চক্ষুই চাহে। দুইটি চক্ষু তাহাকে দিলে আমি চলিব কি করিয়া।" বিষয়টি হযরত সাহেবানীর বুঝিতে দেরী হইল না। তিনি জনাব বাবাজান কেবলাকে মধুরভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনি যখন তাঁহাকে দেখিলেই থাকিতে বা ধৈর্যধারণ করিতে পারেন না, কয়েক দিনের জন্য বাহিরে গিয়া ছায়ের করুন। অলি উল্লাহ এবং নবী উল্লাহরা তাঁহাদের উপর অর্পিত কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই হায়াতে নাছুতির হায়াতি যুগ কাটাইতে হয়। "এখন তক তাঁহার কাজ বাকী আছে। যাওয়ার সময় আপনার হিস্‌সা-কিছু থাকিলে তাঁহার সময় মতে আপনাকে দিয়া যাইবেন। ইহা জবরদস্তিমূলক বস্তু নহে।" ইহার পর হযরত বাবাজান কেবলা ছায়েরে বাহির হইয়া যান। এই ঘটনাতেও হযরত কেবলার জবানী স্বীকার উক্তি পাওয়া যায়। জনাব বাবাজান কেবলাকে হযরত কেবলা একটি ধারামতে ফয়েজ রহমত দান করিয়াছেন। যেই পথে যেই ব্যক্তির সফলতা নিশ্চিত, সেই ভাবে হযরত কেবলা বিভিন্ন ব্যক্তিকে যোগ্যতামতে গাউছিয়ত ও কুতুবিয়তের বিভিন্ন 'মশরব' আস্বাদ গ্রহণ প্রণালী মতে ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ দান করিতেন। এইভাবে তাঁহার অসংখ্য "ফয়েজাপ্তা" অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে দেখা যায়, কেহ "মজজুবে মাহাজ" কেহ "ছালেক" কেহ "ছালেকে মজজুব" আবার কেহ "মজজুবে ছালেক"। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের পথে সফলতা অর্জন করিতে দেখা যায়। যাহা সমস্ত তরিকা বা কামেল বুজুর্গ সিদ্ধ মহাপুরুষদের স্বীকৃত পন্থা যাহা তাঁহার বেলায়তে ওজমা বেলায়তে মুহিত বা সর্ব বেষ্টনকারী বেলায়তের প্রমাণ।

জনাব বিজ্ঞ গ্রন্থকার সত্য প্রচারের দিক হইতে পেশাগত ভাবে দিগ্বিদিগ জ্ঞান হারা হইয়া ওকালতি এবং ব্যবসা প্রচারের দিকে যেই ভাবে ঝুকিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে তাহার নীতি বিভিন্ন জায়গাতে বেফাঁস প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চরম, প্রকাশ হিসাবে বলিতে হয়, ঐ জীবনীর ৪১ পৃষ্ঠাতে পবিত্র "শজরা" শরীফে হযরত গাউছুল আজম শাহ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে গাউছুল আজম স্বীকার করেন নাই। অথচ একই গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠা ১১ লাইনে লিখিয়াছেন হযরত আক্‌দাছ হযরত রছুল করিম (সঃ) এঁর কদমের উপর গাউছুল আজম ছিলেন। গ্রন্থকার সাহেবের কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস হইতে মুদ্রিত সাবেক রচনা সৈয়দ গোলাম রহমান শাহ্ ছুফী মাইজভাণ্ডারী বাবাজান কেবলা কাবার "জীবন চরিত" নামক গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় আছমানী রং এবং রেশমী চৌগা বলিয়া উল্লেখ আছে। অথচ হযরত কেবলা রেশমী কাপড় পরিধান করিতেন না। চট্টগ্রাম মোহছেনিয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেনডেন্ট জনাব মওলানা আবদুল মোনায়েম সাহেবকে এই রেশমী কাপড় পরার দরুণ তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে আলমিরার উল্লেখও আছে। অথচ তাঁহার হুজুরা শরীফে কোন আলমিরাই ছিল না। যদিও জীবন চরিত ২য় সংস্করণে এই অংশ এবং আরো কতিপয় অংশ উদ্দেশ্য মূলকভাবে উল্লেখ করেন নাই। যেমন বর্তমান জীবন চরিতে লিখিত চৌগার ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও এই চৌগার রেওয়ায়েতটি এক সামঞ্জস্য বিহীন। উক্ত গ্রন্থকার মহোদয়ের কথা মতে হযরত কেবলা কাবার কার্যকলাপ ও কালাম খিজরী। অর্থাৎ হযরত খাজা খিজির (আঃ)-এঁর মত রহস্য পূর্ণ এলমে লদুনীর প্রভাবযুক্ত।

গ্রন্থকারের একই উদ্দেশ্যে লিখা "আল্" শব্দের বাহুল্যতার দ্বারা ধুম্রজাল সৃষ্টির সহায়তায় "লাফদিয়া" জায়গা দখলের প্রচেষ্টাটি নেহায়ত বাড়াবাড়ি মূলক এবং অনর্থক প্রচেষ্টা মনে করা যায়। এতদ্‌ছাড়া উপরে উল্লেখিত চৌগার রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারী কথিত মওলানা হাশেম সাহেব সহোদর ভ্রাতাকে পার্থিব গরজে বাপবোলাইয়া অপরকেও বাপ বোলাইতে শিক্ষা দিয়াছেন। যাহা বর্তমানে এইস্থানে রেওয়াজে পরিণত।

যদিও পবিত্র কোরানে প্রকাশ্যে নিষেধ করিয়া বলিতেছে, মুহাম্মদ তোমাদের কাহারো পিতা নহেন। তিনি খোদার রসুল এবং নবুয়াতের "খাতেম" বা অবসানকারী (ইহাই তাঁহার খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব) কাজেই এই উপাধিতেই তাঁহাকে অভিহিত করা উচিত। ইহাতে প্রমাণিত হয় খোদার নবী অলিদিগকে তাঁহাদের খোদায়ী প্রদত্ত "মসরব" বা চলন ভঙ্গী মতেই সম্বোধন বা অভিহিত করা উচিৎ। পার্থিব স্বার্থ জড়িত ভাষায় নহে।

কোরান ছুরা আল্ আহজাব ৪০ আয়াত দ্রষ্টব্য।

নবীয়ে কামেলের জন্য যাহা অবৈধ বা অবাঞ্ছিত, অলিয়ে কামেলের জন্য তাহা অবৈধ। অলিয়ে কামেলের খোদায়ী প্রদত্ত ফজিলত মতে তাঁহার "মসরব" বা চলন ভঙ্গীর মরতবা অনুযায়ী স্মরণ করা উচিৎ। উক্ত মুহাম্মদ হাশেম সৈয়দ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া, হযরত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক "ওয়াছেল" মাইজভাণ্ডারী সাহেব যেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা ফলবতী হইতে দেখা গিয়াছিল, যাহা প্রকাশ্যেও দৃশ্য ছিল। মৃত্যুর পূর্বে যাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহারা সবাই অবগত আছেন।

সত্য অনুসন্ধিৎসু সুধীমন্ডলীর ভ্রান্তিদূর মানসে এবং কতগুলি নেহায়ত উদ্দেশ্যমূলক ভ্রান্ত নীতির ব্যাখ্যা বিচ্ছেদ করণের জন্য অনিচ্ছাকৃত এই ক্ষুদ্র সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- ✦ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত
- ✦ বেলায়তে মোত্‌লাকা
- ✦ আয়নায়ে বারী
- ✦ মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার
- ✦ মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া
- ✦ মানব সভ্যতা
- ✦ বিশ্ব-মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ
- ✦ মুসলিম আচার ধর্ম
- ✦ রত্ন ভাণ্ডার (১ম ও ২য় খন্ড)
- ✦ জ্ঞানের আলো
- ✦ আমালে মকবুলীয়া ফি ফয়উজাতে গাউছিয়া
- ✦ তত্ত্বভাণ্ডার
- ✦ জ্ঞান ভাণ্ডার
- ✦ শানে গাউছে মাইজভাণ্ডার

প্রাপ্তি স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬

খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া
(মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ)

চট্টগ্রাম

জাকির হোসেন রোড, ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, (হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ও পোস্ট অফিসের মধ্যবর্তী), রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০০

মোবাইল : ০১৭১১-৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

ঢাকা

১০১, আরামবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২-৫৪৯১৯৭

সিলেট

গ্রাম : আলুতল, ডাকঘর : ইসলামপুর, উপজেলা সদর, সিলেট।

মোবাইল : ০১৮২৬-০৪৬৫৪৫, ০১৭৩১-২৪৬৬৮৫

খুলনা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও জিরো পয়েন্টের উত্তর পার্শ্বে মেইন রোড সংলগ্ন।

মোবাইল : ০১৮১৬-০৩৫৫৯১

বংশ লতিকা (পুত্র বংশীয়)

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) (১৮২৬-১৯০৬)

১ম পুত্র
অল্প দিনে পরলোক গমন করেন

২য় পুত্র
শাহজাদায়ে গাউছুল আজম সৈয়দ ফয়জুল হক (কঃ) (১৮৬৫-১৯০২)

১ম পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ মীর হাসান (১৮৯১-১৯০৬)

২য় পুত্র
সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) (১৮৯৩-১৯৮২)

১ম পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ জিয়াউল হক
(১৯২৮-১৯৮৮)

২য় পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ মুনিরুল হক
মোন্তাজেম (১৯৩২-২০০৬)

৪র্থ পুত্র
শাহজাদা ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হক
মোন্তাজেম

৫ম পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ সহিদুল হক
মোন্তাজেম

৩য় পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ এমদাদুল হক
সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেম

একমাত্র পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক
নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেম

শজরায়ে আহমদিয়া

কাদেরীয়া গাউছিয়ার ধারাবাহিকতা।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এঁর মনোনীত সাজ্জাদানশীন
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক মনোনীত সাজ্জাদানশীন
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)

চট্টগ্রাম শহর থেকে চব্বিশ মাইল দূরত্বে মাইজভাণ্ডার নামে একটি গ্রাম সাধারণ পরিচয়ে পরিচিত ছিল। যে অধ্যাত্ম মহাপুরুষের পরিচিতিতে উহা দ্রষ্টব্য স্থানরূপে গণ্য হয়েছে, সেই অলিয়ে কামেল গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা **শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ** (কঃ) এঁর জন্ম ১২৩৩ বঙ্গাব্দের (১৮২৬ খ্রীঃ) ১লা মাঘ। দেশীয় শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি হিজরী ১২৬০ সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং অধ্যয়ন শেষে ১২৬৯ হিজরী সনে যশোরে কাজীর পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছরেই কাজীর পদ ত্যাগ করে কলিকাতায় মুন্সী বো-আলী মাদ্রাসায় প্রধান মোদার্রেছ হিসাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। ইতিমধ্যে পীরাণে পীর গাউছুল আজম হজরত আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এঁর বংশধর ও কাদেরীয়া তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত গাউছে কাওনাইন শেখ সৈয়দ আবু শাহ্মা মুহাম্মদ ছালেহ কাদেরী লাহোরী (রঃ) ও তাঁর অগ্রজ চিরকুমার শাহ্ সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (রঃ) এঁর সংস্পর্শে এসে ফয়েজ ও কামালিয়ত অর্জন করেন। পীরের নির্দেশে স্বগ্রামে ফিরে এলে খোদাদাদ অপূর্ব গুণ জ্ঞানের মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে আর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লোকজন ছুটে আসে। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অনাবিল করুণাবারী বর্ষণের পর ৭৯ বছর বয়সে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের (১৯০৬ ইং) ১০ই মাঘ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর প্রবর্তিত তরীকাকে পূর্ণতা দিয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেন। প্রতি বছর ১০ই মাঘ তাঁর মহান আদর্শকে জাগিয়ে তোলার মানসে মাইজভাণ্ডার শরীফে সমবেত হয় বিপুল সংখ্যক ভক্ত জায়েরীন আর কণ্ঠে ধ্বনি তোলে ঃ-

মারহাবায়া, মারহাবায়া, মারহাবা।
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মারহাবা।

ডিজাইন ও মুদ্রণে : মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী